# মানদণ্ড রাজদণ্ড

প্রফুল্ল রায়চৌধুরী



ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা : ১৯৮২

প্রকাশক ঃ

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা, ১৯৮২

মুদ্রাকর ঃ

দুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

## সূচীপত্র

# ভূমিকা

আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলছেন, মানুষ তথা যে-কোনো প্রাণী যেখানে জন্মলাভ করবে সেখানেই পাবে তার আহার্য এবং ঔষধি। মানুষ ঠিক যে-কোনো প্রাণী নয়। পশু-পাখী, গাছপালা এবং কীট-পতঙ্গের অন্য কোনো দায় নেই। মানুষের দায়—তাকে মানুষ হতে হয়। প্রকৃতির সম্পদ-ভান্ডার থেকে সে যেমন আপন জীবন ধারণের এবং জীবন রক্ষার প্রয়োজন-সামগ্রী আহরণ করে নেয়, তেমনি তার প্রয়োজনের অতিরিক্তও কিছু চাই। এই অতিরিক্তটুকুই তার ঐশ্বর্য। আর তারও উৎস প্রকৃতিই।

প্রয়োজনের সামগ্রী এবং তার অতিরিক্ত ঐশ্বর্য সংগ্রহের জন্য প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে হয় তার নিয়ম-কানুন, কলা-কৌশল আয়ত্ত করে। এই যে কাজে লাগানো, তার পদ্ধতি এবং অভিপ্রায়কেই বলে প্রযুক্তিবিদ্যা, বা টেকনোলজি। এই সজ্ঞাই দিয়েছেন কার্ল মার্কস।

প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এই আদান প্রদানের যুগ-যুগ সঞ্জাত অভিজ্ঞতা হল মানুষের ইতিবৃত্ত। এই সমগ্র অভিজ্ঞতার সার-মর্মকে বলি থিয়োরি বা তত্ত্ব।

এই ইতিবৃত্ত মানুষের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। সংগ্রাম উৎপাদনের, সংগ্রাম পুনরুৎপাদনের। প্রথমে সরল, ক্রমান্বয়ে জটিল, জটিলতর। হাতে কাজ করতে করতে বোধের উদয়, তারপর জ্বললো বুদ্ধির প্রদীপ। উৎপাদনের প্রয়োজনে শ্রম বিভাজন; সেই প্রক্রিয়ায় শ্রেণীবিভাগ। ছোটো থেকে বড়ো, কুটীরশিল্প থেকে অতিকায় কারখানা। হাত থেকে মেশিন। বিভেদ এল শহর ও গ্রামে, কায়িক এবং মনন-জনিত শ্রমে।

মানুষের সমৃদ্ধির উপাদানের যেন শেষ নেই। সম্ভাবনা অনন্ত। কিন্তু প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার। সমাজের বেশীর ভাগ মানুষের ভোগ করবার অধিকার নেই। কেননা সমাজ বিবর্তন ও আবর্তনের ধারায় সৃষ্টি হয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু মালিক, তারাই সমগ্র সম্পদ ভান্ডার আপন মুঠোয় ধরে রেখেছে।

তারপর আরো ইতিহাস। মালিকরা আর আপন দেশের সীমানায়ও সীমাবদ্ধ থাকতে চাইল না। লোভের বিস্তার দেশ-বিদেশের সীমা দিল ভেঙে।

যেন সারা পৃথিবীটাকে একটি কারখানায় পরিণত করে তার মালিক হয়ে না বসতে পারলে আর শান্তি নেই। তারপরে হয়ত জেগে উঠবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করবার লালসা।

এই সর্বগ্রাসী দানবদের লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান লক্ষ মুখ দিয়া।

এই রক্তশোষকদের নিয়েই লেখা এই বইখানা। কারা এরা? কী এদের পরিচয়? কেমন করে তারা বিস্তার করে তাদের বেড়াজাল?

বাণিজ্যের এ-রকম প্রসার ও উত্তরোত্তর বেশী মাত্রায় ক্ষুদ্র-সংখ্যা মানুষের হাতে অধিক থেকে অধিকতর ধনাগম কি কোন অর্থবিজ্ঞানের নিয়তি? অস্ত্র ও সৈন্যবলে যেমন অতীতের বড়-বড় সাম্রাজ্য ও শোষণ টেকেনি, তেমনই বণিকের এই দাপট কি কোনরকমে লোপ পাবে না? উপযুক্ত বয়সে যেমন শারীরিক উর্ধ্বতনের নিয়মে গোঁফদাড়ি গজায়, তেমনি মৃত্যুতে সমস্ত দেহের সঙ্গে সবই বিনষ্ট হয়। প্রসার যদি প্রকৃতির নিয়ম—প্রলয় এবং ধ্বংসও তাই নয় কি?

কারখানার মালিক থেকে ব্যাংকেরও মালিক, তারপর সারা দেশের মালিক হয়ে বসা, শেষে অন্য দেশ-বিদেশের মালিক হওয়া এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সসাগরা ধরিত্রীর প্রভু হবার বাসনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠা—এই সমগ্র প্রক্রিয়া অতি বিচিত্র। সেই বিচিত্র প্রক্রিয়ার যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ ভি. আই. লেনিনের কালজয়ী গ্রন্থ **ইম্পীরিয়্যালিজম দি হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম**। উক্ত কালজয়ী গ্রন্থ আমার এই প্রয়াসের প্রেরণা।

পররাজ্য গ্রাসের ফাল পরিণতি লাভ করে অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের ছুঁচের সাহায্যে। আমাদের ভারতবর্ষের প্রাক্তন পরাধীনতার ইতিহাস তো আমাদের সবারই জানা। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সে কথা আবার শোনা যেতে পারে। সে স্মরণে আমাদেরই কল্যাণও।

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণির এক ধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—
বণিকের মাণদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে॥

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেই এই বইখানার নাম দেওয়া হল 'মানদণ্ড—রাজদণ্ড'। এই বইখানা তৈরী করতে গিয়ে অনেক বন্ধুর সাহায্য পেয়েছি। তাদের কাছে ঋণের আমার শেষ নেই। বই লিখবার কালে সাংসারিক কাজে বিস্তর অবহেলা করেছি। সেই অবস্থায় যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় আমার স্ত্রী আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তার মতো তুলনাও খুব বেশী পাওয়া যায় না।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়কে। তার যত্ন না পেলে বইখানা দিনের আলো দেখতে পেত না।

নভেম্বর, ১৯৮২।

—প্রফুল্ল রায়চৌধুরী

প্রথম অধ্যায়

## একজন নাগরিকের যে কোন একটি দিনের কাহিনী

আন্তর্দেশীয় করপোরেশনগুলো (T.N.C.) ভারতের গড়পড়তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরিককে তার দশদিকে ছড়ানো জালে কিভাবে জড়িয়ে রেখেছে তার বিস্তারিত বিবরণীসহ একটি প্রবন্ধ নয়াদিল্লীর সাপ্তাহিক মেইনস্ট্রীম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি নাগরিক সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে আন্তর্দেশীয় করপোরেশনগুলোর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সকালে টুথব্রাশ দিয়ে শুরু করে রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার সময় পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তেই সে আন্তর্দেশীয় করপোরেশনের দাঁড়ায় আবদ্ধ। চা অথবা কফি, রুটি অথবা বিস্কুট, সিগারেট অথবা চকোলেট, জুতো মোজা সহ সব প্রকার কাপড়চোপড়, সকল সৌখিন দ্রব্য, অধিকাংশ ঔষধ-পত্র, সাধারণতঃ খাওয়া ও স্নানপানে, সাবান অথবা দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, দেশলাই—শহরবাসীর এমনকি গ্রামবাসীও প্রায় সকল প্রকার ভোগ্যপণ্যের জন্য আন্তর্দেশীয় করপোরেশন ছাড়া আর কোন বিকল্প উৎস নেই।

বিষয়টার অপরদিক আরও গুরুতর। আন্তর্দেশীয় করপোরেশনের ভোগ্য-পণ্য ব্যবহারে দেশের সাধারণ মানুষ এমন অপরিবর্তনীয়ভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে স্বদেশে উৎপন্ন অনুরূপ পণ্যাদি সে ব্যবহার করতে অক্ষম। এমনকি স্বদেশী পণ্য উন্নততর গুণসম্পন্ন হলেও নয়। স্বভাবতঃই তাদের পণ্যের ওপর এই পরিপূর্ণ নির্ভরতা থেকে আন্তর্দেশীয় করপোরেশনগুলো প্রচুর মুনাফা ও সুনাম অর্জন করে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে আন্তর্দেশীয় করপোরেশনের পণ্যের প্রভাব এত ব্যাপ্তিশীল যে সেইসব পণ্যের উপর নির্ভরশীলতার দাসত্ববন্ধনে যে ভারতের মানুষ কতখানি আবদ্ধ সে উপলব্ধিও তার নেই এবং এই দাসত্ববন্ধনের ফলে প্রতি বছর আন্তর্দেশীয় করপোরেশনগুলো এ দেশ থেকে যে কী বিরাট পরিমাণ মুনাফা লুটে নিয়ে যাচ্ছে, অধিকাংশ লোকই তার সংবাদ রাখে না।

এ কথা কারো অজানা নেই যে ভারত অতীত দুই শতাব্দীকালের ঔপ-নিবেশিক পশ্চাদপদতার জের এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে এবং আজও আন্তর্দেশীয়

করপোরেশনের মাধ্যমে ভারতের উপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব চালাবার ব্যাপারে গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকাই প্রধান।

আগে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টই ভারতের সমগ্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতো। এখনও তার অবসান ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে সেই নিয়ন্ত্রণ আন্তর্দেশীয় লগ্নীকারকদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র। আজও যে সমস্ত বৈদেশিক করপোরেশন প্রাধান্য বিস্তার করে ভারতে বিদ্যমান, সেগুলোর অধিকাংশই গ্রেট ব্রিটেনের সংস্থা। মার্কিন করপোরেশনগুলো ভারতে প্রবেশের সুযোগ পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে কলকারখানা, খনি, যানবাহন, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, সার্ভিস, বাগ-বাগিচা এবং অন্যান্য শিল্পে বিদেশী বাণিজ্যিক লগ্নীর মোট পরিমাণের মূল্য ছিল ৩২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে ২৩০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্যিক লগ্নী। অর্থাৎ মোট বৈদেশিক বাণিজ্যিক লগ্নীর ৭১.৯ শতাংশ। আমেরিকার অংশ ছিল ১৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। এটা মোট বৈদেশিক লগ্নীর মাত্র ৫.৭ শতাংশ। ১৯৫৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ লগ্নীর পরিমাণ বেড়ে ৪০০ কোটি টাকায় পৌঁছায়। তার মধ্যে ৬৩ শতাংশ লগ্নী করা ছিল কলকারখানা ও বাগ-বাগিচায়। যে সব কলকারখানাভিত্তিক শিল্পে ব্রিটিশ মূলধন লগ্নী করা ছিল সেগুলো হচ্ছে সিগারেট, রসায়ন, খাদ্যবস্তু, পাট, নারকেলের ছোবড়াজাত পণ্য, বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম, ঔষধ ইত্যাদি।

১৯৭৪ সালে ভারতে ৭৪০টি বিদেশী কোম্পানী শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে আন্তর্দেশীয় করপোরেশনের শাখা সংস্থা ছিল ৫৩৬টি এবং অধঃস্তন সংস্থা ছিল ২০১টি। মোট সংখ্যার মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের কোম্পানী-গুলির শাখাসংস্থা ছিল ৩২০টি এবং অধঃস্তন সংস্থা ছিল ১৪০টি, আর মার্কিনী কোম্পানীগুলির শাখাসংস্থা ছিল ৮৮টি এবং অধঃস্তন সংস্থা ছিল ২৮টি। সুইজারল্যাণ্ড, জাপান, পশ্চিম জার্মানী এবং সুইডেনের কোম্পানীগুলোর শাখা ও অধঃস্তন সংস্থার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২১, ১৮, ১৭ এবং ১৪টি। এইসব শাখা ও অধঃস্তন সংস্থাগুলোর মালিকানাধীন সম্পদের মোট মূল্য ছিল ২৯২২ কোটি টাকা। তার মধ্যে ব্রিটেনের অংশ ছিল ১৮১৮ কোটি টাকা এবং আমেরিকার অংশ ছিল ৫৪২ কোটি টাকা। উপরের তথ্য থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে ভারতে ব্যবসারত মার্কিন কোম্পানীগুলির সম্পদ ব্রিটিশ কোম্পানী-গুলির সম্পদের চেয়েও ক্রমেই দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৭-৭৩ সালের

মধ্যে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলোর ( অধঃস্তন সংস্থার ) মোট সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। অপর দিকে মার্কিন কোম্পানীগুলির মোট সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা। এটা একটা সুনির্দিষ্ট প্রবণতা এবং সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে ভারতে মার্কিন পুঁজি ব্রিটিশ পুঁজিকে অতিক্রম করে যাবে।

১৯৭০ সালের পর চার বছরের কালপর্বে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলোর শাখা সংস্থার সংখ্যা ৩৫১ থেকে ৩২০তে নেমে যায়। কিন্তু তাদের সম্পদের পরিমাণ ৮২৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০৪৮ কোটিতে ওঠে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে ব্রিটিশ এবং মার্কিন পুঁজি তখনও সবচেয়ে বেশী পরিমাণে লগ্নী করা ছিল প্রক্রিয়া ও কলকারখানাভিত্তিক শিল্পে। এক্ষেত্রে লগ্নীর পরিমাণ ছিল ১৩৪৮ কোটি টাকা। এগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল সিগারেট ও ভেষজ শিল্প। পরবর্তী স্থানের অধিকারী ছিল পণ্য ক্রয় বিক্রয় এবং অর্থজোগান শিল্প। এক্ষেত্রে মোট লগ্নীর পরিমাণ ছিল ১৮৩ কোটি টাকা।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, যেসব শিল্পে বেশী পুঁজির প্রয়োজন হয় না, যেখানে পণ্য উৎপাদনের কৃৎকৌশল সহজলভ্য, কাঁচামাল সহজলভ্য এবং কম মজুরীর শ্রমিক সহজলভ্য সেইসব শিল্পক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধন লগ্নী করা হয়। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সংগে এইসব শিল্পের সম্পর্ক যে খুবই নগণ্য তা বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না।

ভারতে মার্কিন লগ্নীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমদানী-রপ্তানীর কারবারেই মার্কিন লগ্নী বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তীকালে সেটা মোড় নিয়েছে মোটরগাড়ির ক্ষেত্রে আর তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে জেনারেল মোটরস্ ( বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্দেশীয় কোম্পানী হিসাবে পরিচিত ) এবং ফোর্ড। তারপরই নাম করা যায় টায়ার, টাইপ রাইটার ইত্যাদির। কানাডীয় অধঃস্তন সংস্থার মাধ্যমেও ভারতে মার্কিন লগ্নীর প্রবেশ ঘটেছে। ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানীর ( একটি ভারত-মার্কিন কোম্পানী ) মূলধনের অর্ধেকের মালিক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী অব্ কানাডা। শেষোক্ত কোম্পানীটি আবার মার্কিন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান মেলনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আমেরিকার **ফরচুন** পত্রিকায় ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে বিশ্বের পঞ্চাশটি বৃহত্তম আন্তর্দেশীয় করপোরেশনের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘ অনুসৃত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী একটি বৃহদাকার আন্তর্দেশীয় করপোরেশন বলা হয় তাকেই যার বার্ষিক কারবারের পরিমাণ ১০০ কোটি ডলারের উপর। **ফরচুন** পত্রিকার তালিকায় যে পঞ্চাশটি বৃহদাকার আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর নাম প্রকাশিত

হয়েছে তার মধ্যে তেইশটি সরাসরি শাখা-সংস্থা অথবা অধঃস্তন সংস্থার মাধ্যমে ভারতে কাজ কারবার চালায় অথবা ভারতীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলির সহযোগিতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কারবার করে। এই তেইশটি হচ্ছেঃ এক্সন (EXXON) জেনারেল মোটরস্, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, ইউনিলিভার, আই. বি. এম., গাল্ফ্ অয়েল, আই. টি. টি., ফিলিপ্স্, হেক্সট্, ই. এন. আই.. বেনজ্ (BENZ), বাস্ফ্ (BASF), বেয়ার, নেস্ল্, আই. সি. আই., ব্রিটিশ-আমেরিকান টোবাকো, হিতাচি, ইউনিয়ন কারবাইড, গুড ইয়ার টায়ার এন্ড রাবার, জেনারেল ইলেকট্রিক, সীমেন্স, ওয়েস্টিং হাউস, মিৎসুবিশি।

ইদানীংকালে ভারতীয় কোম্পানীগুলোর সঙ্গে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার মাধ্যমেই বিদেশী পুঁজি ভারতে প্রবেশ করছে। বিদেশী কোম্পানী-গুলোর কাছে এই সহযোগিতা অত্যন্ত লাভজনক। বিদেশী কোম্পানীগুলো যে যে দেশ থেকে এখানে আসে সেইসব দেশের করের হারের চেয়ে ভারতে করের হার অনেক কম। উপরন্তু স্বত্বাধিকারের প্রণামী (Royalty) এবং কৃৎকৌশলের উচ্চতর মূল্যে থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করার সুযোগ নিদ্যমান। এই সহযোগিতা মেসিনপত্র ও সাজ-সরঞ্জামের আমদানী সুনিশ্চিত করে এবং একই মানের মেসিনপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম এদেশে পাওয়া গেলেও বিদেশী কোম্পানীগুলো তাদের মালপত্র এদেশে আমদানী করবেই। সেটা অনিবার্য। এই ধরনের সহযোগিতায় বিদেশী কোম্পানীগুলো এমন সব ক্ষেত্রে প্রবেশের বিশেষ সুযোগ লাভ করে, যেসব ক্ষেত্র কেবলমাত্র ভারতীয় পণ্যের জন্য সুরক্ষিত থাকা উচিত। ভারতে লাইসেন্সের সঙ্গে এই সর্ত অনায়াসেই জুড়ে দেওয়া যায় যে কাচামাল, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি কিনতে হবে বিদেশী কোম্পানীর অথবা তাদের অংশীদারদের কাছ থেকে এবং তার জন্য দামও দিতে হবে অনেক বেশী। বিদেশী কোম্পানীর সহযোগিতায় নির্মিত শিল্পের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও নানা বিধি নিষেধ থাকে। বিশ্বের যে সব দেশে বিদেশী কোম্পানী নিজেই তার পণ্য রপ্তানি করে, সেখানে বিদেশী সহযোগিতায় ভারতে নির্মিত পণ্য রপ্তানি করা নিষিদ্ধ। ওয়াল্টার হ্যামিল্টন বলেছেন, "পেটেন্টের মালিক এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত কারবারীর মধ্যে এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক রাজা-প্রজা সম্পর্ক গড়ে ওঠে।"[১]

১৯৭৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক সহযোগিতার ঘটনা ঘটেছে ৪৬৮৭টি ক্ষেত্রে। তার মধ্যে বেশীর ভাগই ঘটেছে ভেষজ ও রাসায়নিক (৬৩৩টি), বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (৬৩৮টি), শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মেসিনপত্র (৬৮৫টি) এবং যানবাহনের সরঞ্জাম (৩৬৪টি) শিল্পে।[২] এই সব

সহযোগিতার বলে বিদেশী কোম্পানীগুলো ডিভিডেন্ড ও কৃৎকৌশলের মূল্য তো আদায় করেই, উপরন্তু ভারতীয়দের উপর হুকুমদারীও চালাতে পারে, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষমতাই বিদেশী কোম্পানীগুলোর উপর ন্যস্ত।

এই সব আন্তর্দেশীয় কোম্পানী বিরাট ক্ষমতার অধিকারী। একটি বৃহদাকার আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর পণ্য বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ভারত গভর্নমেণ্টের বার্ষিক বাজেটের (ব্যয়ের) চেয়ে বেশী এবং একই দেশের অন্যান্য আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ভারতের মোট জাতীয় পণ্যের (GNP) মূল্যের চেয়ে বেশী (১৯৭৫ সালে ভারতের মোট জাতীয় পণ্যের মূল্য ছিল ৬৯০০০ কোটি টাকা)।

অনেকেই অবশ্য বলে থাকেন যে ভারতীয় শিল্পের সামগ্রিক চিত্র বিবেচনা করলে দেখা যাবে, আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যতই শক্তিশালী হোক ভারতে তারা খুব বেশী জায়গা নিয়ে বসতে পারেনি। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজকারবার করে এবং প্রাধান্য বিস্তার করেছে, সেটা বিশ্লেষণ করাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আগেই আভাস দিয়েছি যে ভোগ্যপণ্যের বাজার প্রায় পুরোটাই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর কুক্ষিগত হয়েছে। মনে রাখা দরকার এই বাজারটার এমনিই মজা যে এখানে খুব বেশী মূলধন লগ্নীর আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মুনাফাটা আসে আকাশ ছুঁয়ে। ইকনমিক টাইম্স্ এক সমীক্ষায় দেখিয়েছে যে এই সব বিদেশী কোম্পানী ১৬ টাকা লগ্নী করে ২১ টাকার জিনিষ বানায় এবং বেচে।

কলগেটের কথাই ধরুন। এই কোম্পানী মাত্র দেড়লাখ টাকা মূলধন নিয়ে কারবার সুরু করে। ১৯৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই কোম্পানীর কারবারের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭০০৫০৯০২ টাকা। গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক কারবার সুরু করে ১০ লাখ টাকা নিয়ে। কিন্তু আজ এর মূলধন এবং মজুত তহবিলের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি পাউণ্ডের (১ পাউন্ড=২১ টাকা) উপর। হিন্দুস্থান লিভার কারবার সুরু করেছিল ২ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে। ১৯৭৪ সালে এর মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ কোটি টাকা। ৩৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা মূলধনের কোম্পানী ফাইজার ১৯৭৫ সালে ৩৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার কারবার করে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা মুনাফা কামিয়েছিল।

বাগ-বাগিচা শিল্পের মধ্যে প্রধান হচ্ছে চা এবং রবার। বড় বড় রবার ব্যবহারকারীরা রবারের যথেচ্ছ মূল্য ধার্য করে দেয় এবং তার উপরই নির্ভর

করে এই শিল্পের মরণ-বাঁচন। বৃহৎ রবার ব্যবহারকারীরা হচ্ছে টায়ারের কারবারী। ভারতে টায়ার শিল্প পুরোটাই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর হাতের মুঠোয়। সেই কোম্পানীগুলো হচ্ছে ঃ গুডইয়ার, ডানলপ, সিট এবং ফায়ারস্টোন। এরাই রবারের যথেচ্ছ দাম বেঁধে দিয়ে থাকে।

এবার তামাকের কথা ধরা যাক। ভার্জিনিয়া ফ্লু-শোধিত তামাকের বেশীর ভাগটাই কেনে ইন্ডিয়ান লিফ এন্ড টোবাকো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী। এটা ব্রিটিশ-আমেরিকান টোবাকো কোম্পানীর অধঃস্তন সংস্থা। ইন্ডিয়ান টোবাকো কোম্পানী আবার এরও অধঃস্তন (অর্থাৎ অধঃস্তনের অধঃস্তন) সংস্থা। শেষোক্ত কোম্পানীর নাম আগে ছিল ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানী। ইন্ডিয়ান টোবাকো কোম্পানী ভারতে সিগারেট তৈরী করে এবং ভারতে বৃহত্তম সিগারেট প্রস্তুত-কারক।

ইলেকট্রনিক্স্ এবং যোগাযোগ শিল্পে যে দুটি বৃহদাকার বিদেশী কোম্পানী প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তাদের নাম হল আই-বি-এম এবং আই-সি-এল। এই দুইয়ের মধ্যে বৃহত্তর আই-বি-এম ভারতে কোন কম্পিউটর মেসিন তৈরী করে না। এর কাজ হচ্ছে যন্ত্রাংশ আমদানী করে জোড়া লাগানো এবং সেকেন্ড হ্যান্ড মেসিন (দীর্ঘদিন ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত) আমদানী করা। সারা বিশ্বে ছড়ানো নিজেদের শাখা সংস্থা থেকে এই পুরোনো মেসিনগুলো আমদানী করা হয়। আই-বি-এম যন্ত্রাংশ জোড়া দিয়ে তৈরী মেসিনগুলো বাইরেও রপ্তানি করে। কিন্তু এদের হিসাবের খাতা এমন কৌশলে তৈরী করা হয় যে রপ্তানি থেকে তাদের যে ঠিক কত টাকা আয় হয়, সেটা বোঝে কার সাধ্য। উপরন্তু চুক্তি অনুযায়ী এই সব মেসিনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহারকারীরা আই-বি-এমের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। মেসিন সারাই বাছাই এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহের কাজটা করে আই-বি-এমই।

ভারতে আন্তর্দেশীয় করপোরেশনগুলোর কাজ কারবার দেখে এটা ধরে নিলে মোটেই অন্যায় হবে না যে এই বৃহদাকার কোম্পানীগুলো লগ্নীযোগ্য সম্পদ পরিবর্ধনের ব্যাপারে আদৌ কোন আগ্রহ পোষণ করে না। তারা কোন নতুন কৃৎকৌশল, উন্নততর ব্যবস্থাপনা অথবা বিক্রয় দক্ষতা আমদানী করে না এবং রপ্তানির আয়ও বাড়ায় না। মূলধন, ঋণ ইত্যাদি খাতে আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-গুলো এদেশে সরাসরি যে বৈদেশিক অর্থ লগ্নী করেছে তার পরিমাণ ১৮০০ কোটি টাকার মত। এটা সমগ্র কর্পোরেট সেক্টরে ( সরকারী ও বেসরকারী যৌথ কোম্পানীসমূহের বিচরণ ক্ষেত্র ) লগ্নী করা মোট লগ্নীর মোটামুটি মাত্র ৮

শতাংশ। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো নতুন চাকরী-বাকরীও তেমন কিছু সৃষ্টি করেনি। তারা শিল্পক্ষেত্রে ক্রিয়াকাণ্ডের মাত্রা পরিবর্ধনেও সাহায্য করেনি। বরং এদেশে তাদের অবস্থানের ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এটা নিতাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় যে, কোন একটি ভারতীয় কোম্পানী টুথ ব্রাশ বানাচ্ছে কিন্তু সেটা বাজারে বিক্রী হচ্ছে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর ছাপ দিয়ে। জুতো-মোজার বাজারেও ঠিক একই দৃশ্য নজরে পড়ে। ভারতীয় কোম্পানীর তৈরী জিনিষ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর ছাপে বিক্রয় হয়। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যে এদেশের কৃৎকৌশল বিকাশের ক্ষেত্রে কি কর্মটি করছে, উপরোক্ত ঘটনাগুলোই তার প্রমাণ।

দেশে বাইরের অর্থ আনা-নেওয়ার ব্যাপারে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কতদূর কি করেছে, এবার সেটা বিচার করে দেখা যেতে পারে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ভারত থেকে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা বেরিয়ে গেছে নীট ৬৮৪ কোটি টাকার। এই কালপর্বে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো আমদানী করে ৭৪৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য এবং রপ্তানি করে ২৪৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য। অর্থাৎ ভারত থেকে বেরিয়ে যায় ৫০১ কোটি টাকা। সহযোগিতাভিত্তিক কোম্পানী-গুলোর হিসাব ধরলে আমদানীর মোট পরিমাণ ছিল ২৩৪২ কোটি টাকার এবং রপ্তানি ৯০১ কোটি টাকার। অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৪১ কোটি টাকার।

কয়েকটি কোম্পানীর দৃষ্টান্ত থেকে ব্যাপারটা সহজেই বোধগম্য হবে। যেমন ধরুন মেটাল বক্সের কথা। ১৯৭৫ সালে এই কোম্পানীর বার্ষিক কারবারের পরিমাণ ছিল ৫৪˙৮০ কোটি টাকা, কিন্তু এই কোম্পানী সেই বছর মাত্র ১৪,০০০ টাকার পণ্য রপ্তানি করে। একই বছরে ফাইজার ২৮˙০২ কোটি টাকার ঔষধ বেচেছিল, কিন্তু তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৬২ লাখ টাকা। হিন্দুস্থান লিভার কারবার করেছিল ২২৭ কোটি টাকার, আর রপ্তানি করেছিল ৫˙৯২ লাখ টাকার মাল।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কৃৎকৌশলের মূল্য ও অন্যান্য ফী ও মুনাফা হিসাবে কী পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠায় এবার সেটাও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। পার্লামেণ্টের এস্টিমেট্‌স্‌ কমিটির সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বিদেশী কোম্পানীর পুরোপুরি মালিকানাধীন অধঃস্তন সংস্থাগুলো মুনাফা, ডিভিডেণ্ড এবং কৃৎকৌশলের মূল্যবাবদ নিজ নিজ দেশে ২১১˙৪ কোটি টাকা প্রেরণ করে। এর মধ্যে ১০৫˙১৪ কোটি ছিল ডিভিডেণ্ট থেকে পাওয়া, ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ মুনাফা থেকে পাওয়া, ৫১˙৬১ কোটি টাকা কৃৎকৌশলের

মূল্য বাবদ পাওয়া এবং ১৫·৮১ কোটি টাকা স্বত্বাধিকারের প্রণামী ( রয়ালটি ) বাবদ পাওয়া। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী ডিভিডেন্ড হিসাবে বিদেশী কোম্পানীগুলো যে টাকা দেশে পাঠায় ১৯৭১ সালের পর থেকে প্রতি বছর তা ১২ কোটি টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য খাতেও দেশে পাঠানো টাকার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। লুণ্ঠনের আর এক পদ্ধতি হচ্ছে সদর দপ্তরের ব্যয় হিসাবে অর্থ প্রেরণ। ১৯৬৬-৭১ কালপর্বে গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক সদর দপ্তরের ব্যয় বাবদ দেশে পাঠিয়েছিল ৪·২১ কোটি টাকা। একই বছর ডিভিডেন্ড খাতে ব্যাংক দেশে পাঠিয়েছিল ৫·৮৮ কোটি টাকা।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার দ্বারা পরিচালিত গবেষণার ভিতর দিয়ে এই তথ্যই প্রকাশ পেয়েছে যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো অতি উচ্চ মূল্য আদায় করে এদেশে যে কৃৎকৌশল নিয়ে এসেছে সেগুলো কার্যতঃ তৃতীয় সারির ( অর্থাৎ বহু পুরোনো ) কৃৎকৌশল এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সেই কৃৎকৌশল এই দেশের চাহিদা পূরণের উপযোগী নয়। তার ফলে দেখা দিয়েছে আর এক সমস্যা। অকেজো কৃৎকৌশল গ্রহণ করে ভারত তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সংশোধনের জন্য সম্পূর্ণভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

কৃৎকৌশল হস্তান্তরের জন্য আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো ভারতীয় শিল্পে অংশীদারত্ব দাবী করে। এই দাবী একেবারেই অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক। বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল বিষয়ক ভারতের জাতীয় কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছেন, "কৃৎ-কৌশল সংগ্রহের জন্য ভারতীয় কোম্পানীতে বিদেশীদের অংশীদার করার কোন প্রয়োজন নেই। কোম্পানীতে বিদেশী অংশীদার থাকলে পরনির্ভরতা আসে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবস্থাপনা প্রভাবিত হবার আশঙ্কা থাকে। যেখানে কৃৎ-কৌশল অথবা সমগোত্রীয় কৃৎকৌশল সংগ্রহের আর কোন বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং যেখানে বৈদেশিক সহযোগিতা ছাড়া অনুরূপ কৃৎকৌশল সংগ্রহের আর কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, একমাত্র সেই সব ক্ষেত্র ছাড়া অপর কোন ক্ষেত্রে বিদেশী অংশীদার গ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।"

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় প্রভাব বিস্তার করছে এবং তাদের চাপে সহযোগী অংশীদারদের পক্ষে নতি স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকছে না। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক সহযোগিতার কয়েকটি চুক্তি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-গুলোর দ্বারা কৃৎকৌশলের ব্যবহার, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং রপ্তানির ব্যাপারে বিধিনিষেধমূলক ধারা চাপানো হয়েছে।

ভারতে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো এই মর্মে এক গালগল্প চালু করেছে যে তারা গবেষণা ও বিকাশের জন্য প্রভূত সময়, শক্তি ও সম্পদ ব্যবহার করে। সরকারী নথিপত্রে প্রকাশ পেয়েছে যে এক বছরে (১৯৭৩-৭৪) গবেষণা ও বিকাশের জন্য ভারতে ব্যয় হয়েছে ২৪৬ কোটি টাকা। তার অধিকাংশটাই এসেছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তহবিল থেকে ! এতে বে-সরকারী শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্র ব্যয় করেছে মাত্র ২৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৮ শতাংশ মাত্র। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ আরও নগণ্য। ভারতে বিদেশী কোম্পানীর ১৯৭টি অধঃস্তন সংস্থার মধ্যে ১১৭টির কোন নিজস্ব গবেষণাগার নেই।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো নতুন একদল অভিজাত কর্মচারী এবং নির্বাহী তৈরী করে ভারতের গুরুতর ক্ষতি সাধন করছে। এদের প্রচুর বেতন দেওয়া হয়, তবে সেটা ভারতের সাধারণ বেতন-হারের তুলনায়। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-গুলোর সদর ঘাঁটির দেশের তুলনায় সেই বেতন কিন্তু যথেষ্ট কম। যাই হোক, এই নতুন অভিজাত সম্প্রদায় ভারতের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং সেটা তারাও বুঝতে পারছে। তাদের জীবনযাত্রার ধরণ ধারণ বিদেশ থেকে আমদানী। এই জীবনযাত্রার চলতি নাম হয়েছে "আটলাণ্টিক কালচার"। ভারতীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে এরা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দুই পক্ষই পরস্পরের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন। উপরন্তু, যে সব আন্তর্দেশীয় কোম্পানীতে এরা চাকরী করে, তাদের প্রতি ছাড়া আর কারও প্রতি এদের আনুগত্য নেই। এমন কি জন্মভূমির প্রতিও নয়। কোম্পানীর প্রতি এই অনন্য আনুগত্য সত্যিই খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ আন্ত-র্দেশীয় কোম্পানীর স্বার্থের সঙ্গে দেশের স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। দুই পক্ষের স্বার্থের মিল থাকা মোটেই সম্ভব নয়।

সুপরিচিত আন্তর্দেশীয় কোম্পানী রনসনের ব্রিটিশ শাখার চেয়ারম্যান ডব্লিউ-জে-কেনিয়ন জোনসের বক্তব্য উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেছেন, "আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীর ম্যানেজারকে জাতীয়তা-বাদের মনোভাব ত্যাগ করে হৃদয়ংগম করতে হবে যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার আনুগত্য মাতৃ-কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারের প্রতি ন্যস্ত এবং তাদের স্বার্থ তাকে রক্ষা করতে হবেই। সেখানে যদি তার কাজ-কারবারে দেশের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাতেও তার পিছু পা হলে চলবে না।"

ভারতে একাধিক আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর ক্রিয়া-কলাপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে এই কোম্পানীগুলোর সঠিক চরিত্র আরও ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে।

দেশের ভেষজ শিল্পের কথাটাই ধরা যাক। ১৯৭৮ সালে ভারতে প্রায় ৮৫০ কোটি টাকার ঔষধপত্র তৈরী হয়। তার মধ্যে বিদেশী কোম্পানীগুলোর অংশ ছিল ৩৫৫ কোটি টাকার। বিদেশী ঔষধ কোম্পানীগুলো এমন একটা স্থান নিয়ে বসে আছে, যেখান থেকে তাদের পক্ষে কলকাঠি নাড়া খুব সহজ।

এদেশে ৪৫টি বিদেশী ঔষধ কোম্পানীতে বিদেশী শেয়ারের সংখ্যা ৪০ শতাংশেরও বেশী। ১৪টি কোম্পানীতে বিদেশীদের শেয়ারের সংখ্যা ৭৪ শতাংশের বেশী। আরও ১১টি বিদেশী কোম্পানীতে বিদেশী শেয়ার ৫১ থেকে ৭৪ শতাংশের মধ্যে। অপর ১৩টি বিদেশী কোম্পানীতে বিদেশীদের শেয়ার ৪০ থেকে ৫১ শতাংশ। কয়েকটি কোম্পানীর ষোলো আনা শেয়ারই বিদেশীদের হাতে। ১৮টি বিদেশী ফার্মের মালিক আমেরিকা, ১৩টির গ্রেট ব্রিটেন, ৬টির সুইজারল্যাণ্ড এবং ৪টির পশ্চিম জার্মানী। আরও ৩টির মালিক অন্যান্য দেশ।

১৯৭৬ সালে বিপুল পরিমাণ ঔষধ উৎপাদন শিল্পে বিদেশী কোম্পানী ছিল ৪০ শতাংশ মালিকানার অধিকারী। আর ফর্মুলা-ভিত্তিক ঔষধ উৎপাদন শিল্পে তারা ছিল ৪১.৭ শতাংশ মালিকানার অধিকারী। ১৯৭৫ সালে তারা ছিল ৫৩.৪ শতাংশের মালিক। এক বছরে বিদেশী মালিকানার পরিমাণ যে নেমে গেল, তার কারণ ঐ বছর (১৯৭৬) সরকারী কারখানায় ঔষধের উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে ঔষধের উৎপাদনে বিদেশী কোম্পানীর আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়েছিল। ভারতে ঔষধ উৎপাদনের কলকারখানার সংখ্যা ২৫০০, কিন্তু সে ক্ষেত্রে মাত্র ৪৫টি বিদেশী কোম্পানী দেশের ঔষধের বাজার পুরোপুরি কব্জা করে রেখেছে। তাতেই প্রমাণ হচ্ছে ঔষধ শিল্পে বিদেশী কোম্পানীগুলোর অংশ কী বিরাট।

পণ্যের মূল্য নির্ধারণে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কি অপকৌশল অবলম্বন করে এখানে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ঋষিকেশে আই-ডি-পি-এলের ( ইণ্ডিয়ান ড্রাগ্‌স্‌ এণ্ড ফার্মাসিউটিকালস লিমিটেড ) কারখানায় উৎপাদন শুরু হবার আগে ১০০টি টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল বিক্রী হত ১০০ থেকে ১১৮ টাকা দরে। অর্থাৎ এক একটি ক্যাপসুলের দাম ছিল এক টাকারও বেশী। ঋষিকেশ কারখানা ১০০ ক্যাপসুল ৪৬ টাকা দরে বিক্রী করতে সক্ষম হয়। তার ফলে বিদেশী কোম্পানীগুলোও টেট্রাসাইক্লিনের দর নামিয়ে ৫৬ টাকা ( ১০০ ক্যাপসুল ) করে। ফর্মুলা-ভিত্তিক ঔষধ তৈরীর জন্য এই

বিদেশী কোম্পানীগুলো যে বৃহৎ পরিমাণ টেট্রাসাইক্লিন ও অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন আমদানী করত, তার এক কিলো গ্রামের দাম পড়ত ২৫০ টাকা কিন্তু তারা এক একটি ক্যাপসুল বেচত ১ টাকা দরে। কিন্তু আমদানীকৃত টেট্রাসাইক্লিন ও অক্সি-টেট্রাসাইক্লিনের দাম যখন বেড়ে গিয়ে হল ৬৫০ টাকা ও ৭৪৯ টাকা (প্রতি কিলো) তখন সেই একই বিদেশী কোম্পানীগুলো ক্যাপসুলের দাম কমিয়ে করল ৫৫ টাকা এবং ৬৩ টাকা ( প্রতি ১০০ ক্যাপসুল )। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ঔষধটি সস্তায় বাজারে ছেড়েছিল বলেই বিদেশী কোম্পানীগুলো ঔষধটির দাম কমাতে বাধ্য হল।

পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে দে'জ মেডিকালের উদ্যমের ফলে, যাতে বিদেশী কোম্পানীগুলো কোন কোন ঔষধের ক্যাপসুলের দাম ৫ টাকা থেকে ৯০ পয়সা পর্যন্ত কমাতে বাধ্য হয়েছিল।

বড় বড় আন্তর্দেশীয় কোম্পানী কর্তৃক ঔষধের বাজার দোহনের ঘটনা ভারতের বাইরে অন্যত্রও ঘট্‌ছে। সত্যি কথা বলতে কি সারা বিশ্বেই চলছে এই শোষণ। ১৯৭০ সালে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজের (আই-সি-আই) ডেপুটি চেয়ারম্যান ডাঃ এ স্পিংকস বলেছিলেন : "১৯৮৫ সালের মধ্যেই মানবিক স্বাস্থ্য পণ্যের বিপনন দাঁড়াবে ২২০০ কোটি ডলারের মত এবং অসংখ্য আন্তর্জাতিক কোম্পানী এই বিশ্ব বিপননের বৃহৎ অংশে ভাগ বসাবে।" আমেরিকা, ব্রিটেন এবং হল্যান্ডের প্রধান প্রধান ৫০টি উৎপাদক সংস্থা ঐ সব দেশে ঔষধ উৎপাদন ও বন্টনের ৯৬ শতাংশ দখল করে বসে আছে।

এই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কি ভাবে প্যাঁচে ফেলে, সেটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। জেনেভার ইন্টারন্যাশানাল লেবার অর্গানাইজেসনের (আই-এল-ও) ইন্টারন্যাশানাল ফেডারেশন অফ কেমিকেল এন্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী চার্লস লেভিনসন বলেছেন যে, যে ঔষধটা বিশ্বের খুচরো বাজারে ১০ ডলারে বিক্রী হয়, তার উৎপাদন-ব্যয় ১.৯৩ ডলার মাত্র। তিনি বলেছেন, "উৎপাদন-ব্যয়ের সঙ্গে আরও ৩১ সেন্ট জোড়া হয় গবেষণা খাতে ব্যয়ের জন্য, ৫৭ সেন্ট জুড়তে হয় প্যাকিং খাতে ব্যয়ের জন্য, ৭২ সেন্ট জুড়তে হয় উদ্যোগ ও অন্যান্য খাতে ব্যয়ের জন্য, ৭২ সেন্ট জুড়তে হয় ক্ষয় ক্ষতি খাতে ব্যয়ের জন্য, আর ৪৯ সেন্ট উৎপাদনের মুনাফা খাতে ব্যয়ের জন্য। তাহলে ঔষধটা পাইকারের কাছে আসছে ৪.৮২ ডলার মূল্যে। পাইকার সেটা ঔষধের দোকানে বেচছে ৫.৪৫ ডলারে। ক্রেতা তখন দিচ্ছে ৮.১৩ ডলার এবং সেই সঙ্গে ট্যাক্স বাবদ আরও ১.৮৩ ডলার। সব মিলিয়ে এসে পৌঁছোচ্ছে প্রায় দশ ডলারের কাছাকাছি।

উন্নয়নশীল দেশগুলোয় যে গলা-কাটা মুনাফাবাজী চলে, উপরের মুনাফা-বাজীর ঘটনাটি সেই তুলনায় একেবারেই নগণ্য। ইউসেডের (USAID) মারফৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশে ঔষধ সরবরাহ বিষয়ে মার্কিন সিনেটের একটি কমিটি আছে। তার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন গেলর্ড নেলসন। তিনি বলেছেন, "ইউরোপের বাজারে ঔষধপত্র যে দরে বিক্রয় হয়, আমাদের সরবরাহ করা ঔষধের দরের সঙ্গে তার আদৌ কোন মিল নেই। মার্কিন সাইনামিড কোম্পানী সাইনামিড পাকিস্তানের কাছে টেট্রাসাইক্লিন বিক্রয় করেছে ২৭০ ডলার (কিলো প্রতি) দরে, অথচ সেই জিনিষই ইউরোপীয় বাজারে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিক্রয় হচ্ছে ২৪ থেকে ২৯ ডলার (কিলো প্রতি) দরে।"

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোতেই যে এমন ঘটনা ঘটে, তেমন মনে করার কোন হেতু নেই। আমেরিকার ব্রিস্টল কোম্পানী একই জিনিষ ব্রিস্টল কোলাম্বিয়ার কাছে বিক্রয় করেছে ২৫০ ডলার (কিলো প্রতি) দরে এবং ব্রিস্টল পাকিস্তানের কাছে বিক্রয় করেছে ১৯০ ডলার দরে। এই দরের যে কত তারতম্য হতে পারে তার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ফাইজারের এণ্টি-বায়োটিক ঔষধ ডোক্সিসাইক্লিন (ভাইব্রামাইসিন) পাকিস্তান ও কোলাম্বিয়ায় সরবরাহ করা হয়েছে ১৭৫০ ডলার দরে অথচ সেই জিনিষই ইউরোপের বাজারে বিক্রয় হয়েছে ২৪ থেকে ২৯ ডলারের মধ্যে। এই কোম্পানী উন্নয়নশীল দেশগুলোয় (সে দেশ লাতিন আমেরিকাতেই হোক আর এশিয়াতেই হোক) ৭০০০ শতাংশেরও বেশী দরে ঔষধ বিক্রয় করে থাকে। একই কোম্পানী পাকিস্তানে টেরামাইসিন সরবরাহ করেছে ১০০ ডলার (কিলো প্রতি) দরে, অথচ সেই জিনিষই ইউরোপে সরবরাহ করেছে ১৩ ডলার দরে। ব্রিস্টল কোম্পানী ব্রিস্টল কোলাম্বিয়ার কাছে এম্পিসিলিন ট্রিহাইড্রেট বিক্রয় করেছে ৪২০ ডলার (কিলো প্রতি) দরে, অথচ সেই জিনিষই ইউরোপে বিক্রয় করেছে ১৫০ ডলার দরে। মার্কিন কোম্পানী ওয়েথ (Wyeth) চিলিতে তার অধস্তন সংস্থার কাছে বেঞ্জাথাজিন পেনিসিলিন বিক্রয় করেছে ২১৫.৭৫ ডলার দরে, অথচ সেই জিনিষই ইউরোপে বেচেছে ৩১/৩২ ডলার দরে। মার্কিন রোশ (Roche) ঘুমপাড়ানী লেবারিয়ামের কারবার করে। তারা ঐ জিনিষটি মেরেক পাকিস্তানের কাছে বেচেছে ২৪৫ ডলার দরে কিন্তু ইউরোপের বাজারে এর প্রকৃত দাম হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ ডলার। মেরেক কোম্পানী তার পাকিস্তান শাখার কাছে এনর্থিষ্ট্যামিন বিক্রয় করেছে ১৬০০ ডলার (কিলো প্রতি) দরে অথচ সেই বস্তুটিই ইউরোপের বাজারে বিক্রয় হয় ২০.৫০ ডলার দরে।

এই ক্ষেত্রের অধিকাংশ বিদেশী কোম্পানী মাল তৈরী করে রপ্তানির জন্য।

সুইজারল্যাণ্ডের ঔষধ উৎপাদকরা তাঁদের উৎপন্ন ঔষধের ৯৬ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি করে। স্বদেশে কাঁচামালের সরবরাহ সীমাবদ্ধ থলে তারা সরল প্রথায় বৃহৎ পরিমাণের মৌলিক ঔষধ উৎপাদনের পরিবর্তে বিশেষ ধরনের উচ্চ মূল্যের ঔষধ উৎপাদনের দিকেই সব সময় বেশী নজর দেয়। দুনিয়াব্যাপী অধঃস্তন সংস্থার মাধ্যমে তারা কাজ কারবার করে। এদের মধ্যে একটি বৃহৎ ইউনিট ৪১টি দেশে ৯০টি অধঃস্তন সংস্থার অধিকারী।

সারা দুনিয়ায় কয়েক হাজার ঔষধ উৎপাদক রয়েছে। তার মধ্যে শীর্ষদেশে অবস্থানকারী ২০টি কোম্পানী দুনিয়ার ঔষধের কারবারের ৬০ শতাংশ কুক্ষিগত করে রেখেছে। এই ২০টি কোম্পানী তাদের অধঃস্তন সংস্থার মারফৎ কাজ-কারবার চালায়। তাদের দ্বারা তৈরী মোট ঔষধের মাত্র ২০ শতাংশ তৈরী হয় তাদের নিজেদের দেশে। বাকীটা তৈরী হয় তাদের সমুদ্রপারের অধঃস্তন সংস্থা গুলোয়। তাতে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মুনাফার পাহাড় আরও সম্প্রসারিত হয়।

ভারত সহ কোন উন্নয়নশীল দেশেই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কোন নতুন আবিষ্কার করে না। তাদের কাজ হচ্ছে শুধু ব্র্যাণ্ড নাম (নাম-ছাপ) চালু করা। কখনও পুরোপুরি, কখনও সামান্য অদল বদল করে। ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হাতী কমিটি ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্পে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর নানা অপকর্মের কথা উল্লেখ করে সেদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কমিটি বলেছেন,

"দুই একটি ছাড়া বাকী আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো গবেষণার ব্যাপারে যে বক্তব্য প্রকাশ করে তা হল এই যে নতুন ঔষধের জন্য মৌলিক গবেষণার জন্য বিজ্ঞানের নানা বিভাগের কর্মীদের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন। তার জন্য চাই প্রচুর অর্থ এবং উঁচুদরের গবেষক বিজ্ঞানী। সুতরাং গবেষণার কাজ নানা দেশে ছড়িয়ে না দিয়ে কোম্পানীর সদর ঘাঁটির দেশে হওয়াই ভাল···বিদেশী কোম্পানী-গুলো উষ্ণমণ্ডলীয় দেশের রোগ নিরাময়ের ঔষধ নিয়ে কোন গবেষণা করতে অনিচ্ছুক। কারণ তারা মনে করে, ঐ ধরনের ঔষধের আন্তর্জাতিক চাহিদা এত কম যে সেই গবেষণা লাভজনক হয়ে উঠবে না।"

আর এক বৃহদাকার আন্তর্দেশীয় কোম্পানী নেসলের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে শুধু "নেসকাফে" বেচে দু পয়সা কামিয়ে নেওয়াই নেসলের কাজ নয়। নেসল ইণ্টারন্যাশানাল ট্রাস্ট মার্কিন ও সুইস পুঁজির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোম্পানীর রেজিস্ট্রিকৃত সদর দপ্তর হচ্ছে বহমাসে। কারণ সেখানে ট্যাক্সের

সুযোগ সুবিধা অনেক। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেস্‌লে হচ্ছে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মধ্যে মুখ্য স্থানের অধিকারী। এই কোম্পানী ভারত সহ বিশ্বের ৪১টি দেশে মূলধন লগ্নী করেছে। এদের অধিকারে রয়েছে মুখ্য উৎপাদনী ফার্ম এবং ৩০৪টি কারখানা। এর মোট মূলধন ৬০০ কোটি ডলার। ১৯৭৭ সালে নেস্‌লে ৯৫০ কোটি ডলারের পণ্য বিক্রয় করেছিল। নেস্‌লের কর্মচারী সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার। নেস্‌লে কারখানায় বিস্কুট, মিষ্টান্ন, চকোলেট, মারমালেড, কাজুবাদাম, টিনে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদন করে। বর্তমানে নেস্‌লে হোটেল ও রেস্তোরাঁর কারবারেও নেমে পড়েছে।

ভারতের বাজারে ক্যাডবারীর নামও সুপরিচিত। এই কোম্পানী 'ক্যাডবারী ফ্রাই প্রাইভেট লিমিটেড' নামে ১৯৪৮ সালে ভারতে নাম রেজিষ্ট্রি করে। এই কোম্পানী চকোলেট ছাড়াও কোকো-ভিত্তিক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত এবং বিক্রয় করে। এটি ব্রিটিশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানী ক্যাডবারী স্কুপেন ওভারসীজ লিমিটেডের অধঃস্তন সংস্থা এবং এই অধঃস্তন কোম্পানীর ষোলো আনা মালিকানাও বিদেশী-দের হাতে। ১৯৭২ সালে এর মূলধন ছিল ১২৯৬১০০০ টাকা। এই মূলধন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে লণ্ডনস্থ পিতৃ-কোম্পানী।

ভারতে কোকোভিত্তিক খাদ্যদ্রব্যের ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এই কোম্পানী। ডিভিডেন্ড হিসাবে কোম্পানী ১৯৭৫ সালে দেশে পাঠায় ৩২৪০৪৫০ টাকা এবং ১৯৭৬ সালে পাঠায় ৩৫৬২৩৩০ টাকা। এটা শেয়ার-মূলধনের চেয়ে ২৫০ শতাংশ বেশী। ১৯৭৭ সালে এই কোম্পানী মজুত তহবিল থেকে ১৩৬০০০০০ টাকা মূলধনকে স্থানান্তর করে এবং কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৯০৫১৫০ টাকা।

ক্যাডবারী এবং নেস্‌লে কেউই এদেশে উঁচু দরের কৃৎকৌশল নিয়ে আসেনি। তাদের এই মুনাফাটা স্রেফ লুণ্ঠন ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে কাজ কারবারে লিপ্ত অন্যান্য আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপ থেকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। আসল কথাটা হচ্ছে এই ভারতের শিল্পায়ন প্রচেষ্টায় আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল স্থানীয় কাঁচামাল ও সস্তার শ্রমিক শোষণ করে সর্বোচ্চ হারে মুনাফা কামানো।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যে কী বিপুল সম্পদের মালিক তা যে কোন একটি কোম্পানীর হিসাব দেখলেই টের পাওয়া যায়। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-গুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ চোখ ধাঁধানো গাণিতিক সংখ্যা ছাপিয়ে যায়। ১৯৭৭ সালে সারা বিশ্বের মোট জাতীয় পণ্যের (জি-এন-পি) মূল্য ছিল ৩৯০০

বিলিয়ান ডলার ( ১ বিলিয়ান=শত কোটি )। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর উৎপন্ন পণ্যের মূল্য এর এক ষষ্ঠমাংশ এবং সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়ার মোট জাতীয় পণ্যের এক চতুর্থাংশ। ১৯৭৫ সালে গ্রেট ব্রিটেনের মোট জাতীয় পণ্যের মূল্য ছিল ২২৪.৭ বিলিয়ান ডলার, পশ্চিম জার্মানীর ৪২৩.৪ বিলিয়ান ডলার, ফ্রান্সের ৩২৬.৪ বিলিয়ান ডলার এবং ইটালীর ১৬৮.৯ বিলিয়ান ডলার। আমেরিকার মোট জাতীয় পণ্যের মূল্য ছিল ১৫০৪.৮ বিলিয়ান ডলার।

১৯৭১ সালে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর ( তার মধ্যে ৫০টি অতি বৃহদাকারের ) অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ পুঁজিবাদী দুনিয়ার সকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সম্পদের চেয়ে বেশী। বৃহত্তম আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো বহু সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী।

## সূত্র ও উল্লেখপঞ্জী

১। কার্টেল্‌স, পেটেন্ট্‌স্‌ এণ্ড পলিটিক্‌স্‌।
২। ভি. গৌরীশঙ্কর, মেইনষ্ট্রীম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

## আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর আসল চেহারা

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর আসল চেহারাটা কি রকম ? আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের ( টি-এন-সি ) এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনের ( এম-এন-সি ) মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ?

টি-এন-সি এবং এম-এন-সিকে যে নামেই ডাকা হোক, তাদের অর্থ একই। এরা হল বিরাট বিরাট বে-সরকারী কোম্পানী। সমগ্র পুঁজিবাদী জগত জুড়ে এদের কারবারের জাল বিস্তারিত। এদের ক্রিয়াকলাপ বিচার করলে আন্তর্জাতিক কোম্পানী আখ্যা দিতেও কোন বাধা নেই।

এই কোম্পানীগুলো জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে দূর দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরা কলকারখানায় পণ্য উৎপাদন করে বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করে। সেই সব পণ্যের বন্টন ব্যবস্থা খুবই সুসংহত। সেদিক দিয়ে বিচার করলে এগুলো সত্যিই আন্তর্জাতিক কোম্পানী।

তা সত্ত্বেও এই কোম্পানীগুলো প্রধানত তাদের সদর ঘাঁটি থেকেই কাজ কারবার চালায় এবং ঘাঁটিগুলো বড় বড় পুঁজিবাদী দেশে অবস্থিত। **ফরচুন** পত্রিকা ১৫টি বৃহত্তম আন্তর্জাতিক কোম্পানীর যে তালিকা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে ১১টির সদর ঘাঁটি আমেরিকায়, দুটির সদর ঘাঁটি গ্রেট ব্রিটেনে, এবং একটির হল্যাণ্ডে ; একটিমাত্র কোম্পানীর মালিকানা ব্রিটেন ও হল্যাণ্ডের মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত।

তাই এদের ঠিক আন্তর্জাতিক কোম্পানী বলা চলে না, আবার দুই দেশের দুই কোম্পানীর মিলনজাত কোম্পানীও এগুলো না। অবশ্যই দুই দেশের দুই কোম্পানীর মিলনের দৃষ্টান্তও কিছু কিছু আছে বটে তবে সাধারণত এই কোম্পানীগুলো নির্দিষ্ট দেশে ঘাঁটি গেড়ে অধঃস্তন সংস্থা এবং শাখা সংস্থার মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় কাজ কারবার চালিয়ে থাকে। সুতরাং এই কোম্পানী-গুলোকে বহুজাতিক বলে বর্ণনা করা উচিত নয়। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীই বোধ হয় এদের সঠিক সংজ্ঞা, কারণ নানা দেশের সীমানা অতিক্রম করেই চলে এদের কাজ কারবার, কিন্তু সেটা পরিচালিত হয় সদর ঘাঁটির দেশ থেকে।

তার চেয়ে বড় কথা, তহবিল স্থানান্তর অধঃস্তন সংস্থার জন্য বাজার বরাদ্দ এবং নতুন কলকারখানা বসাবার স্থান নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়গুলো কোম্পানীর গোপনতম সিদ্ধান্তের ব্যাপার হিসাবে পরিগণিত হয়। এ সব জিনিষ নিয়ে প্রকাশ্যে কোন আলোচনা হয় না। আলোচনা হয় একমাত্র সদর ঘাঁটির দেশের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এবং সেটাও হয় গুরুতর চাপের মধ্যে। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া আর কেউ সেই গোপন তথ্য জানতে পারে না।

এই কোম্পানীগুলোর সর্বোচ্চ শিখর হচ্ছে সদর দপ্তর (ঘাঁটি)। সেটাই হচ্ছে কোম্পানীর মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু-কেন্দ্র। অধঃস্তন সংস্থাগুলো হল নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনরত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যেহেতু ৭০ শতাংশেরও অধিক আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর মালিক আমেরিকা, সেইহেতু তাদের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকেন্দ্র আমেরিকাতেই অবস্থিত। এই ধরণের একটি কোম্পানী হচ্ছে আই-বি-এম। এরা আমেরিকার ভূমিতে ছাড়া আর কোথাও পুরো কম্পিউটর উৎপাদন করে না। তাই পরিকল্পনা প্রণয়ন অথবা তহবিল বরাদ্দ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে ভিনদেশের কারও সঙ্গে তাদের আলাপ আলোচনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আই-বি-এম যন্ত্রাংশ বানিয়ে নেয় এবং সেগুলোকে জুড়ে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্দেশীয় পণ্যে পরিণত করে।

সেদিক দিয়ে দেখলে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকেন্দ্র যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত সে কথা বলাই বাহুল্য। একসময় চার্লস্ উইলসন্ ছিলেন জেনারেল মোটরস্-এর প্রেসিডেণ্ট। সেখান থেকে তিনি পরে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বলেছেন, "আমি চিরকালই মনে করি, দেশের পক্ষে যেটা মঙ্গলজনক, জেনারেল মোটরসের পক্ষেও সেটা মঙ্গলজনক এবং তার উল্টোটা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য"।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর প্রকৃত মালিক কারা, তা জানবার সুযোগ সাধারণ মানুষ পান না। কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দেখে অনেক সময় মনে হয়, তাঁরাই এই সমস্ত বৃহদাকার কর্মযজ্ঞশালার আসল হোতা। কিন্তু সেটা নিছক ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। রয়াল ডাচ শেল কোম্পানীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান (১৫টি বৃহত্তম আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের অন্যতম) অধ্যাপক ম্যাকফাদজিয়ান এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করে বলেছেন, "আমাদের কোন জেনারেল ম্যানেজার যদি এমন কোন অগ্রিম পরিকল্পনা পেশ করেন, যার লক্ষ্য সর্বোচ্চহারে মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে শেয়ার হোল্ডারদের

মোটামুটি খুশী রেখে কারবার সম্প্রসারণের উপযোগী মূলধন সংগ্রহ করা, তাহলে তাকে বরখাস্ত করা হবে।"

সুতরাং আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর একমাত্র লক্ষ্য হল সর্বোচ্চ হারে মুনাফা সংগ্রহ করা। কিছুকাল আগে আর এক বৃহদাকার আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ইউনিলিভার "বাণিজ্য ও সমাজ" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। সেই পুস্তিকায় অন্যান্য বিষয়ের সংগে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয় যে "আজকের দিনের ম্যানেজারকে প্রায়শঃ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে তার ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং সম্ভবত তার বর্তমান নিরাপত্তাও মুনাফার মাত্রার উপর সরাসরি নির্ভরশীল।" এটাই হল সার কথা।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন অতি বৃহদাকারের সংস্থা বটে তবে তাদের সংখ্যা বেশী নয়। বেশ কিছুকাল আগেই মার্কিন মুলুকে এই ধরনের বিকাশ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। তারও আগে আমেরিকার ৫০০০ কোম্পানী পরস্পরের সংগে সংযুক্ত হয়ে ৩০০ ট্রাস্ট গঠন করে বাজার ও শিল্পের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তার মূল উদ্দেশ্য হল কারবার একচেটিয়া করে ট্রাস্টের জন্য সর্বোচ্চ হারে মুনাফা সংগ্রহ করা। আজ সেই প্রক্রিয়া সত্যিই অতি বৃহৎ আকার ধারণ করেছে।

**ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল** মাল্টিন্যাশানাল কর্পোরেশনের ( টি-এন-সি ) সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে, "বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য সংস্থাগুলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর মত প্রাচীন হলেও মাল্টিন্যাশানাল কর্পোরেশন প্রধানত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের প্রপঞ্চ এবং বিগত এক দশকে এ দেখ দেখ করে বেড়ে উঠেছে। এর কোন সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। কিন্তু এটা সবাই মেনে নিয়েছেন যে মাল্টিন্যাশানালস্ হল সেই সব কোম্পানী যারা নানা দেশে উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিক এবং বিশ্বব্যাপী মূলধন সংগ্রহের সুযোগপ্রাপ্ত। এর ব্যবস্থাপনায় একটা "বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি" বিদ্যমান। মার্কিন মুলুক ভিত্তিক ২০০ মাল্টিন্যাশানাল সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য। জেনারেল মোটরস্, আর-সি-এ, আই-বি-এম, ডাউকেমিকালস এবং অন্যান্য ব্লু চিপস ( যাদের শেয়ারের বাজার দর সব সময়ই তেজী থাকে )।"[১]

আন্তর্দেশীয় কোম্পানী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এল-ব্রাউন সঠিক ভাবেই লিখেছেন যে, লোকে বলত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। এখন যায়। কিন্তু এখন জেনারেল মোটরস্, মিৎসুবিশি, ভকস্‌ওয়াগেন, ইউনিলিভার এবং ক্রাইসলারের মত কয়েক ডজন কর্পোরেশনের সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো আজকের মত বৃহদাকার হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। তার কয়েকটি কারণও আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনীতির সাধারণ অবস্থা ছিল সংকটজনক। একটি পৃথক সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-বাজার সৃষ্টি তার অন্যতম কারণ। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত এবং বিপন্ন শিল্প পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর মূলধন লগ্নীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া তার নিজের সম্পদ দিয়েই নিজের সমস্যার সমাধান করে নেয় এবং অবিলম্বেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধ জনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে ফেলে। তাদের এই সাফল্যের মূলে তার নতুন সমাজ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় দেশে দেশে বৈদেশিক বিনিময় সম্পদের সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। শিল্পের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইউরোপের শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদিকায় স্থবিরতার পরিস্থিতি দেখা দেয়। সর্বত্র স্থানীয় সম্পদের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই স্থানীয় সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক লগ্নী আহবান করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানীর আয় আটকে দেওয়া হয়। তখন তাদের পক্ষে উদ্বৃত্ত অর্থ পুনর্লগ্নী করা ছাড়া উপায় থাকে না। ইউরোপে তখন মার্কিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বৃহদাকার উৎপাদন পদ্ধতি চালু করার আওয়াজ ওঠে। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকাই লাভবান হয় সব চেয়ে বেশী। আমেরিকা ছিল প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাই ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলোর শিল্প ও অর্থনীতি যুদ্ধে যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, আমেরিকার তা হয়নি। উপরন্তু সারা দুনিয়ায় যুদ্ধের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে মার্কিন শিল্পের প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। যুদ্ধের পর ইউরোপে সাধারণভাবে উৎপাদন উর্ধমুখী হয়। একমাত্র ব্রিটেনে মূলধন লগ্নী করলেই স্বাধীন-বাণিজ্যের জগতের ১০ কোটি খরিদ্দারের সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট উন্নতির ফলে সারা দুনিয়ায় দেখা-শোনার যোগাযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। এ সবের ফলেও এই কালপর্বে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো রাতারাতি বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

তবে একথাও ঠিক যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর আবির্ভাব পুরোপুরি যুদ্ধোত্তরকালের ঘটনা নয়। প্রক্রিয়াটা সুরু হয় অনেক আগে থেকে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা বিরাটাকার ধারণ করে। পৃথিবীতে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর অস্তিত্বের সূচনা নাকি ১৮৬০ সাল থেকে। জার্মানীর ফ্রেদেরিক বেয়ার ছিলেন এর পূর্বসূরী। ১৮৬৫ সালে তিনি নিউইয়র্ক স্টেটের আলবেনীতে

একটি এনিলাইন কারখানার শেয়ার ক্রয় করেন। সুইডেনের ডিনামাইট আবিষ্কর্তা আলফ্রেড নোবেল হামবুর্গে একটি বিস্ফোরক পদার্থের কারখানা স্থাপন করেন। ১৮৬৭ সালে আমেরিকার সিঙ্গার সেলাইকল কোম্পানী সমুদ্রপারে প্রথম কারখানা খোলে গ্লাসগোয়। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "সিঙ্গারই প্রথম কোম্পানী যারা মূলত একই নামের এবং একই আকারের পণ্য উৎপাদন করে সেই পণ্য ব্যাপক ভাবে সারা দুনিয়ার বাজারে বেচতে সুরু করে। প্রথম মাল্টিন্যাশানাল হিসাবে দাবী করার অধিকার এরই সবচেয়ে বেশী।"[২]

আন্তর্জাতিক কোম্পানী অবশ্য কোন নতুন প্রপঞ্চ নয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে আগের পরিস্থিতি আদৌ তুলনীয় নয়। অতীতকালে ব্রিটেন ভিন দেশে প্রচুর মূলধন লগ্নী করত। কিন্তু উপনিবেশগুলো ছাড়া অন্যত্র এই লগ্নীর ফলে সাধারণত প্রকৃত সম্পত্তির মালিকানা পাওয়া যেতো না। এযুগের আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলো সরাসরি মূলধন লগ্নী করে। অন্যকথায় বলা যায়, তারা ভিন দেশে অধঃস্তন সংস্থা এবং কল-কারখানা স্থাপন করে অথবা সেগুলো অধিগ্রহণ করে। তারাই হয়ে যায় এ সবের মালিক এবং তারাই এ সব পরিচালনা করে।

ছোট খাট ব্যতিক্রম ছাড়া মার্কিন কোম্পানীগুলো ব্যাপকভাবে ভিন দেশে গিয়ে হাজির হতে থাকে। তাদের ব্রিটিশ সহযাত্রীরা কিন্তু অত ব্যাপকভাবে বাইরে যেতে পারেনি। মার্কিন কোম্পানীগুলোর এই বৈদেশিক অভিযানের ফলে বিদেশে অসন্তোষ ও ভীতির সঞ্চার হয়। ১৯০২ সালে এফ. এ. ম্যাকেঞ্জি লিখেছিলেন, "সশস্ত্র সৈন্যের সহায়তায় আমেরিকা ইউরোপের উপর আক্রমণ চালায় নি। আক্রমণ চালিয়েছে কল-কারখানাজাত পণ্য দিয়ে। এই অভিযানের নায়ক হলেন শিল্পপতি এবং লগ্নীকারকরা। তাদের বিজয় অভিযান মাদ্রিদ থেকে পিটার্সবার্গ পর্যন্ত জনগণের জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের অভিজাত বংশের ছেলেরা মার্কিন পত্নী গ্রহণ করছে এবং তাদের কোচম্যানের স্থান অধিকার করছে আমেরিকায় তৈরী মোটর গাড়ীর আমেরিকায়-শিক্ষাপ্রাপ্ত ড্রাইভাররা······আমাদের শিশুরা মার্কিন ফুড খাচ্ছে এবং আমাদের মৃতদেহ মার্কিন শবাধারে করে কবরস্থ হচ্ছে।"[৩]

১৯০২ সালেই যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে আজকের দিনে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর আগ্রাসী অভিযানে পুঁজিবাদী দেশগুলোর কোটি কোটি মানুষ কি কঠিন অবস্থার সম্মুখীন, তা সহজেই অনুমেয়।

আধুনিক আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার কেন্দ্রীয় নির্দেশনা। কোন একটি আন্তদেশীয় কোম্পানী আকারে যতই বড় হোক এবং তার যত অধঃস্তন সংস্থাই থাকুক না কেন, তার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত ও সমন্বিত হয় কেন্দ্র থেকে। ১৯১৪ সালেই আন্তর্দেশীয় কোম্পানী পাকাপাকি-ভাবে দানা বাঁধে। একই সময়ে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছিল, সেটা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়। তবে সেই সময় শুধু মোটর গাড়ী, তেল, রাসায়নিক দ্রব্য এবং এলুমিনিয়াম শিল্পের আন্তর্দেশীয় কোম্পানী স্থাপিত হয়েছিল। কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, জাহাজ নির্মাণ, বয়ন, কৃষিপণ্য এবং খাদ্যবস্তু প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি শিল্পে তখনও আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর আগ্রাসী অভিযান সুরু হয়নি।

বিশ্বের তেল ও রাসায়নিক শিল্পে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কাহিনী খুব পুরাতন। ১৯২৮ সালে শেল, এংগলো-পার্সিয়ান (পরে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম) এবং ষ্ট্যান্ডার্ড অয়েল (নিউ জার্সি) স্থির করে যে আমেরিকার বাইরে তাদের যে সব শেয়ার আছে, সেই শেয়ার একত্রিত করে তারা পরস্পর পরস্পরের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবে। সেই প্রথম সরকারীভাবে তৈল কার্টেলের আবির্ভাব ঘটে; পরে অনুরূপভাবে অন্যান্য কার্টেলেরও আবির্ভাব ঘটে। অংশীদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করবার জন্যই এই কার্টেলগুলো গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয়নি এবং কার্টেলগুলো ভেঙে যায়। সে অবশ্য আর এক কাহিনী—পুঁজিবাদী কারবারের অংশীদারদের মধ্যে গলা-কাটার প্রতিযোগিতা ও বাণিজ্যিক লড়াইয়ের কাহিনী।

কার্টেলের যত দুর্বলতাই থাক, তখনকার দিনে তারাই ছিল আধুনিক আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ।

পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক বিধি অনুযায়ী পুঁজিবাদী বিকাশের প্রক্রিয়ায় পুঁজি ক্রমেই আরও বেশী বেশী করে ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। তাকে বলা হয় মনোপলি পুঁজি। ছোট ছোট কারবার গ্রাস ও উচ্ছেদ করে মনোপলিই বাজারের ওপর একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করে। যখন বাজারে দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য থাকে, তখন তাকে বলে ডুয়োপলি। আর যখন বাজারে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য থাকে তখন তাকে বলে অলিগোপলি।

ক্রমাগত বাড়বাড়ন্তের মধ্য দিয়ে মনোপলি অতি বৃহৎ মনোপলিতে পরিণত হয়। এই বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যখন উচ্চতর পর্যায়ের সাজ-

সরঞ্জাম এবং কৃৎকৌশলের প্রয়োজন হয়, যখন বৃহত্তর মূলধনের দরকার পড়ে, যখন পুঁজি কেন্দ্রীভূত হবার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যখন পণ্যমূল্যের উপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দরকার পড়ে তখনই মনোপলি অতি-বৃহৎ মনোপলি হবার পথে এগিয়ে যায়। সব সময়ই অবশ্য মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের বাজারে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করা এবং সেইভাবে মূল উদ্দেশ্য ( সর্বোচ্চ হারে মুনাফা সংগ্রহ করা ) সাধন করা।

শিল্পগত এবং অর্থনৈতিক ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের গতি কখনও কখনও এত দ্রুত হয় যে চোখের পলক পড়ার সুযোগ মেলে না। এটা হয় সাধারণত কয়েকটি কোম্পানীর মিলনের মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সব দেশেই এমনটা ঘটে থাকে। মাত্র দুই বছরে (১৯৬৭-৬৮) ৫ সহস্রাধিক ব্রিটিশ যৌথ কোম্পানী নানা ক্ষেত্রে পরস্পরের সংগে মিলিত হয়। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সে হয় ২২০০ যৌথ কোম্পানী এবং পরের বছর হয় আরও ১৮০০টি যৌথ কোম্পানী। এই মিলনের ফলে দেশে শিল্পের কাঠামো নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। আমেরিকায় এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তারও আগে ১৯৫৮ সালে।

অতঃপর মনোপলি পুঁজির বিকাশের নতুন এবং দ্রুতগতি প্রক্রিয়ার আবির্ভাব ঘটে। আর আসে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংহতি এবং পুঁজির ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতীয়ভবন। এই ভাবে আজ ৩০০ বৃহদাকার আন্তর্দেশীয় করপোরেশন বিশ্বের মোট শিল্পোৎপাদনের তিন চতুর্থাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, বলেছেন আই-সি-এফের জেনারেল সেক্রেটারী চার্লস লেভিন। এই ৩০০ কোম্পানী পরস্পরের সংগে এমন অংগাংগীভাবে যুক্ত যে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ কেন্দ্রের প্রকৃত সংখ্যা আরও কম। যে কোন ধরনের কোম্পানীতে তাদের ডাইরেক্টরদের দেখতে পাওয়া যায়। মার্কিন পত্রিকা **ফরচুন** ১৯৬৭ সালেই লিখেছিল যে কম-বেশী ১০০০ লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ৬০টি করপোরেশনই সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র।

কোম্পানীগুলো আকারে এত বিরাট এবং তারা এত বিরাট আকারে পণ্য উৎপাদন করে যে তাদের কাছে নিজ নিজ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সীমানা লঙ্ঘন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সংহতি প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের সহায়তা এবং সরকারী পুঁজিও তার কাছে অপরিহার্য। বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের অগ্রগতির সংগে সমগ্র প্রক্রিয়া অংগাংগীভাবে জড়িত। বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অর্থনৈতিক শিল্পক্ষেত্রে নতুন ধরনের সহযোগিতার। সেবা ব্যবস্থা ও যানবাহনের সম্প্রসারণ, অতি উচ্চ স্তরের বিশেষীকৃত জ্ঞান এবং উৎপাদনে

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ইত্যাদি। সেই কারণেই ইদানিংকালে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর এই রকম বিরাট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

মনোপলিগুলো যখন দেখতে পায় যে, নিজ নিজ দেশে উচ্চতর মুনাফা অর্জন ও সম্প্রসারণের সুযোগ অতি দ্রুত গতিতে হ্রাস পাচ্ছে, তখন তারা আন্তর্জাতিক সংহতির সন্ধান করে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক মনোপলিগুলোর মধ্যে ক্রমাগত প্রচণ্ড বিরোধ লেগেই আছে। কারণ এদের মধ্যে বৃহত্তম মনোপলিগুলো সব সময়ই বিশ্বের বাজার একা দখল করার প্রয়াস পায়। শোষণ ও দখলের পথে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক শিবির মস্ত প্রতিবন্ধক বলে এদের অন্তর্বিরোধ আরও প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। পুরোনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার ফলেও এদের অন্তর্বিরোধ তীব্রতর হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেনি। দেশে দেশে উৎপাদনের চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক ধরনের কিন্তু উৎপাদনের উপায়গুলো ক্রমেই আরও বেশী করে হ্রাসমান সংখ্যক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই অভ্যন্তরীণ বিরোধ বাইরের বিরোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মনোপলি পুঁজিবাদকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে রূপান্তরিত করার পথে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

পুঁজিবাদের বিধি অনুযায়ী জাতীয় জীবনের উপর মনোপলিগুলোর ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সেগুলো রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই ভাবে একটি একক সংবদ্ধ ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে। মনোপলিরা এটাকে সর্বোচ্চ মুনাফার গ্যারাণ্টি হিসাবে অপরিহার্য বলে মনে করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দীর্ঘায়ু করার ব্যাপারেও এটাকে অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়।

অর্থাৎ আমেরিকা অথবা ইউরোপের আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলোর পেছনে রয়েছে স্ব স্ব দেশের রাষ্ট্রশক্তি।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের ঘনীভূত আকার। পুঁজিবাদের ডিম ফোটাবার যন্ত্রেই তার জন্ম এবং বৃদ্ধি এবং সর্বাধিক ব্যক্তিগত মুনাফার লালসায় লালিত পালিত। বিশ্বের সকল মহাদেশের কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করেই ঘটেছে তার মেদবৃদ্ধি। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন করপোরেশনগুলোর মুনাফা লুণ্ঠনের সীমাহীন লোভই এর চালিকা শক্তি। সর্বাধিক মুনাফা কামাবার অভিযানে করপোরেশনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করে, বিধ্বস্ত করে এবং দখল করে নেয়। এই ভাবেই গড়ে ওঠে সব বৃহদাকারের মনোপলি। ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসে এবং অন্যান্য অর্থলগ্নী সংস্থার সঙ্গে কারবার

অধিগ্রহণ করে। ক্রমে তারাই পেয়ে যায় প্রভুত্বের ভূমিকা। বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলো ক্ষুদ্রতর ব্যাঙ্কগুলোকে অধিগ্রহণ করে এবং তার মধ্য দিয়ে আবির্ভাব ঘটে কয়েকটি মনোপলি ব্যাঙ্কের। তারাই তখন একটা সংবদ্ধ শিল্প-আর্থিক সমাহারের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। যৌথ কোম্পানীগুলোর মুনাফার অভিযানে লোভের কোন শেষ নেই। পুঁজিবাদের সহজাত অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে স্বদেশে যৌথ কোম্পানীর কাজ কারবার যখন খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন সে জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে। এইভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কারবারের জাল এবং তারা আরও কাঁচামাল, আরও বাজার এবং আরও সস্তাদরে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য সারা দুনিয়া হাতড়ে বেড়ায়।

এর একটা সামগ্রিক চিত্র ঘনীভূত আকারে দেখতে পাওয়া যায় আমেরিকায়। আজ সমস্ত অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের নিজ নিজ শিল্পের একটা অংশের মালিক আমেরিকা। ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, বেলজিয়াম, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার সর্বত্রই এই চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। আমেরিকার পুঁজি যে এইরকম ব্যাপকহারে বিদেশে যেতে পেরেছে, তার একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। আমেরিকার হাতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি মজুত হয়ে যায় কিন্তু সেটা স্বদেশে লগ্নীর কোন সুযোগ ছিল না। আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ বটে, তবে একেবারে দারিদ্র্যমুক্ত-ও তো নয়। আমেরিকার এক পঞ্চমাংশ মানুষ অতি দরিদ্র অবস্থায় দিন যাপন করেন। সরকারী ভাবেই এটা স্বীকার করা হয়েছে যে আমেরিকায় সামরিক সরঞ্জাম নির্মাণের শিল্প ছাড়া বাকী শিল্প ইউনিটগুলোয় উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৬০ শতাংশ ব্যবহার করা সম্ভব হয়। মার্কিন কৃষি বিভাগ স্বীকার করেছেন যে আমেরিকার ৪ কোটি মানুষ পুষ্টিহীনতার শিকার।

১৯৪১ সালে আমেরিকার ১০০০ বৃহত্তম কোম্পানী যে পরিমাণ সম্পদের অংশীদার ছিল, ১৯৭২ সালে সেই পরিমাণ সম্পদ মাত্র ২০০ করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আমেরিকায় ৯০টি পরিবার আছে, যারা পরিবার পিছু সাড়ে ৭ কোটি ডলারের ব্যক্তিগত পুঁজির মালিক। তার মধ্যে ৩৬টি পরিবার হচ্ছে আর্থিক অলিগার্কির (ক্ষুদ্র গোষ্ঠী) প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। তার মধ্যে আছে শক্তিমান রকেফেলার্স, ডুপন্টস্, মেলন্স্, ফোর্ডস এবং মর্গ্যান। যে ঘনসন্নিবিষ্ট গোষ্ঠীগত আর্থিক ব্যবস্থা দেশে প্রাধান্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত, এরা তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ঘনসন্নিবিষ্ট গোষ্ঠীগত আর্থিক অবস্থার পরিচালনার ভার কয়েকটি ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত। এটাকে একটা সিন্ডিকেট হিসাবেও গণ্য করা

যায়। এরা দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে "ভেটো" প্রয়োগ করার ক্ষমতাও ভোগ করে।

এবং এর সমগ্র পরিকল্পে পেণ্টাগনের ( আমেরিকার যুদ্ধ-যন্ত্র ঃ প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর ) একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ১৯৬৯ সালে পেণ্টাগনের নিজের হাতেই ছিল ২০২ বিলিয়ান ডলার মূল্যের সম্পত্তি। অংকটা সত্যিই খুব প্রকাণ্ড—দেশের মোট জাতীয় পণ্যের ( জি-এন-পি ) এক পঞ্চমাংশের সমান।[৪]

আমেরিকায় পেণ্টাগণের সঙ্গে শিল্প-আর্থিক সমাহারের চূড়ান্ত মেলবন্ধন সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাই তার নাম হয়েছে সামরিক-শিল্প সমাহার। আজকের দিনের আমেরিকায় প্রায়ই দেখা যায়, সমর নায়করা শিল্প-আর্থিক করপোরেশনের কর্মকর্তা হয়ে বসেছেন। আবার তার উল্টোটাও ঘটে।

মনোপলিগুলোর হাতে এই রকম বিপুল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে এবং বিরাট পরিমাণ মার্কিন পুঁজি ভিন দেশে রপ্তানি হওয়ায় ইদানিং দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম ইউরোপে ইলেকট্রনিক কম্পিউটর উৎপাদনের ৮০ শতাংশ, ট্রান্সিস্টর উৎপাদনের ৫০ শতাংশ, রেডিও ও টি-ভি সেটের ১৫ শতাংশ এবং সংবন্ধ সার্কিটের বাজারের ৯৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে মার্কিন পুঁজি। ইউরোপ, কানাডা, এবং অস্ট্রেলিয়ার মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে মার্কিন মনোপলি-গুলো। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোয় আমেরিকার মোট লগ্নীর দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকার ১৭টি বৃহত্তম শিল্প করপোরেশন।

আমেরিকার কারবারীরা কানাডার অর্থনীতির মৌল ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে আরও গভীরভাবে। কানাডার বৃহত্তম কোম্পানীগুলোর মোট সম্পদের অর্ধেকই তাদের অধিকারে। মার্কিন পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করে কানাডার মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্পের ৯০ শতাংশ, রবারের ৮০ শতাংশ, রাসায়নিক শিল্পের ৭৫ শতাংশ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ৬৫ শতাংশ এবং খনিজ উত্তোলন, ধাতু গলন, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্পের ৫০ শতাংশ।

এটাই হল আসল উল্লেখযোগ্য বিষয়। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো আমাদের দেশ সহ সকল দেশেই নিজস্ব পুঁজির বনিয়াদ বিকাশের প্রতিবন্ধকতা করে। তারা যে ব্যবস্থাটা চাপিয়ে দেয়, সেটা হল সাম্রাজ্যবাদী জুলুমবাজীর ব্যবস্থা।

কিন্তু ভিন দেশের অর্থনীতির উপর আমেরিকার আগ্রাসী অভিযান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ পদ্ধতির ন্যায়সঙ্গত পরিণাম। মার্কিন পুঁজিবাদ তার সহজাত অন্তর্বিরোধের ফলে অতীতে এক

গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার মূলধনের মজুত ক্রমাগত বাড়তে থাকে অথচ সেই মূলধন লগ্নী করার জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে নতুন কোন মহাদেশের আবির্ভাব ঘটছে না; বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য আর আমেরিকার অনুকূলে নেই। সুতরাং মার্কিন পুঁজি লগ্নীর নতুন নতুন অঞ্চল খুঁজে পাওয়ার পথে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার চাপে সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে পরিপূর্ণ অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। যখন লগ্নীর সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তখন পুঁজিবাদ নিজেকেই গ্রাস করতে সুরু করে। তখন সে হয় ঘন-সন্নিবিষ্ট গোষ্ঠী। এটা পুঁজিবাদের স্বজাতীয়ের মাংস ভক্ষণের একটা প্রথা বিশেষ।

অতি বৃহৎ মনোপলির এই নতুন স্তরে আমেরিকায় এবং শিল্পোন্নত অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে যৌথ কোম্পানীগুলোর মিলনের হুজুগ পড়ে যায়। পুঁজি-বাদের বিকাশে অতীতে চিরকালই বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খেয়েছে। কিন্তু তার সংগে ইদানিংকালের ঘটনার আদৌ কোন মিল নেই। আজ বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর মিলন আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। বৃহদাকার কোম্পানীগুলো মিলিত হচ্ছে অতি বৃহদাকার কোম্পানীর সংগে এবং মনোপলি সংগঠন জন্ম দিচ্ছে ঘনসন্নিবিষ্ট গোষ্ঠীর।

পরের স্তরে গঠিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ঘনসন্নিবিষ্ট গোষ্ঠী—বিশ্বব্যাপী শিল্প ও আর্থিক সাম্রাজ্য। নতুন কৃৎকৌশল পুরানো কারিগরি-ভিত্তিক শিল্পগুলোকে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশ্বগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য করেছে। এই হচ্ছে আন্তর্দেশীয় করপোরেশনের আসল চেহারা।

ঘনসন্নিবিষ্ট গোষ্ঠীগুলো পুঁজিবাদী সম্পর্কের মধ্যে একটা অস্থিতিশীলতার নতুন উপাদানের উদ্ভব ঘটাচ্ছে। একমাত্র সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকারী শিল্প সংস্থাগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে বাকীগুলো জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। এটা এক ধরনের পাগলামি। অতি বৃহৎ ব্যাংকের আর্থিক মালিকানাধীন ন্যায়নীতি বর্জিত এই ঘনসন্নিবিষ্ট গোষ্ঠীগুলো যখন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মত এক জায়গায় জড়ো হয় তখন তাদের পাগলামি চরমে ওঠে। সুতরাং আমেরিকা যে আজ ব্যাংক রপ্তানি ব্যাপারে সকল দেশের শীর্ষে উঠে গেছে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। রকেফেলারের চেজ-ম্যানহ্যাটেন ব্যাংক সারা দুনিয়ায় ব্যাঙ্কিং-এর কারবার চালাবার জন্য ১৬০০ নিজস্ব অফিস খুলেছে। এর উপরে আরও শত শত বিদেশী ব্যাংক রয়েছে এর অধীনে। সুতরাং চেজম্যানহ্যাটেন হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের একটি প্রাইভেট বিশ্ব-

সাম্রাজ্য। পেন্টাগন এবং সারা দুনিয়ায় ছড়ানো ব্যাঙ্কিং অফিসগুলোর সঙ্গে চেজম্যানহ্যাটেন যুদ্ধ শিল্পের মুনাফা ভাগবাটোয়ার সমন্বয় সাধন করে।

সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় আর এক প্রপঞ্চের। দৃশ্যে আবির্ভাব ঘটে এক নতুন উপাদানের। একেই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার "সামরিক-শিল্প সমাহার" আখ্যা দিয়েছিলেন। তার অর্থ, বৃহদাকারের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বৃহদাকারের ব্যাঙ্কিং ও শিল্প কর্পোরেশনগুলোর অঙ্গাঙ্গী বন্ধন। এই সমাহার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। আজ আমেরিকায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই সমাহারের প্রাধান্য বিদ্যমান। এর অর্থ জীবন প্রবাহের সামরিকীকরণ। বহু বছর আগে জার্মান মার্ক্সবাদী কার্ল লিয়েবনেক্ট বলেছিলেন, "বহু সংখ্যক সামরিক ও আধা সামরিক প্রতিষ্ঠানের ছড়ানো কাঠামোর মধ্য দিয়ে যে ব্যবস্থা সমগ্র সমাজকে গ্রাস করেছে" তাকে সামরিকীকরণ বলাই বাঞ্ছনীয়। একথাও মনে রাখা দরকার যে পুরোনো জার্মানীর সামরিক শিল্প সমাহারগুলোই ছিল হিটলারের ফ্যাসিবাদের শক্তির বনিয়াদ।

আজ আমেরিকায় পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সামরিক সাজ সরঞ্জামের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়ে না গেলে চলবে না। ওটাই হল তার অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার শেষ অস্ত্র। মাত্রাধিক সামরিক উৎপাদন এক বৃহৎ সামরিক-শিল্প সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে। আজ আমেরিকায় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার স্বীকৃত উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সামরিক উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্দ্ধন। বর্তমানে আমেরিকার সামরিক বাজেটের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ান ডলারের বেশী। এই অর্থ ব্যয় না করলে অসংখ্য বৃহদাকার কর্পোরেশন ডুবতে সুরু করবে। সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করলে আমেরিকায় ৫৩০০ শহর অবিলম্বেই ভুতুড়ে শহরে পরিণত হবে। মার্কিন শ্রমিক বাহিনীর ১৩ শতাংশই সামরিক সমাহারে নিযুক্ত। বিজ্ঞানের জন্য গভর্ণমেন্ট যে অর্থ বরাদ্দ করে, তার ৯০ শতাংশই যায় সমর বিভাগের সেবায়। ৫০টি বৃহত্তম কর্পোরেশন যে সম্পত্তির মালিক পেন্টাগণের সম্পত্তির পরিমাণ তার চেয়ে বেশী।

মনোপলি কর্পোরেশনগুলোর আত্মস্বার্থ এবং সামরিক কর্তাদের স্বার্থ সামরিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এর থেকে পাওয়া যায় প্রচুর মুনাফা এবং সেই সঙ্গে বিরাট পরিমাণের ঘুষ। গোপন চুক্তি নগদ টাকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। সামরিক কর্মকর্তারা আগেভাগে অবসর গ্রহণ করে বড় বড় কর্পোরেশনের বড় বড় নির্বাহীর পদে গিয়ে অধিষ্ঠিত হন। তাদের জন্যে বাঁধা থাকে মোটা বেতন এবং ডিভিডেন্ডের মোটা অংক। প্রশাসনিক

পদে কাজ করবার জন্য সামরিক-শিল্প সমাহারগুলোও অনেক সময়েই তাদের প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে দেয়। আমেরিকার প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশন এবং সি-আই-এর প্রাক্তন প্রধান এ্যালান ডালেস এবং ডাঃ হেনরী কিসিংগার ছিলেন রকেফেলার সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি। আমেরিকার বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব আলেকজান্ডার হেগ হচ্ছেন মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন জেনারেল।

এই সব পারস্পরিক বন্ধন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটা কারও অজানা নেই যে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের সামরিক-শিল্প-আর্থিক সমাহারগুলো স্ব স্ব দেশের পররাষ্ট্র নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

বৃটেনের ক্ষেত্রে, ব্রিটিশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির উপর অপ্রতিরোধ শক্তিতে প্রভাব বিস্তার করে। লক্ষ্য করা গেছে যে অন্যদেশের সার্বভৌম গভর্নমেণ্ট, বিশেষ করে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের উন্নয়নশীল দেশের গভর্নমেন্টগুলো ব্রিটিশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর মতলব এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করে ; কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেই সন্দেহ নিরসনের কোন চেষ্টা কখনও করে না, বরং আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোকে সরাসরি সাহায্য করে থাকে।

ইদানিং ব্রিটিশ কর্তারা দেখতে পেয়েছেন যে ভিনদেশে তাদের ভিত এমনভাবে ধ্বসে পড়েছে, সে আর মেরামত করা যাবে না। এই অবস্থায় আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁরা নতুন করে নয়া-ঔপনিবেশিক নীতি প্রণয়ন এবং সেই নীতি প্রয়োগের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। রুটিন মাফিক সাধারণ রাষ্ট্রীয় সেবা (সার্ভিস) ছাড়াও তাঁরা এতদ্দেশে আরও কয়েকটি বিশেষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। তবে এক্ষেত্রে এখনও মুখ্য প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে ফরেন এণ্ড কমনওয়েলথ অফিস। এর অধীনে একটা পুরোদস্তুর বিভাগ রয়েছে শুধু প্রচারের কাজ চালাবার জন্য। এই বিভাগটি বিভিন্ন তত্ত্বাদর্শ-গত সমস্যার মোকাবিলা করে। একই বিভাগ অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে কমনওয়েলথের দেশগুলোর সংগে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ব্যাপারটাও দেখাশোনা করে। এর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ব্রিটিশ তথ্যের প্রচারের অংগগুলো। উপরন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একজন স্থায়ী সেক্রেটারী আছেন, যাঁর কাজ হচ্ছে ভিনদেশে নোংরা এবং নাশকতামূলক ও অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকর্ম চালানো। এই অফিসারটি গুপ্তচর বিভাগ, পাল্টা গুপ্তচর কাঠামো, সামরিক বিভাগ এবং অন্যান্য বিশেষ ধরনের সার্ভিসের ঘনিষ্ট প্রাত্যহিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিটিশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো আফ্রিকার দুটি বর্ণবিদ্বেষী সরকারকে চাঙ্গা করার প্রয়াস চালিয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে রোডিশিয়ায় ( বর্তমানে জিম্বাবোয়ে ), অপরটি দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই বর্ণবিদ্বেষী সরকারের সঙ্গে ব্রিটিশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো ছিল একেবারে হরিহরাত্মা। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট উপরোক্ত দুটি সরকারকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, জাহাজ, জেট ইত্যাদি কোন জিনিষই সরবরাহ করতে কখনও দ্বিধা বোধ করেনি। উপরন্তু বৃহদাকার ব্রিটিশ আন্তদেশীয় ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের অধঃস্তন সংস্থা আফ্রিকান এক্সপ্লোসিভস্ এণ্ড কেমিকাল্‌স্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ ১ কোটি পাউণ্ড লগ্নী করে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনটি বড় বড় গুলিবারুদের কারখানা বানিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ লগ্নীর পরিমাণ ২০০ কোটি পাউণ্ডের বেশী। দক্ষিণ আফ্রিকায় সব চেয়ে প্রভাবশালী ব্রিটিশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীটির মালিক হচ্ছে রয়স্‌চাইল্ড-ওপেনহাইমার গোষ্ঠী।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর রাজনৈতিক কারবারের এই দিকটার ভাল চিত্র পাওয়া যাবে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর দৃষ্টান্তে। কারণ সংখ্যায়, ঘনীভবনে, সম্পদে এবং নোংরা কাজে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর স্থান সকল দেশের শীর্ষে।

মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায় বিশ্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কী প্রচণ্ড লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রচুর তৈল মজুত আছে আর সেখানে শ্রমিকও পাওয়া যায় সস্তায়। তাই দীর্ঘকাল ধরেই পুঁজিবাদী দেশের হাঙরেরা ঐ অঞ্চলের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট। আমেরিকায় এক একটি তৈলকূপে যে পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়, নিকট প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যের তৈল কূপে পাওয়া যায় তার থেকে গড়ে ৩০০ গুণ বেশী। ষাটের দশকে নিকট প্রাচ্যে এক টন তৈল নিঙড়ে বার করতে যে অর্থব্যয় হত, আমেরিকায় সেই পরিমাণ তৈল নিঙড়ে বার করতে খরচ পড়ত তার চেয়ে ১০ গুণ বেশী।

বিরাট অর্থনৈতিক শক্তি এবং মার্কিন রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে একসন ( EXXON—নিউ জার্সির প্রাক্তন স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ), ক্যালিফোর্ণিয়ার স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল, গাল্‌ফ্ অয়েল, টেক্সাকো এবং মোবিল অয়েল সর্ব প্রথম ব্যাপক আকারে ঢুকে পড়ে সৌদীআরব, কুবাইত, ইরাক ও বাহেরিনে। কালক্রমে অতি দ্রুতগতিতে সেই আগ্রাসী অভিযানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

মার্কিন তৈল মনোপলিগুলোর মধ্য প্রাচ্যে ব্যাপক প্রবেশ এবং সম্প্রসারণে মার্কিন গভর্নমেণ্টের প্রকাশ্য ও সক্রিয় সমর্থন ছিল, বিশেষ করে আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য মার্কিন গভর্নমেণ্ট সমস্ত ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়ে সরাসরি কুটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের পেট্রোলিয়াম বিষয়ক উপদেষ্টা চার্লস রীনারের দেওয়া সরকারী রিপোর্টেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আমেরিকা যখন থেকে তৈলের জন্য ভিন দেশের তৈল সম্পদের উপর দৃষ্টিপাত করে তখন থেকেই পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের সাহায্যের জন্য জোর কদমে এগিয়ে যায় এবং জোরদার সাহায্য করে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে কখনও কখনও তাদের কুটনৈতিক সমর্থনও প্রয়োজন এবং সেই সমর্থন পেতে তাদের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয়নি।

রীনারের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পররাষ্ট্র দপ্তরের জোরদার, অবিচল এবং কখনও কখনও জেদদারী চাপ সৃষ্টি ছাড়া বিভিন্ন মার্কিন তৈল কোম্পানী নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈলে অংশীদারিত্ব লাভ করতে পারত না।

প্রয়াত মোসাদ্দেক ইরানে মার্কিন তৈল সংস্থাগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন। ইরানে মার্কিন প্রভুত্ব পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য সি-আই-এ যে অভিযান চালায় তার নেতৃত্ব করেন কারমিট রুজভেল্ট। এই কারমিট রুজভেল্টই গালফ্ অয়েলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট হন। তাঁর উপর সরকারী কর্মকর্তাদের সংগে কোম্পানীর যোগাযোগ রক্ষার ভার অর্পণ করা হয়। গালফ্ অয়েল আমেরিকার বৃহত্তম আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মধ্যে একটি এবং এটির মালিক হচ্ছে টাইকুন (বহু-ক্রোড়পতি) মেলন পরিবার।

মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর চক্রান্তে ইরাকে হাসিন গভর্নমেণ্টের পতন ঘটে। অতঃপর সেখানে মার্কিন তৈল কোম্পানীগুলোর ক্ষমতা আরও পরিবর্ধিত হয়।

১৯৭২ সালের গোড়ায় আরব দেশগুলোয় তৈলের কারবারে মার্কিন পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬'৪ বিলিয়ান ডলারের বেশী।

এক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়। বহু ক্ষেত্রে বৃটিশ তৈল কোম্পানী-গুলো উত্তাল আরব জাতীয়তাবাদের সংগে মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে নিজেদের স্বার্থের বিনিময়ে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর ক্ষমতা পরিবর্ধনে সহায়তা করে। আরব দেশগুলোয় এবং অন্যত্র জাতীয় আন্দোলনের মোকাবিলায় বৃটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী মার্কিন "ভগিনদের" বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ল্যাতিন আমেরিকার সমগ্র ইতিহাসে এই একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর শোষণ ও লুণ্ঠন পাকা করবার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রশক্তি পুরোদমে এগিয়ে গেছে।

সত্তর বছর আগে পানামা ছিল দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া রাষ্ট্রের অংগ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট দাবী করলেন যে পানামা এলাকার ৩০ হাজার বর্গমাইল ভূমি আমেরিকার হাতে তুলে দিতে হবে। আমেরিকা একটা "বিপ্লব" ঘটিয়ে দিল পানামায় এবং সেখানে একটি তাঁবেদার গভর্নমেণ্ট তৈরী হয়ে গেল। আর কলম্বিয়া থেকে পানামা ঢুকে গেল আমেরিকার সীমানার মধ্যে।

কিন্তু এমনটা ঘটল কেন? কারণ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ওয়ালষ্ট্রীটের কর্পোরেশনগুলো পানামার মধ্য দিয়ে একটা খাল কাটতে চেয়েছিল। সেই খাল কাটা হবার পর থেকে দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল সাম্রাজ্যের সংগে মার্কিন আন্ত-দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করছে।

পশ্চিম ইউরোপে মূলধন লগ্নী করে মার্কিন মনোপলিগুলো যে হারে মুনাফা অর্জন করে, লাতিন আমেরিকায় লগ্নী তার থেকে পাঁচ গুণ বেশী হারে মুনাফা আদায় করে। ১৯৬০ সালে মার্কিন কর্পোরেশনগুলো লাতিন আমেরিকায় ২৬ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার লগ্নী করে। একই সময়ে সেই দেশ থেকে তারা মুনাফা কামিয়ে নিয়ে যায় ৬৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার।

এবার ভেনেজুয়েলার কথাটাই ধরা যাক। মার্কিন কর্পোরেশনগুলো সে দেশের তেল খনি কনসেসনের ৮০ শতাংশের অধিকারী। রকেফেলার সাম্রাজ্যের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েলই (নিউ জার্সি) সেখানে মাতব্বর হয়ে বসে আছে। লাতিন আমেরিকার কোন কোন দেশে সমস্ত তৈল সম্পদের মালিকানা রকেফেলারের হাতে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল এবং ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকাকেই তাদের কাঁচা মাল সরবরাহের জমিদারী বলে মনে করে। ইউনাইটেড ফ্রুটের ফলের বাগিচাগুলো কার্যত ক্রীতদাস ভূমিতে পরিণত হয়েছে। বহু জায়গাতেই তরুণ-তরুণী কেনা-বেচা হয় এবং সারা জীবন ধরে তারা বাগিচায় দাসত্ব করে।

মার্কিন মুলুকে "পুয়ের্তোরিকো সব চেয়ে লাভজনক ঠিকানা কেন?" নাম দিয়ে একখানা পুস্তিকা আমেরিকায় বিলি করা হয়। পুয়ের্তোরিকোয় মার্কিন পুঁজি লগ্নীতে উৎসাহ প্রদানই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

লাতিন আমেরিকার এই দেশটি হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর লুটে পুটে খাবার অবাধ চারণ-ভূমি। সেখানে প্রথম ১৭ বছর

কোন কোম্পানীকে ট্যাক্স দিতে হয় না। বহু এলাকায় বিনা শুল্কে কাঁচা মাল ঢোকে এবং বিনা শুল্কে তৈরি জিনিষ রপ্তানি হয়। খালি নাফা-নাফা আর নাফা এবং তার জন্য কোন সামাজিক দায় দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন নেই। পুয়ের্তোরিকোর স্থলভূমির ১৫ শতাংশ গ্রাস করেছে পেন্টাগন। সেখানে অনায়াসেই ক্ষেত খামার হতে পারত। কিন্তু হয়নি।

মার্কিন সরকারের এজেন্সীগুলো পুয়ের্তোরিকোর সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। পুয়ের্তোরিকোর বৈদেশিক সম্পর্ক, নাগরিকতা, পর্যটন, সেনাবাহিনী, যানবাহন, বিনিময়পত্র, পোষ্ট অফিস, বেতার, টি-ভি, পেটেন্ট, কোয়ারানটাইন আইন এবং আদালতের প্রশাসন—সব কিছুর উপরই মার্কিন কংগ্রেসের পুরো এক্তিয়ার বিদ্যমান। পুয়ের্তোরিকানরা কত একর জমিতে আখের চাষ করবে, কতটা আখ মাড়াই করবে এবং কতটা চিনি বিদেশে রপ্তানি করবে তা সবই ঠিক করে দেয় মার্কিন কংগ্রেস। মার্কিন এজেন্সীগুলো পুয়ের্তোরিকোয় যে কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। অধিকাংশ সময়ই পুয়ের্তোরিকোয় পত্র পত্রিকা এবং পুস্তকাদির আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়। মার্কিন এজেন্সীগুলো সামুদ্রিক ও বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করে। আর সমুদ্রপথে মাল আনা-নেওয়ার কাজটা ষোলো আনাই মার্কিন জাহাজ কোম্পানীগুলো সম্পন্ন করে।

ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, গুয়াতেমালা, এল-সালভাদোর এবং আরও অনেক দেশে ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। মার্কিন কপার কর্পোরেশনের স্বার্থে ১৯৭৩ সালে চিলিতে যে রক্তাক্ত 'ক্যু' (বলপ্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতা দখল) হয়ে গেল, তাতেই লাতিন আমেরিকায় মার্কিন নীতির ভয়াবহ পরিণামের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমেরিকার প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব হেনরী স্টীমসন কিছুকাল আগে বলেছিলেন: "ওয়াশিংটনের নীতি যাই হোক না কেন এবং যিনিই এখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন আমেরিকার ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী এবং তৈল কোম্পানীর মত কারবারীরা যে সব এলাকায় অর্থনৈতিক কাজ কারবার করে থাকে, সেখানে তারা স্বতন্ত্র (নিজস্ব) রাজনৈতিক স্বার্থের উদ্ভব ঘটায়। সেটা প্রায়শঃ ওয়াশিংটনে এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে সরকারী নীতির পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।"

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর চাই বিপুল পরিমাণের কাঁচা মাল। নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রেমন ইওয়েল হিসাব কষে বলেছেন যে, ৩৬টি

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের মধ্যে মাত্র ১০টিতে আমেরিকার কলকারখানা ভিত্তিক শিল্প স্বনির্ভর। সুতরাং বাকী ২৬টি কাঁচামাল তারা আমদানী করে। কখনও পুরোটা কখনও আংশিক। ডাঃ ইয়োয়েল বলেছেন যে উপরোক্ত ৩৬টি প্রধান প্রধান কাঁচামালের মধ্যে ২৯টিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বনির্ভর। তাকে মাত্র ৭টি কাঁচামাল আমদানী করতে হয়।

এ অবস্থায় মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর এবং মার্কিন গভর্ণ-মেণ্টের পক্ষে বিশ্বের দূর-দূরান্তের দেশগুলোর কাঁচামাল লুণ্ঠনের নীতি অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সমুদ্রের তলদেশের সম্পদের সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে তেল এবং ধাতু সহ বিশ্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের (কাঁচামাল) অতি বিশাল ভান্ডার ভারত মহাসাগরের তলায় মজুত আছে।

তাই মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর লুণ্ঠনের কারবারে দিয়েগো গার্সিয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন যে দিয়েগো গার্সিয়ার সামরিক ঘাঁটি মার্কিন মুলুকে আরবের তৈল সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার গ্যারাণ্টিস্বরূপ। আমেরিকা যে দিয়েগো গার্সিয়ায় সামরিক ঘাঁটির শক্তি পরিবর্ধনের সঙ্গে পারস্য উপসাগরে বোম্বেটে দস্যুর মত আচরণ করছে, সেটা অকারণ নয়। আফগানিস্থানের ঘটনাবলী এবং কমিউনিস্ট "মতলব" ইত্যাদি যুক্তিগুলো স্রেফ গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমেরিকার **দি প্রোগ্রেসিভ** পত্রিকায় কিছুকাল আগে জেমস কোলের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ব্রেজিলে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর টাকায় ১৯৬৪ সালে কিভাবে একটি পুরোদস্তুর 'ক্যু' ঘটেছিল, তা ঐ প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনা আগে ফাঁস করা সম্ভব হয়নি, কারণ এ সংক্রান্ত সরকারী দলিলাদি এতকাল "গোপন তথ্য" বলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে সেগুলোর "গোপনতার" কাল শেষ হলে বিষয়টা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

চক্রান্তটার নাম দেওয়া হয় "ব্রাদার সাম"। ১৯৬১ সালে চক্রান্তের খুঁটি-নাটি তৈরী হয়ে যায় কিন্তু সেই চক্রান্ত রূপায়িত করা হয় ১৯৬৪ সালের ১লা এপ্রিল (নির্বোধের দিন)। স্থিতি বিনাশনের ( সবকিছু নড়বড়ে করে দেওয়া ) একটা অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্যু করে ক্ষমতা দখল সম্পন্ন হয়। স্থিতি বিনাশনের অভিযান হচ্ছে এক ধরনের গোপন লড়াই। হোয়াইট হাউস, সি-আই-এ, পেণ্টাগন, পররাষ্ট্র দপ্তর, এ-আই-ডি, শান্তির জন্য খাদ্য প্রভৃতি সংস্থাগুলো একযোগে সেই লড়াইয়ে সামিল হয়।

চক্রান্তের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ডীন রাস্ক, জেনারেল ম্যাকসওয়েল টেলর, রবার্ট ম্যাকনামারা, জন ম্যাককোন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ১৯৬১ সালে ব্রেজিলের পপুলিস্ট প্রেসিডেণ্ট জোয়াও গোলার্টের গভর্ণমেণ্ট শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষকদের রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান, জমি দখল, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলনের দ্বারা মার্কিন উগ্রচন্ডীদের বিরাগভাজন হয়।

**ফরচুন** পত্রিকা লিখেছে, "মার্কিন লগ্নী (তখন তার পরিমাণ ছিল ১ বিলিয়ন) মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিশ্রীভাবে মার খাচ্ছিল এবং পুঁজিবাদ ও বিদেশী কারবারের ওপর বিষাক্ত আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।" অতঃপর ১৯৬২ সালে একটা আইন করে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের মুনাফা রপ্তানির উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। বিদেশী কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করার ভয়ও দেখানো হয়েছিল। তা ছাড়া ম্যাংগানীজ, নিওবিয়াম (সাজোয়া গাড়ীর প্লেট এবং জেট ইঞ্জিনের জন্য অপরিহার্য), বক্সাইট, টিন এবং আকরিক লোহের মত যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ বন্ধেরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ফলে প্রেসিডেণ্ট গোলার্টের দিন ঘনিয়ে এল।

**ফরচুন** পত্রিকার প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল "নির্বাহীরা যখন বিপ্লবী হয়ে ওঠে।" প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে "সাও পাউলোর কারবারীরা ব্রেজিলের কমিউনিস্ট সংক্রামিত গভর্ণমেণ্ট উচ্ছেদের চক্রান্ত প্রণয়ন করে।" এই সব ব্রেজিলিয় কারবারীর (আসলে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানী) এবং তাদের মার্কিন মিত্রদের কার্যকলাপ এই প্রবন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

**ফরচুন** পত্রিকায় বলা হয়েছে যে ১৯৬৪ সালের গোড়ায় ব্রেজিলস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিংকন গর্ডন পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, "পালিস্টাসর (গোলার্টের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ক্যুর দাবার বোড়ে) যদি ৪৮ ঘণ্টা গভর্ণমেণ্ট ধরে রাখতে পারে তাহলে মার্কিন স্বীকৃতি এবং মার্কিন সাহায্য পেয়ে যাবে।" প্রকৃতপক্ষে ১১০ টন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মার্কিন মিলিটারী একেবারে তৈরী হয়েই ছিল। কোন প্রতিরোধ দেখা দিলে তা দমন করবার জন্য মার্কিন নৌবহর তৈল, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি নিয়ে মহড়া দিচ্ছিল। এ ছাড়া "শান্তির জন্য খাদ্য"ও তার মজুত ভান্ডার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল।

মার্কিন স্বীকৃতি লাভ করবার জন্য কি কি করতে হয় তাও চক্রান্তকারীদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, প্রথমে অঞ্চল বিশেষ দখল করতে হবে,

নতুন একটা গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ইচ্ছা ঘোষণা করতে হবে।

এই গোপন লড়াইয়ের সমগ্র ছকে নির্বাচনী অন্তর্ঘাতকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। ব্রেজিলে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে রক্ষণশীল প্রার্থী-দের জেতাবার জন্য সি-আই-এ ২ কোটি ডলার বরাদ্দ করে। সি-আই-এর একজন প্রাক্তন চাকুরে ফিলিপ এগি বলেছেন যে ১১ অংগরাজ্যের গভর্ণর নির্বাচনে ৯টি রাজ্যের প্রার্থী, ফেডারেল সিনেটের ৯ জন প্রার্থী, ফেডারেল ডেপুটি পদের ২৫০ জন প্রার্থী এবং রাজ্য আইন সভার ৬০০ প্রার্থীকে কিনে নেবার জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হয়। উত্তর-পূর্ব এলাকার কৃষকরা অশান্ত হয়ে প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার দাবী করছিল। তাই সেই জায়গাটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রগতিশীল গভর্ণররা স্বাধীনভাবে কাজ করছিলেন এবং ভূমি বিরোধের সালিশীতে আঞ্চলিক অলিগার্কির (ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর শাসন) নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কাজ করছিলেন। ওয়াশিংটন উত্তর-পূর্ব ব্রেজিলের দিকে বিশেষ নজর দেয়।

সি-আই-এ আরেক বিপজ্জনক খেলায় অবতীর্ণ হয়। ব্রেজিলে তাঁবেদার ট্রেড ইউনিয়ন চালু করে তাদের মাধ্যমে সি-আই-এ গ্রাম্য মজুর আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করে। আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর ফ্রি লেবার ডেভেলপমেণ্টের সামাজিক প্রকল্পের জুনিয়ার ডিরেক্টর উইলিয়াম ডোহার্টি ১৯৬৯ সালে মার্কিন কংগ্রেসে সাক্ষ্য দেন যে এ-আই-এফ-এল-ডির লোকেরা বিপ্লবে জড়িত ছিল এবং গৌলার্ট গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদে অংশ নেয়। এ-আই-এফ-এল-ডি প্রতিষ্ঠানটি সি-আই-এর একটি প্রকাশ্য সংগঠন। আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার এবং কংগ্রেস অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেসন (এ-এফ-এল-সি-আই-ও) ঐ সংগঠন পরিচালনা করে। ফিলিপ এগি ডোহার্টিকে সি-আই-এর লোক বলে চিহ্নিত করেছেন।

একই সংগে মার্কিন মিলিটারী এটাচি জেনারেল ভার্নন ওয়াল্টার্স (ওয়াটার গেটের কথা স্মরণ করুন) ব্রেজিলে সামরিক চক্রান্তকারীদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। ভার্নন ওয়াল্টার্স ব্রেজিলের জেনারেল কাস্টেলো ব্রাংকোর পরম সুহৃদ ছিলেন। এক সময় তাঁরা নাকি এক ঘরে বাস করেছেন। তার ফলে ক্যুর এক সপ্তাহ আগে জেনারেল ওয়াল্টার্সের পক্ষে সমস্ত ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ বার করে ওয়াশিংটনে পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে **টাইম** পত্রিকা "সকলেই সৈনিক" শিরোনামায় লিখেছিলো যে কাস্টেলো ব্রাংকো

প্রেসিডেণ্টের গদীতে বসবার পরদিনই প্রেসিডেণ্ট প্রাসাদে দুই জেনারেল একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজন করেছিলেন।

ওয়াশিংটন তার প্রতিশ্রুতি পালনে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি। তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট লিন্ডন বি. জনসন জুণ্টার তল্পীবাহক গভর্ণমেণ্টকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ব্রেজিলের নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট জোয়াও গোলার্ট তখন স্বদেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিঙ্কন গর্ডন সেই ক্যুকে গণতন্ত্রের জয় বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

ফরচুন পত্রিকা এই ক্যুকে "উদ্ধারের শেষ প্রচেষ্টা" বলে বর্ণনা করেছেন। সত্যি সত্যিই এটা ছিল হান্না মাইনিং আন্তর্দেশীয় সাম্রাজ্যের, কাইজার এলুমিনিয়ামের ( অপর একটি মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ), বেথলেহেমের এবং মার্কিন স্টীলের পাততাড়ি গোটাবার হাত থেকে উদ্ধার পাবারই ব্যাপার।

ক্যুর পরই নতুন জুণ্টাকে ভাসিয়ে রাখবার জন্য তড়িঘড়ি ব্রেজিলে পাঠানো হয় মোটা টাকার বাণ্ডিল : ঋণ হিসাবে ৫ কোটি ডলার ; কৃষিপণ্য সরবরাহের জন্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ; বিদেশী ঋণ শোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় ৫০০ শতাংশ বেড়ে যায়।

অবিলম্বেই বিদেশী লগ্নী সেই দেশে গিয়ে পেঁছতে আরম্ভ করে। খনিজ উত্তোলনের নতুন বিধি এবং অসংখ্য গ্যারাণ্টির দ্বারা বিদেশী লগ্নীকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ক্যুর চার বছর বাদে ব্রেজিলের সমগ্র বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র বিদেশী পুঁজির কবলে চলে যায়। মোটর গাড়ী এবং টায়ার উৎপাদনের ষোল আনাই চলে যায় বিদেশী পুঁজির হাতে। সিমেণ্টের ৯০ শতাংশ, ভেষজ শিল্পের ৮০ শতাংশ, মোটরের যন্ত্রাংশ নির্মাণ শিল্পের ৬০ শতাংশ এবং রাসায়নিক ও মেসিনারী উৎপাদনের ৫০ শতাংশের বেশী। ১৯৭৭ সালে ব্রেজিলে মার্কিন পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ বিলিয়ান ডলার।

ব্রেজিল কাঁচামালে খুবই সমৃদ্ধ এবং সেখানে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য দারুণ কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ৯টি বৃহত্তম লগ্নীকারক সেদেশে মোট ৯ বিলিয়ান একর জমির মালিক হয়ে বসে।

বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা লগ্নীর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। যেমন ধরুন : ট্রেড, ইউনিয়নগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ; ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, বেতনের হার সযত্নে কমিয়ে রাখা এবং শ্রমিকদের সব সময়ই আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখা, ইত্যাদি। ব্রেজিলের ইতিহাসে এর আগে কখনো এরকম দমন পীড়নের

গভর্ণমেণ্ট দেখা যায়নি। আধা সামরিক খুনীদের নিয়ে গঠিত "মৃত্যু স্কোয়াড্রনের খুন খারাবী", জেলে আটক ও নির্যাতন, সেন্সর ব্যবস্থা, আমা-জোনিয়ান উপজাতিদের গণ-নিধন ইত্যাদির দ্বারা এই গভর্ণমেণ্টকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

১৯৭১ সালে বলিভিয়ায় ব্রেজিলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, ১৯৭৩ সালে ঘটে চিলিতে এবং একই সালে উরুগুয়েতে। ভেনেজুয়েলার উপর আগ্রাসী অভিযান চালাবার পরিকল্পনায় এটার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আর এই সবই হয়েছে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে।

## সূত্র ও উল্লেখপঞ্জী

### দ্বিতীয় অধ্যায়

১ **ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল**, ১৩ জানুয়ারী, ১৯৭২
২ ক্রিস্টোফার টুগেনবাট, **দি মালটি ন্যাশন্যালস্**
৩ এফ. এ. ম্যাকেঞ্জি, **দি আমেরিকান ইনভেডরস্**
৪ সেমুর মেলম্যান, **পেণ্টাগন ক্যাপিটালিজম্**

তৃতীয় অধ্যায়

# পুঁজিবাদ ও তার সর্বোচ্চ স্তর

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো অনাদিকাল ধরে পৃথিবীতে নেই। একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় তার বিকাশ ঘটেছে। সেই ব্যবস্থাটা হচ্ছে পুঁজিবাদ। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো একটা পরিবর্তনের প্রতিফলন ঃ পরিমাণ, পরিধি, ক্রিয়াকলাপ এবং কাঠামোগত পরিবর্তন; ক্ষুদ্রাকার থেকে বিশ্বব্যাপী রূপ পরিগ্রহ। এই পরিবর্তন কিন্তু ব্যবস্থাটির কোন হেরফের করেনি। পুঁজিবাদ সেই পুঁজিবাদই রয়ে গেছে। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী হচ্ছে পুঁজিবাদের ঘনীভূত স্বরূপ।

কিন্তু পুঁজিবাদ কি?

এই শব্দটি আজকাল লোকের মুখে মুখে ফেরে এবং নানা অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। তার ফলে এর সঠিক অর্থ সম্বন্ধে লোকের মনে যথেষ্ট বিভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদ হচ্ছে একটা সমাজ-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনের সমস্ত সাজ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ী এবং মজুত মাল ইত্যাদি সব কিছুরই মালিকানা থাকে প্রাইভেট মালিকের হাতে। উৎপাদনের উপায়কে পুঁজি আখ্যা দেওয়া যায়। প্রাইভেট মালিক কখনও একাই কারবার করেন, কখনও বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে যৌথভাবে যে কারবার করা হয়, তাকে বলে যৌথ কোম্পানী (জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী) অথবা বাণিজ্য কর্পোরেশন। যৌথ কোম্পানীর মূলধনকে নির্দিষ্ট মূল্যের শেয়ারে ভাগ করা হয়। মোট শেয়ারের যে যত অংশের অধিকারী সে কোম্পানীর তত অংশের মালিক। এটাকে প্রাইভেট উদ্যোগও (এন্টারপ্রাইজ) বলা হয়। কার্লমার্কসের চরিত্রায়ন অনুযায়ী পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন এক উৎপাদন প্রকরণ, যাতে উৎপাদনের উপায়গুলো পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত। সমাজে পুঁজিপতিরা একটা সুনির্দিষ্ট শ্রেণী।

উৎপাদনের কাজ সুরু করতে প্রচুর পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। যাদের হাতে যথেষ্ট অর্থ মজুত হয়নি (আদিম সঞ্চয় নামে পরিচিত) বিরাট পরিমাণ মূলধন লগ্নীর কথা কল্পনা কখনও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা

তখন অন্যান্য পুঁজিপতিদের অংশীদার করে নেয়। এবং এই ভাবে যে প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তার ফলে উৎপাদনের উপায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মালিকানা এবং সেটাই একটা ব্যবস্থায় পরিণত হয়। সেই ব্যবস্থায় ঘনীভবন বা কেন্দ্রীভবনের পথ প্রশস্ত হয় এবং কালক্রমে মালিকানা চলে যায় মুষ্টিমেয় লোকের কব্জায়। এর অর্থ, সমাজে অন্য এমন লোক রয়েছেন, যাদের কোন মালিকানা নেই এবং তাঁরাই হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা উৎপাদনের জন্য কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজ তাঁরা করেন মালিকদের জন্য। মালিকের জন্য কাজ না করলে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন না, কারণ তাঁরা কোন কিছুর মালিকও নন এবং উৎপাদনের উপায়ের উপর তাঁদের কোন অধিকার নেই। এদেরই বলা হয় শ্রমিক শ্রেণী।

কাজ মানুষকে করতেই হয়। কাজ না করলে কিছুই উৎপন্ন হয় না। আধুনিক সমাজে যারা কাজ করে, উৎপাদনের উপায়ের ওপর তাদের কোন মালিকানা নেই। এই শ্রেণীর মানুষ তাদের উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যে পণ্য উৎপাদন করে, তার মূল্য তাদের মজুরী এবং বেতনের চেয়ে অনেক বেশী। এই বাড়তি কাজটা তারা করে অপর শ্রেণীর ভোগ সুখের জন্য। "রাজনৈতিক অর্থনীতির জনক" আদাম স্মীথ বাড়তি কাজটাকে "বিয়োগ" ( Deduction ) আখ্যা দিয়েছেন। সহজ ভাষায় বলা যায় সমাজের জন্য যারা উৎপাদনে নিয়োজিত, নিজেদের রোজগারের উপর তাদের কিছু বাড়তি পণ্য উৎপাদন করতে হয়। কার্লমার্কস এটাকেই বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য ( Surplus value )। সম্পত্তি থেকে আয়ের এটাই একমাত্র উৎস। এটাকেই বলে মুনাফা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত উৎপাদক শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদনের একাংশ আত্মসাৎ-ই সম্পত্তির আয় (মুনাফা ) নামে পরিচিত।

আধুনিক যুগে উৎপাদনের কলা-কৌশল বহুধাবিভক্ত এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল। উৎপাদন প্রক্রিয়া চলে অতি সুক্ষ্ম ও জটিল বিশেষীকৃত এবং যন্ত্রায়িত পদ্ধতিতে। কোন একটি মানুষের পক্ষে নিজস্ব উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানো অসম্ভব। সেই কারণেই পুঁজিপতিদের গোষ্ঠী গঠন প্রপঞ্চের উদ্ভব ঘটেছে। আর সমাজে দেখা দিয়েছে বিস্তৃত শ্রমবিভাগ। একদিকে রয়েছে উৎপাদনের উপায়ের মালিক ( পুঁজিপতিরা ) এবং অপর দিকে রয়েছে শ্রমিক-শ্রেণী যারা কোন উৎপাদনের উপায়ের মালিক নয় কিন্তু নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং পুঁজিপতিদের হাতে মুনাফা তুলে দেবার জন্য তাদের কাজ করতে হয়।

ক্রমেই আরও কম কম লোকের হাতে পুঁজির কেন্দ্রীভবনের ফলে আর এক প্রপঞ্চের উদ্ভব ঘটে। সমাজ খাড়াখাড়ি দুই বিপরীত মুখে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে থাকে মুষ্টিমেয় ধনী এবং অপর দিকে অসংখ্য নিঃস্বজন। যে কোন পুঁজিবাদী দেশের জাতীয় আয় বন্টন বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যাসত্য সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যাবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর এক বৈশিষ্ট্য হল "উৎপাদনে অরাজকতা"। যে কোন পুঁজিপতি অথবা যে কোন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান তার নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে যা খুশী করবার অধিকারী। যে কোন পণ্য সে উৎপাদন করতে পারে এবং যে কোন উপায়ে তার পুঁজিলগ্নী করতে পারে। কোন জিনিষই সুপরিকল্পিত নয়। সকল পুঁজিপতিরই মূল লক্ষ্য হল কারবার থেকে যত বেশী সম্ভব মুনাফা তুলে নেওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় সামিল হয়। তার ফলে বাজারে দর ওঠা-নামা করে। কোন কোন সময় কোন এক ধরনের পণ্যের উৎপাদন এত বেড়ে যায় যে তা বাজারে বেচে আশানুরূপ মুনাফা পাওয়া যায় না (একে বলে "বাড়তি উৎপাদন") এবং অনেক সময়ই প্রতিযোগিতায় হার মেনে বহু পুঁজিপতি ব্যবসা বাণিজ্যের পথ ত্যাগ করে। তখন সমাজের উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানা আগের চেয়ে আরও কম সংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। মালিকানা বিবর্জিত লোকের সংখ্যা ভীষণভাবে বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে সম্পত্তি আরও কম সংখ্যক লোকের হাতে গিয়ে ঘনীভূত এবং কেন্দ্রীভূত হতে থাকে।

পুঁজিবাদ হচ্ছে এক ধরনের বাজার-ভিত্তিক ব্যবস্থা, পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা (কার্লমার্কস); পণ্য হচ্ছে এমন মাল, যা উৎপাদক সরাসরি ব্যবহার করে না, বাজারে বিনিময়ের জন্য তৈরী করে। ভি. আই. লেনিন পুঁজিবাদের ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নলিখিতভাবে, "পুঁজিবাদ হচ্ছে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা—যার বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রম-শক্তিও পণ্যে পরিণত হয়।"

## প্রাক-পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদ যে অনাদিকাল ধরে পৃথিবীতে নেই, তার সাক্ষী ইতিহাস। সমাজের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে।

পুঁজিবাদের আগেও পৃথিবীতে অন্য ধরনের শ্রেণী-সমাজ বিদ্যমান ছিল। সেই সমাজে শাসক-শ্রেণী শ্রমজীবী মানুষের উদ্বৃত্ত শ্রম অথবা উদ্বৃত্ত পণ্যের

দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। একে বলা হয় ক্রীতদাস ও ভূমিদাস প্রথা। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে সামন্ততন্ত্রের ভূমিদাসরা তার উদ্বৃত্ত শ্রম মালিককে প্রদান করতে আইনানুসারে বাধ্য ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদে শ্রমিক অর্থনৈতিক বিধি অনুসারে মালিককে তার উদ্বৃত্ত শ্রম প্রদান করতে বাধ্য।

পূর্ববর্তী আধেয়র মধ্য থেকে পুঁজিবাদের বিকাশ প্রক্রিয়ার এবং পরবর্তী-কালে পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থার অবদান ভূমিদাসের মজুরী-ভোগী শ্রমিকে পরিণত হওয়ার বিকাশ প্রক্রিয়ার কালটা ছিল খুবই দীর্ঘ এবং অত্যন্ত জটিল। কোন কোন দেশে সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটেছিল উপর থেকে চাপানো এক অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে। কিছু অভিজাত ভূম্যাধিকারীর সঙ্গে একযোগে বড় বড় বণিকরা ছিল সেই বিপ্লবের হোতা। আবার কোন কোন দেশে ক্ষুদ্র উৎপাদক থেকে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিতে পরিণত লোকেরা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দ্বারা তলার দিকে বিপ্লব ঘটিয়ে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে। উল্লিখিত আধেয়র মধ্যে মালিকানার ঘনীভবনের একেবারে বিপরীত প্রান্তে সৃষ্টি হয় প্রোলেতারিয়েতের ( শ্রম ছাড়া আর কোন মূলধন যাদের নেই )। এই ঘটনার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ক্ষুদ্র উৎপাদক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবলুপ্তি। তাদের বিলুপ্তি ঘটল নিম্নলিখিত ভাবে ঃ একদিকে ধনী কৃষকদের একটি উচ্চতর স্তরের আবির্ভাব এবং অপর দিকে গরীব মানুষের একটা নিম্নতর স্তরের আবির্ভাব। প্রথমোক্তরা তাদের ধন সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়েই যেতে লাগল এবং শেষোক্তরা দারিদ্র্য ও ঋণের চাপে জর্জরিত হয়ে প্রথমোক্তদের সেবা করতে বাধ্য হল। এই প্রাথমিক সঞ্চয় শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে বিকাশ লাভ করল এবং সেই সম্প্রসারণ তার একটা নিজস্ব বেগ সৃষ্টি করল।

পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য দুটি পূর্বসর্ত অপরিহার্য। একটি হচ্ছে, শিল্প বাণিজ্যে পুঁজি লগ্নীকারক এক শ্রেণীর মানুষ এবং আর একটি হচ্ছে, আরও বড় রকমের বণিক পুঁজির ( Marchant capital ) অস্তিত্ব থাকা চাই। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী ( অর্থাৎ পুঁজির সঙ্গে মজুরীভোগী শ্রমিকের সম্পর্ক ) দুই অধ্যায়ে বিভক্ত ঃ একটি হচ্ছে প্রাক শিল্প বিপ্লব অধ্যায় এবং অপরটি হচ্ছে শিল্প বিপ্লবোত্তর অধ্যায়। কার্লমার্কস প্রথমটির নাম দিয়েছেন "ম্যানুফ্যাকচার" (manufacture) এবং শেষেরটির নাম দিয়েছেন "মেসিনো-ফ্যাকচার" (machinofacture)। প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণ

সর্বত্র সমভাবে সম্পন্ন হয়নি। তবে পুঁজিবাদ শিল্পবিপ্লবের পরই লম্বা লম্বা পা ফেলে অগ্রসর হয় এবং দেখা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই কোন কোন দেশে (যেমন ধরুন ইংল্যাণ্ডে) পূর্ণাকারে পুঁজিবাদের উত্থান ঘটে।

## পুঁজিবাদের বিকাশ : প্রতিযোগিতা ও মনোপলি

পুঁজিবাদী সঞ্চয় পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া সামনে পদক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলে। চালু কারবারের মুনাফা জমিয়ে এবং পূর্ণলগ্নীর দ্বারাই সেটা সম্ভবপর হয়। সঞ্চয় পুঞ্জীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের কলাকৌশলের যথেষ্ট উন্নতি হয়। উন্নততর কলাকৌশল উৎপাদন পদ্ধতিতে বিপ্লব এনে দেয়। সেই পর্যায়ে পণ্য উৎপাদন অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, ইতিহাসের যে কোন অতীত উৎপাদন প্রণালীর চেয়ে পুঁজিবাদ তার বিকাশের প্রথম পর্যায়ে বেশী প্রগতিশীল ছিল। কার্লমার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোয় বলেছেন "বুর্জোয়ারা (পুঁজিপতি শ্রেণী) ঐতিহাসিকভাবে একটা বিরাট বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।"

সুতরাং, সংক্ষেপে, প্রগতির অর্থ হল, নির্দিষ্ট সমাজে উৎপাদনশীল শক্তিগুলোর বিনাশ ও বিকাশ প্রচেষ্টা। বিকাশের পথে চলতি উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদন বৃদ্ধির এবং উৎপাদনশীল শক্তিগুলোর পরিবর্ধনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সামাজিক উৎপাদনের শক্তিগুলোর আরও বৃহত্তর আকারে মুক্তি সাধনের জন্য সেই সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাতে হয় এবং সেই কাজে অগ্রসর হয় প্রগতির শক্তিগুলো।

পুঁজিবাদের উত্থানের প্রাথমিক পর্বে মূলমন্ত্র ছিল অবাধ বাণিজ্য এবং অবাধ প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক পুঁজিপতিই জানত যে, যদি সে ক্রমাগত তার পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে না পারে, তাহলে তার প্রতিযোগীরা তাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়বে। তাই নিত্য নতুন আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। উৎপাদনের নতুন নতুন কলাকৌশল আবিষ্কারের জন্য ক্রমেই আরও বেশী বেশী পুঁজি লগ্নী করা হ'তে লাগল। তার ফলে নতুন নতুন কলাকৌশলের আবির্ভাব ঘটতে লাগল এবং উৎপাদনও বিরাট আকারে বেড়ে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে মজুরীভোগী শ্রমিকের সরবরাহ বেড়ে গেল হু হু করে। উৎপাদনের কলাকৌশলের বিকাশের ফলে পুঁজিপতিরা কম

শ্রমিক দিয়ে বেশী পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হওয়ার ফলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। তারই পরিণামে কালক্রমে শ্রমিকের চাহিদার চেয়ে সরবরাহ হয়ে গেল বেশী এবং আবির্ভাব ঘটল বেকার এবং আধাবেকারের প্রপঞ্চ। বেকারী ও আধাবেকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুরারোগ্য ব্যাধি।

উন্নততর কলাকৌশলের মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদনের এই বিকাশে চলতে থাকে বিরাট আকারে পুঞ্জীভবনের প্রক্রিয়া। পুঞ্জীভবন হয় দুটি স্তরে। একটি ঘটে উৎপাদন ইউনিটের স্তরে। নিছক অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই, এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনে অতি সূক্ষ্ম ও জটিল মেসিনপত্রের ব্যবহার, জটিল শ্রম-বিভাগ, বিশেষীভবন ইত্যাদির ফলে বৃহত্তর উৎপাদন ইউনিট গঠন না করে উপায় থাকে না। দ্বিতীয়, কোম্পানী কাঠামোর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও পুঞ্জীভবন ঘটে। তাই বহু বিশিষ্ট পুঁজিপতি আধুনিক যৌথ কোম্পানী অথবা বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠনের পথে অগ্রসর হয়।

এই পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই আবির্ভাব ঘটে মনোপলির। অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় মনোপলির অর্থ হচ্ছে সরবরাহের উপর প্রভাব বিস্তারের এবং সেই ভাবে পণ্যমূল্যের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা। একবার মনোপলির আবির্ভাব ঘটলে তারা চিরকালের জন্য বাজারের প্রভু হয়ে বসে। মুনাফাই পুঁজিবাদের একমাত্র লক্ষ্য ও চালিকা শক্তি বলে পুঁজিবাদী মনোপলিগুলো তাদের মুনাফার মাত্রা বাড়াবার জন্য প্রচণ্ড চাপ দেয়। কখনও কখনও উৎপাদন হ্রাস করে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

মনোপলি বাজারের উপর প্রভুত্ব করে নানা ভাবে। কখনও কখনও তারা বাজারে বৈশিষ্ট্যযুক্ত পণ্য ছেড়ে দেয়। সেগুলো কিন্তু আসলে নতুন নাম এবং ছাপে পুরোনো পণ্যই। বিক্রয় দক্ষতা ও বিজ্ঞাপনে ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করে এবং ভয় দেখিয়ে সেই পণ্য আরও বেশী দামে কিনতে বাধ্য করা হয়। আর এক পদ্ধতি হচ্ছে বিভিন্ন মনোপলির মধ্যে বাজার ভাগাভাগি করে নেওয়া। একের বাজারে অপরে ঢুকবে না। এছাড়া মনোপলিগুলো যথেচ্ছভাবে পণ্যের যে মূল্য নির্দিষ্ট করে, সেই মূল্যে পণ্য বেচতে ছোট ছোট প্রতিযোগীদের বাধ্য করা হয়। মনোপলিরা প্রতিযোগিতা পুরোপুরি বর্জন করতে চায়না। মনোপলির স্তরে পুরোনো ধরনের প্রতিযোগিতার অস্তিত্বও অবশ্য থাকে না। তখন প্রতিযোগিতা চলে এক মনোপলির সঙ্গে অপর মনোপলির। পণ্যমূল্যের তীব্র লড়াইয়ে সেই প্রতিযোগিতা প্রতিফলিত হয়। তখন এক পক্ষ অপর পক্ষের চেয়ে কম দামে একই পণ্য বাজারে ছাড়ে। এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে

কোন একটি মনোপলি অপর মনোপলিগুলোকে ডুবিয়ে আরও বৃহদাকার ধারণ করছে। অতঃপর সেই বিজয়ী মনোপলি তার ক্ষমতার জোরে অতি-মুনাফা কামাবার ব্যবস্থা করে নেয়।

মনোপলিভবন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে একত্রীভবন প্রকরণ। এটা মিলনেরই ( merger ) এক রূপ। প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীগুলো একত্রিত হয়ে এক বিরাটাকার সংস্থায় পরিণত হয়। অতঃপর বৃহত্তর সংস্থা অপর সংস্থাগুলো গ্রাস করে। একত্রীভবনের আরও একটি রূপ হচ্ছে পরস্পরের সংগে সংবদ্ধ ডাইরেক্টরেট ( অর্থাৎ এক গোষ্ঠী কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ডে একই গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের নিয়োগ )। একত্রীভবনের আর এক রূপ হচ্ছে "পিরামিডী-ভবন" ; এই পদ্ধতিতে পিতৃকোম্পানীতে ক্ষুদ্র অংশের অধিকারী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কয়েক শতগুণ অধিক পুঁজিদার কোম্পানীসমূহের বিরাট সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। ঢিলা-ঢালা বাজারচুক্তির অনেক ঘটনাও আছে। সেক্ষেত্রে কোম্পানী শুধু পণ্য উৎপাদন করে, কিন্তু সেই পণ্য বিক্রয়ের জন্য একটি সমন্বিত ব্যবসা প্রবর্তন করা হয়। একে বলে কার্টেল। বাজারচুক্তির অংশীদার কোম্পানীর পণ্য বিক্রয়ের এই ব্যবস্থাকে বলে বিক্রেতা সিন্ডিকেট।

মনোপলির পরিবৃদ্ধির একটি পরিণাম হচ্ছে এই যে যে শিল্পে মনোপলি প্রাধান্য বিস্তার করে, সেই শিল্পে নতুন কোন ইউনিটের বড় একটা বিকাশ ঘটে না। মনোপলি সব সময় নিষেধাত্মক—বেশীদামে মাল বেচবে বলে সে উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছোট ছোট পুঁজিপতিদের পক্ষে নতুন ইউনিট খোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ মনোপলির চালু ইউনিটগুলোর মুনাফার মাত্রা হ্রাস পেলেই তারা তখন ঐ সব ক্ষেত্রে আগ্রাসী অভিযান চালায়।

মনোপলির বিকাশের পরবর্তী স্তরে একত্রীকৃত বিরাটাকার সংস্থাগুলোও অপ্রতুল হয়ে যায়। তখন দেখা দেয় বহু কোম্পানী সংযুক্ত আরও বৃহদাকার সংস্থার (conglomerate) স্তর। মনোপলিভবন তখন সম্পূর্ণ হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তখন সে হয় শীর্ষদেশীয়, দিগন্তবিস্তৃত, ব্যাপক-স্থলাভিষিক্ত এবং সকল ক্ষুদ্র-বৃহতের আধার।

শিল্পে কনগ্লোমারেটের আর্বিভাবের সংগে সংগে আর্থিক ক্ষেত্রেও কনগ্লোমারেটের আবির্ভাব ঘটে এবং সেই দুইয়ের মধ্যে মিলনের ফলে বিশাল আর্থিক অলিগার্কির ( মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আধিপত্য ) সৃষ্টি হয়। সিঁড়ির আরও উপরে তৈরী হয় শিল্প-আর্থিক-সামরিক সমাহার। অগ্রসর

পুঁজিবাদী দেশগুলোর জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই সমাহারের আধিপত্য বিদ্যমান।

মনোপলিগুলোর ক্রমবর্ধমান শক্তি সংগ্রহের কালে নিজ নিজ দেশে (অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে) আরও বেশী বেশী পুঁজি লগ্নীর সুযোগ হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু তাদের হাতে প্রচুর লগ্নীযোগ্য মূলধন মজুত হয়ে যায়। এই পর্যায়ে আর্থিক অলিগার্কিগুলো (মনোপলি) বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর দেশগুলোয় পুঁজি রপ্তানির পথ অবলম্বন করে। ঐ সব দেশে প্রচুর কাঁচা মাল এবং সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায়। তাই গোড়া থেকেই অনুন্নত এলাকায় মুনাফার হারটা হয় অনেক বেশী। পুঁজি রপ্তানির সকল ক্ষেত্রেই অলিগার্কিগুলোর জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করবার প্রয়োজনে যে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে হয়েছিল, ইতিহাসেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই পর্যায়ে অলিগার্কিগুলো শুধু অতি-মুনাফা কামিয়েই খুশী থাকে না। এরপর সুরু হয় সর্বাধিক মুনাফা কামাবার অভিযান।

এইভাবে সর্বাধিক অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোয় আর্থিক অলিগার্কিগুলোর পরিবৃদ্ধির সংগে অনুন্নত দেশগুলোয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ অংগাংগীভাবে যুক্ত। কখনও কখনও সেটা প্রভুত্বের আকার গ্রহণ করে। এ বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা খুবই মর্মান্তিক। এদেশে বৃটিশ শাসন চালু হবার আগে বৃটিশ ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

## এরই নাম সাম্রাজ্যবাদ

এই পর্যায়ে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের মনোপলিগুলো অনুন্নত দেশগুলোয় সরাসরি মূলধন লগ্নী করতে থাকে—প্রথমে খনি শিল্পে, বাগবাগিচায় এবং সেবামূলক কারবারে এবং পরবর্তীকালে কলকারখানা-ভিত্তিক শিল্পে। অনুন্নত দেশগুলোতে মূল কোম্পানীর ভগিন-কোম্পানী এবং অধঃস্তন কোম্পানী হিসাবে নতুন নতুন কোম্পানী খাড়া করা হয় এবং তারা মনোপলির নিবিড় ও ব্যাপক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। এই হচ্ছে আধুনিক আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর বাল্য-শৈশবের চেহারা।

সুতরাং আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো সাম্রাজ্যবাদ নামে পরিচিত প্রপঞ্চের অবিচ্ছেদ্য অংগ।

সাম্রাজ্যবাদের উপর অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন জে. এ. হবসন, লিওনার্ড উল্‌ফ্‌ এবং রুডল্‌ফ্‌ হিলফারডিং। তবে এ বিষয়ে

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ভি. আই. লেনিন রচিত "ইম্পিরিয়ালিজম ঃ দি হাইয়েস্ট স্টেজ্ অফ ক্যাপিটালিজম" ( সাম্রাজ্যবাদ ঃ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় )।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যে সব মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তা হল এই ঃ (১) উৎপাদন ও পুঁজির পুঞ্জীভবন বিকাশের এত উচ্চস্তরে পেঁাছে যায় যে সেখানে সে মনোপলির সৃষ্টি করে এবং এই মনোপলিগুলো অর্থনৈতিক জীবনে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে ; (২) ব্যাংকের পুঁজি এবং শিল্প পুঁজির মিলন (merger) ঘটে এবং তারই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে আর্থিক অলিগার্কি'র "লগ্নী-পুঁজি" (finance capital) ; (৩) পুঁজি রপ্তানি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পণ্য রপ্তানির সংগে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই ; (৪) আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী মনোপলির আবির্ভাব। তারা পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয় ; (৫) বৃহত্তম পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর ( দেশ ) মধ্যে এলাকার ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীতে ভাগবাটোয়ারার কাজ সম্পন্ন হয়। ( ইম্পিরিয়ালিজম : দি হাইয়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম—সপ্তম অধ্যায় )। মনে রাখা দরকার লেনিন এটা লিখেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়।

তখনকার দিনের "আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী মনোপলি"ই বিকাশের মধ্য দিয়ে এযুগের আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনে পরিণত হয়েছে বলে বর্ণনা করা যায়।

মনোপলির পর্যায়ে পুঁজিবাদ নিষেধাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতে সুপরিচিত এম-আর-টি-পি আইন হচ্ছে "মনোপলিস এন্ড রেষ্ট্রিক্টেড ট্রেড প্র্যাকটিসেস এ্যাক্ট"। সুতরাং মনোপলির পর্যায়ে পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল ; উৎপাদনী শক্তিগুলোর পরিবৃদ্ধির পথে পুঁজিবাদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদ "সর্বোচ্চ পর্যায়ে" পেঁাছে গিয়ে যখন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় তখন সে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদ যে সব দেশে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, সেই সব দেশে শিল্পের বিকাশ প্রতিরোধ, এমন কি ধ্বংসও করে। শিল্প সম্ভাবনারও বিনাশ ঘটায়। সাম্রাজ্যবাদের হীনতম বিকাশের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে ফ্যাসিবাদ। সেটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের নির্মমতম নগ্নস্বরূপ।

সুতরাং বর্তমান অবস্থায় উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলো ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, সেই সংগ্রাম হচ্ছে প্রগতির লড়াই। কারণ এই লড়াই কার্যত ঐ সব দেশের উৎপাদনী শক্তিগুলোর বন্ধনমুক্তির লড়াই। শেষ পর্যন্ত

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে উৎপাদনী শক্তিগুলোর সীমাহীন মুক্তির জন্য সংগ্রাম।

অনুন্নত দেশগুলোয় মনোপলি এবং আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর পুঁজি রপ্তানি কখনও সেই সব দেশের শিল্পের পরিবৃদ্ধি এবং বিকাশের সহায়ক হয় না। রপ্তানী করা পুঁজির বেশীরভাগটাই লগ্নী করা হয় খনিজ সংগ্রহ এবং বাগবাগিচা জাতীয় প্রাথমিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ; কিছুটা করা হয় প্রক্রিয়ন শিল্পে এবং আধা-তৈরী কাঁচামাল প্রস্তুতের শিল্পে এবং পরবর্তী কালে বড় রকমের লগ্নী করা হয় ভোগ্য-পণ্য শিল্পে। অধ্যাপক আর. নার্কসে তাঁর "প্রবলেম্স্ অফ ক্যাপিটাল ফর্মেশন ইন আণ্ডার ডেভেলপ্ড্ কাণ্ট্রিজ" গ্রন্থে বলেছেন, বিদেশী পুঁজি স্বল্প আয় বিশিষ্ট দেশের ঘরোয়া অর্থনীতি বিকাশের পরিবর্তে সেই সব দেশের কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের চিরাচরিত ব্যবস্থাকেই আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলে।

আগেই বলেছি, সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার পুঞ্জীভবনেরই অর্থ মনোপলি। তাই রাজনীতির উপর, সমগ্রভাবে সমাজের উপর এবং সরকারী নীতির উপর মনোপলির প্রাধান্য আরও জোরদার এবং ঘনিষ্ঠতর হয়। রাষ্ট্র তখন প্রধান প্রধান মনোপলি গোষ্ঠীর স্বার্থ সাধনের কাজে এগিয়ে আসে এবং তার জন্য অন্যান্য পুঁজিপতিদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করতেও দ্বিধা বোধ করেনা। একেই বলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। এর এক ধাপ পরেই রাষ্ট্রীয় মনোপলি পুঁজিবাদ।

রাষ্ট্রীয় মনোপলি পুঁজিবাদ হচ্ছে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর জননী। সুতরাং আগেকার লগ্নী পুঁজির (finance capital) সঙ্গে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। সেই কারণে লক্ষ্য করা যায় যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো প্রতিটি দেশে আগেকার লগ্নী পুঁজির চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে তাদের পুঞ্জীভবনের মাত্রা বাড়িয়ে ফেলে। অর্থলগ্নীর সাধারণ ( সার্বজনীন ) উপায় এবং তার নিয়ন্ত্রণভার তাদের হাতে তুলে দিতে তারা বাধ্য করে। সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করে ক্ষমতা প্রয়োগের চিরাচরিত আধারকে নিজেদের সুযোগ সুবিধার অনুকূলে যথেষ্ট পরিমাণে পাল্টে দেবার ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে।

এই প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন : এই ক্ষয়ের প্রবণতা ( অর্থনৈতিক কাঠামো হিসাবে ক্ষয় ) দেখে এটা অনুমান করা ঠিক হবে না যে, পুঁজিবাদের দ্রুত পরিবৃদ্ধির

সম্ভাবনা নিবারিত হচ্ছে……পুঁজিবাদ (সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে) আগের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠছে।" ( **ইম্পিরিয়ালিজম : দি হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম** )।

মনোপলি ও রাষ্ট্রীয় মনোপলি পুঁজিবাদের পরিবৃদ্ধির এই প্রপঞ্চের আরও একটি দিক আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মার্কিন প্রশাসন "অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুঞ্জীভবন" সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করেছিলেন। তদন্তকারী বার্লে এবং মিনস্ তাদের রিপোর্টে বলেছিলেন : "আধুনিক কর্পোরেশনের উত্থান যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুঞ্জীভবনের উদ্ভব ঘটিয়েছে তা আধুনিক রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম। ভবিষ্যতে হয়ত দেখা যাবে প্রধান সামাজিক সংগঠন হিসাবে কর্পোরেশনগুলো রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।"

অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুঞ্জীভবনই মনোপলিগুলোর নিজ নিজ দেশের সীমানা অতিক্রম করে বাইরের জগতে প্রভুত্ব বিস্তারের চালিকা শক্তি। সেই কারণেই এগুলোকে বলা হয় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন। রাষ্ট্রকে তারা তাদের কাজে সহযোগিতা করতে বাধ্য করে এবং অতঃপর সমুদ্র পারের দেশগুলো লুট-পাটের কাজটা হয়ে দাঁড়ায় আন্তর্দেশীয় কোম্পানী ও রাষ্ট্রশক্তির যৌথ অভিযান।

সুতরাং আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো হচ্ছে বর্তমানকালের পুঁজিবাদী বিকাশের অবদান। এগুলো একাধিক মহাদেশে পা রেখে দাঁড়ানো দৈত্য বিশেষ। নিছক বৃহৎ অথবা অতি বৃহৎ কারবারের ব্যাপার আর এগুলোর নেই। গুণগত-ভাবে এগুলো নতুন ধরনের ইউনিট। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং পুঁজিবাদী সমাজের সমগ্র সংগঠনের উপর এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবই এই ইউনিটের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ে সব চেয়ে শক্তিশালী কনগ্লোমারেটগুলো ( বহু কোম্পানী সংযুক্ত অতি বৃহৎ সংস্থা ) রাষ্ট্রীয় সহায়তায় অন্যান্য দেশের কনগ্লোমারেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবার প্রয়াস পায়। প্রতিযোগীদের সঙ্গে সমান-তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুবিধার জন্য এবং পুঁজির আন্তর্জাতিক পুঞ্জী-ভবনের বিরুদ্ধাচরণের জন্য আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে অর্থ সামর্থ জুগিয়ে সাহায্য করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো। এমন অঘটন ঘটবার কারণ, মনোপলি এবং অতি বৃহৎ মনোপলির পর্যায়ে এবং আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ও কনগ্লোমারেটের পর্যায়েও তারা কখনও স্ববিরোধিতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। নতুন পর্যায়ে প্রতিযোগিতা ও অন্তর্বিরোধ আরও বিপজ্জনক

হয়ে ওঠে। তখন মনোপলিগুলোর মধ্যে বিশ্বের বাজার ভাগবাটোয়ারার জন্য বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার স্ব-বিরোধীর পরিণাম এড়াবার জন্য এবং আর্থিক ভিত্তি দৃঢ়তর করবার জন্য আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মধ্যে এক ধরনের অংগীকরণ ( অন্যান্য কোম্পানীগুলোকে নিজের অংগীভূত করে নেওয়া ) এবং এক অতিজাতিক ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ মনোপলিগুলোর মধ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো।

ইউরোপে বিভিন্ন গভর্ণমেন্ট এবং মনোপলিগুলোর তরফ থেকে একটা অতিজাতিক ক্ষমতাধিকারী সংগঠন তৈরীর চেষ্টা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই রকম একটি সংগঠনের নাম ইন্টারন্যাশনাল মানিটারী ফান্ড (আই-এম-এফ)। এই আই-এম-এফ মার্কিন ডলারের প্রাধান্য রক্ষা করে, ইউরোপীয় পুঁজি এক জায়গায় জড়ো করে, মুদ্রামূল্যে হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয় এবং বৃহত্তর আকারে পুঁজির ফাটকাবাজী চালায়। কিন্তু এই আই-এম-এফও সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব স্তব্ধ করতে পারে না। ইউরোপের প্রায় সকল আর্থিক উত্থান-পতনের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমগ্র পরিস্থিতির মূলে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মার্কিন নীতি। আমেরিকার মার্শাল প্ল্যানেই সেটা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। আশু অর্থনৈতিক ফল লাভ এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল না। এর লক্ষ্য ছিল সমগ্রভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলোর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করা। আমেরিকা বহু রাষ্ট্রকে ডলার ঋণ দিয়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ার ব্যাংকারের ভূমিকাও গ্রহণ করে। তার ফলে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় ডলারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলির সাম্প্রতিককালের পরিবৃদ্ধি সমগ্র পুঁজি-বাদী দুনিয়ার উপর আমেরিকার প্রভুত্বেরই প্রত্যক্ষ পরিণাম। কিন্তু লেনিনই বলেছেন, পৃথিবীতে কোন অতি-সাম্রাজ্যবাদের (super imperialism) আবির্ভাব ঘটতে পারে না। সেই কারণেই আজকের দুনিয়ায় আমেরিকার সঙ্গে অন্যান্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তীব্র বিরোধ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ডলার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের বিদ্রোহ নিশ্চয়ই কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। এই বিদ্রোহ পশ্চিম জার্মানীতেও ঘনায়মান। আমেরিকার সকল অপকর্মে ব্রিটিশ পার্লা-মেন্টের যোগসাজস রয়েছে বটে তবে মার্কিন প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বৃটেনে প্রায়ই বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে।

মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের হিসাবে বিদেশে আমেরিকার সরাসরি লগ্নীর পরিমাণ ৭০০০ কোটি ডলারের মত। এটা ১৯৬৯ সালের হিসাব। তার মধ্যে ৪৮০০ কোটি ডলার লগ্নী করা আছে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় মার্কিন লগ্নীর পরিমাণ ২০০০ কোটি ডলার। জাপানে মার্কিন লগ্নীর পরিমাণ ১০০ কোটি ডলার এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ১০০ কোটি ডলার।

এটাও বিশেষ লক্ষ্যণীয় ঘটনা যে ১৯৬৯ সালে বিদেশস্থ মার্কিন কোম্পানীগুলোর সাজসরঞ্জামের জন্য আমেরিকার বাজার থেকে ১৩০০ কোটি ডলারের মালপত্র খরিদ করা হয়েছিল।

এই ভাবেই মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো অপর দেশকে শোষণ করে থাকে।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো ক্রমেই আরও বেশী বেশী করে অপর কোম্পানীগুলোকে অঙ্গীভূত করে নেয় এবং সেই প্রক্রিয়ায় অনেক দুর্বল কোম্পানীর হয় ভরাডুবি। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিণত হওয়ার ফলেই এই অঙ্গীকরণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কার্যত নতুন নতুন কৃৎকৌশল প্রয়োগের একচেটিয়া সুযোগ তাদেরই আছে। এতদূর ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো সর্বাধিক পুঁজিবাদী মুনাফা আদায়ের মতলবে উৎপাদনী শক্তিসমূহের দ্রুত পরিবৃদ্ধির পথ রোধের নতুন নতুন পন্থা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুতরাং একথা পরিষ্কার ভাষায় বলা চলে যে আজকের দিনে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো বিশ্বের পক্ষে এক অতি বিপজ্জনক অধঃপতনশীল সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠন।

## সূত্র ও উল্লেখপঞ্জী


১ মরিস ডব : ক্যাপিটালিজম—ইয়েসটারডে এণ্ড টুডে।

২ সায়েন্স এণ্ড সোসাইটি।

৩ ভি. আই. লেনিন : ইম্পিরিয়ালিজম—দ্য হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম।

৪ আর. নারকস্ : প্রবলেমস্ অব ক্যাপিটাল ফরমেশন ইন আণ্ডারডেভেলপড্ কানট্রিজ।

চতুর্থ অধ্যায়

# কিভাবে তাদের কাজকারবার চলে—কয়েকটি দৃষ্টান্ত

মার্কিন অর্থনীতিবিদ রেমন্ড ভার্নন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, তাতেই তাদের আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, যে কোন একটি আন্তর্দেশীয় কোম্পানী হচ্ছে এমন একটি সংস্থা, যার বাণিজ্যিক লেন-দেনের পরিমাণ কয়েক বিলিয়ান এবং তার ক্রিয়াকাণ্ডে সে বিদেশমুখী। আর কমপক্ষে অন্তত ছয়টি দেশে সে উৎপাদনকারী উদ্যোগের মালিক।

ভার্ননের তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের ২৮৭টি বৃহদাকার আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর মধ্যে ১৮৭টির মালিক হচ্ছে আমেরিকা। বাকী ১০০টির মালিক অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলো। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পর্ষদের (UNESCO) বক্তব্য হচ্ছে ঃ

"বিগত ২৫ বছর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের নাটকীয় বিকাশ বিশ্বে এক মস্ত প্রপঞ্চ হিসাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। আকার, ভৌগলিক বিস্তার, ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাপকতা, দুনিয়াব্যাপী সম্পদ সৃষ্টি ও তার উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেই সম্পদের ব্যবহার ইত্যাদির দিক দিয়ে দেখতে গেলে কর্মপরিধি ও সংশ্লেষে আন্তর্দেশীয় কোম্পানী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চিরাচরিত অর্থনৈতিক বিনিময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।"

কাজেই সব দিক থেকেই এটা পরিষ্কার যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো গুণগতভাবে চিরাচরিত শিল্প-বাণিজ্য ইউনিট থেকে পৃথক ধরনের—যদিও উভয়ই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবদান। শুধু মাত্র পুঁজিবাদী বিধির উপর দাঁড়িয়েই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো দৈত্যের আকার ধারণ করেনি। তাদের বৃহদাকার ধারণের মূলে অন্য কারণও আছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য বব এডওয়ার্ডস আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলির পরিবৃদ্ধির নিম্নলিখিত কারণগুলো তালিকাভুক্ত করেছেন ঃ

(১) যুদ্ধের ফলে সৃষ্টি হওয়া সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ; (২) যুদ্ধের

সময় বিধ্বস্ত এবং বিপর্যস্ত শিল্প পুনর্গঠনের জন্য আশু লগ্নীর প্রয়োজনীয়তা ; (৩) বৈদেশিক বিনিময় সম্পদের ব্যাপক অবক্ষয় ; (৪) উৎপাদনের মাত্রা হ্রাস, বিশেষ করে ইউরোপে ; (৫) স্থানীয় সম্পদ বৃদ্ধির জরুরী প্রয়োজনে দেশের সর্বত্র বিদেশী লগ্নীর স্বাগত-সম্ভাষণ লাভ ; (৬) বিদেশী কোম্পানীর উপার্জন আটক—যার ফলে তারা তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল উপার্জন আটককারী দেশেই লগ্নী করতে বাধ্য হয় ; (৭) ক্রমেই আরও বেশী বেশী দেশের দ্রুতগতিতে মুক্তির পথে অগ্রসর হবার প্রয়োজনীয়তা। আরও বিদেশী পুঁজি আকর্ষণের জন্য বিদেশী লগ্নীর আয় স্বদেশে প্রেরণ ; (৮) ইউরোপে মার্কিন অভিজ্ঞতাভিত্তিক বৃহদাকার উৎপাদন পদ্ধতির চাহিদা বৃদ্ধি ; (৯) ইউরোপে উৎপাদনের বিরাট ঊর্ধ্বগতি এবং বারোয়ারী বাজার (common market) তৈরী করে শুল্ক হ্রাস ; (১০) গ্রেট বৃটেনে লগ্নীর ফলে এমন এক স্বাধীন বাণিজ্যের এলাকায় প্রবেশ লাভের সুযোগ ঘটে যেখানে বাস করে ১০ কোটি ক্রেতা ; (১১) যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট ও নাটকীয় উন্নতি—যার ফলে মুহূর্তের মধ্যেই বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যে কোন মানুষকে চোখেও দেখা যায় এবং তার সঙ্গে কথাবার্তাও বলা যায়।

বব এডওয়ার্ডস আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলোর চরিত্র বর্ণনা করেছেন নিম্নলিখিতভাবে ঃ

(ক) এদের আচরণ সম্পূর্ণ স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত। কোন মানবিক অথবা সামাজিক ন্যায় নীতির প্রতি এদের শ্রদ্ধা নেই। আন্তর্জাতিক নিয়মের বাঁধনে বাঁধা না থাকলে এদের অপকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে ; (খ) কোন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই ; (গ) বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের উপযোগী কোন সংস্থা নেই ; (ঘ) রেজিস্ট্রেসন ও কর ধার্যের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ নেই। আন্তর্জাতিক সদাচরণ ও শ্রম-মান প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা ; (ঙ) বিরোধ, বিধি এবং সামাজিক দায় দায়িত্ব বিচারের কোন চালু ট্রাইবুনাল নেই ; (চ) এই গ্রহে আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলোই প্রধানত আবহাওয়া দূষিতকরণের জন্য দায়ী। আকাশ-বাতাস-নদনদী সমুদ্র খাল বিল ক্রমেই আরও ব্যাপকভাবে দূষিত করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও এই কোম্পানীগুলো স্বদেশের সামাজিক দায় দায়িত্ব এড়াবার জন্য কর ফাঁকির স্বর্গ রচনা করেছে এবং দূষিতকরণ নিবারণী আইন এড়াবার জন্য দূষিতকরণের স্বর্গ রচনার প্রয়াস পাচ্ছে ; (ছ) এই কোম্পানীগুলো তাদের পিতৃ কোম্পানীর নীতি প্রয়োগ করে এবং পিতৃ কোম্পানীগুলো পিতৃদেশের গভর্ণমেন্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাই সেটা প্রায়ই

ভিন দেশের ( যে দেশে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর শাখা অথবা অধঃস্তন সংস্থা কাজ-কারবার করে ) স্বার্থের পরিপন্থী হয় ; (জ) সর্বাধিক মুনাফা কামাবার স্বার্থে তারা বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর বিকাশ প্রক্রিয়ার উপর অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেয় । তারা বাইরের লোকের সুবিধার জন্য স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে ; (ঝ) বিশ্বের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণ অতি দ্রুত তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যক আন্তর্জাতিক কোম্পানীর কুক্ষিগত হচ্ছে । মোটামুটি ২০০০ কোম্পানী সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়া কব্জা করে রেখেছে ; (ঞ) তারা ধনীকে আরও ধনী করার এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করার, ধনী দেশকে আরও ধনী দেশে পরিণত করার এবং দরিদ্র দেশকে আরও দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেবার এক অতি সুদক্ষ ব্যবস্থা চালু করেছে ।

"দ্য মাল্টিন্যাশানাল" গ্রন্থের রচয়িতা ক্রিস্টোফার টুগেণ্ডহাট বলেছেন যে আজকের আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর ক্রমবিকাশের পথে কার্টেল হচ্ছে একটি পদ-ক্ষেপ । তারা শিল্পপতিদের আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনের কাজ কর্মে ট্রেনিং দিয়ে দেয় ; জাতীয় বিরোধ অনুধাবন করতে এবং তদনুযায়ী বাণিজ্যিক রীতি-নীতি রদবদলের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতেও তারা ( কার্টেল ) শিখিয়ে দেয় । শুধু স্বদেশের ঘরোয়া বাজারে পণ্য সরবরাহ এবং উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানির কথা চিন্তা না ক'রে সারা বিশ্বের পটভূমিকায় নিজেদের শিল্পের সমস্যা বিবেচনা করতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ।

এই ভাবেই তথাকথিত আন্তর্জাতিক কোম্পানীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং এযুগে শিল্প সংগঠনের এটাই বৈশিষ্ট্য । এই পরিবর্তনের মূলে আছে প্রধানত আমেরিকা । সুতরাং বর্তমানে বিশ্বে সরাসরি বৈদেশিক লগ্নীর ৬৫ শতাংশেরই মালিক যে মার্কিন কোম্পানী তাতে অবাক হবার কিছু নেই । আর মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানী মার্কিন মুলুকেই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত । অন্যান্য কোম্পানী যে দেশের, সেই দেশেই তার শিকড় প্রোথিত । ডাউ কেমিকাল ইউরোপের প্রেসিডেণ্ট হার্বার্ট ডোয়ান "টাইম" পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বলেছেন "ডাউ একটি বিশ্বব্যাপী কোম্পানী তবে এর সদর দপ্তর মিডল্যাণ্ডে, মিচিগানে ( আমেরিকা ) ।"

যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে কোম্পানীগুলোর পক্ষে সারা দুনিয়ায় ছড়ানো শাখা ও অধঃস্তন সংস্থার কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করা মোটেই কঠিন হয় না । উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যায় যে বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীতে ফোর্ডের যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট আছে তার সংগে এমনভাবে ডেট্রয়েটের টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে যে ঐসব দেশের ছক প্রণয়ন-

কারীরা অনায়াসেই সদর দপ্তরের কম্পিউটারকে কাজে লাগাতে পারেন। আই-বি-এম'র হাতে আছে ৩ শত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কেন্দ্র। তার মাধ্যমে প্রতিদিন টেলিটাইপ করা ১০ হাজার বার্তা আনাগোনা করে।

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর পরিবৃদ্ধির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা ক'রে রেমণ্ড ভার্নন তাঁর "ফরেন এফেয়ার্স" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বলেন যে ১৯৫৩ ও ১৯৬৫ সালের মধ্যে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে আন্তর্জাতিক পর্যটকের আনা-গোনা বছরে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। একই কালে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোয় মার্কিন লগ্নীর পরিমাণও ঐহারে বৃদ্ধি পায়। এই দুই ঘটনার মধ্যে একটা সরাসরি যোগসূত্র আছে বলে ভার্নন মনে করেন।

ফাইজার কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট ও মুখ্য নির্বাহী জন জে পাওয়ার্স বিদেশে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর সরাসরি লগ্নীর পক্ষে বলেছেন, "বৃহৎ বাজারের একটা বড় অংশের জন্য কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে বাজারে সরাসরি অর্থলগ্নী করতে হয়। মৌলিক উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করলে তা খুবই ভাল হয়। আর যদি সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে বিক্রয়-অফিস-গুদাম এবং অন্তত প্যাকেজিং ও যন্ত্রাংশ সংযোজনের কারখানা স্থাপন করা দরকার। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বৃহৎ বাজারে নিছক রপ্তানিকারক হিসাবে বেশী দিন টিকে থাকা সম্ভব নয়।"

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিদেশ যাত্রার সুবিধা অনেক। ডু পোণ্ট কোম্পানীর অফিসার বেলা বালাসা বলেছেন "আমরা যদি কারখানা না খুলি, তাহলে সেই শূন্য স্থান পূরণ করবে স্থানীয় প্রতিযোগী। এ অবস্থায় আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে। হয় স্থানীয় উৎপাদকের কাছে আমাদের কারবার খোয়া যাবে, না হয় যাবে আমাদের নিজেদের কাছে। শেষেরটাই আমরা পছন্দ করি। কোন কোম্পানী ভিন দেশে অর্থ লগ্নী করলে চাহিদার আকস্মিক মাত্রা পরিবর্তনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। স্থানীয় খরিদ্দার কি ধরনের পণ্য চাইছে তাও সে সহজেই টের পেয়ে যায়। কিন্তু যে প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা থেকে পণ্যের সরবরাহ পায়, তার পক্ষে এই সব সুবিধা লাভের কোন সুযোগ থাকে না।

উপরন্তু ভিনদেশে শ্রমিকের মজুরী এবং উৎপাদন-ব্যয় অনেক কম। এমন কি আমেরিকার তুলনায় ইউরোপেও। প্রত্যেক দেশেরই কোন না কোন জিনিষ খুবই উৎকৃষ্ট। কোন দেশের বন্দরের ব্যবস্থা খুবভাল, কোন দেশে সস্তার

শ্রমিক সহজলভ্য, আবার কোন কোন দেশে লগ্নীর প্রনোদনা প্রচুর। আমেরিকার কোম্পানীগুলো প্রত্যেক দেশেই এই সব সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে সক্ষম।

যে সব দেশে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কারবার করে, সেই সব দেশের গভর্ণমেন্টকে বোঝানো হয় যে তারা স্থানীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধি সাধন করছে—বেকারদের চাকরি দিচ্ছে, গভর্ণমেন্টকে কর দিচ্ছে এবং কলকারখানা বানিয়ে পড়শী দেশের আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দিচ্ছে।

মার্কিন কোম্পানীগুলোর আর একটি লক্ষ্য হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিজেকে "অতিবৃহৎ" হিসাবে প্রকাশ না করা। জাতীয়তাবাদী অসন্তোষজনিত রাজনৈতিক চাপ এড়াবার কৌশল হিসাবেই এই নীতি তারা গ্রহণ করেছে।

পিঠে না খেলে তার স্বাদ পাওয়া যায় না। বিদেশ যাত্রার ফলাফল বিচার করেই মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো বুঝতে পেরেছে যে বিদেশে মূলধনী লগ্নী তাদের কাছে কতখানি ফলপ্রসূ। বহু বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে কলকারখানাজাত পণ্য উৎপাদন করতে আমেরিকায় যে অর্থ ব্যয় হয় ভিন্ন দেশে তার চেয়ে কম অর্থে সেই পণ্য উৎপাদন করা যায়। সিঙ্গার সেলাই কল-ই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমেরিকায় দুটো সেলাই কল উৎপাদন করতে যে অর্থ ব্যয় হয়, কোম্পানী ভিন দেশে তিনটে সেলাই কল বেচে সেই টাকায়। একটি বৃটিশ কোম্পানী অধিগ্রহণের সময় একটি মার্কিন কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী হিসাব করে বলেছিলেন যে বৃটিশ কারখানায় মাল তৈরী ক'রে সেই মাল আমেরিকায় চালান দিতে যে খরচ পড়বে, তা আমেরিকার তৈরী একই পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের তিন চতুর্থাংশ মাত্র। বর্তমানে আমেরিকার বহু কোম্পানীই ভিন দেশে সস্তায় পণ্য উৎপাদনের ইউনিট স্থাপন ক'রে সেখানকার পণ্য দিয়ে আমেরিকার বাজার ছেয়ে ফেলছে।

আগেই বলেছি, পুঁজিবাদের আকারে এবং বিস্তারে যত পরিবর্তনই ঘটুক, পুঁজিবাদ পুঁজিবাদই রয়ে যাবে। তাই বহুকাল বাদে ভিন দেশে মার্কিন লগ্নীতে মন্দা দেখা দেয়। দেখা যায়, শিল্পের দ্রুত বর্দ্ধমান চাহিদা পূরণ করার মত যথেষ্ট সঞ্চয় পুঞ্জীভূত করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমন এক সময় আসে যখন খোদ আমেরিকাতেই বিদেশী লগ্নীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমেরিকা তখন ভিন দেশে ধ্বনি তোলে "আমেরিকায় মূলধন লগ্নী করুন"।

তখন দেখা গেল বৃটিশ কোর্টল্ডস্ এবং লিভার ব্রাদার্স, এ্যাংলো-ডাচ শেল, পশ্চিম জার্মান বেয়ার, সুইস হফম্যান, লা রোস এবং অন্যান্য বহু কোম্পানী

আমেরিকায় বিরাট অধঃস্তন সংস্থা গঠন করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে মার্কিন কোম্পানীর ভিন দেশস্থ অধঃস্তন সংস্থাগুলো মার্কিন মুলুকের সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, উপরোক্ত কোম্পানীর মার্কিন মুলুকস্থিত অধঃস্তন সংস্থাগুলো কিন্তু তেমনি স্ব-স্ব দেশের সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকতে সক্ষম হয়নি। আমেরিকা ভিন দেশের কারবারে লিপ্ত আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার তো বজায় রাখেই উপরন্তু ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর মার্কিন মুলুকস্থিত অধঃস্তন সংস্থাগুলোর উপরও নিজের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।[১]

মার্কিন গভর্ণমেণ্ট আমেরিকায় মূলধন লগ্নীর জন্য বিদেশীদের উৎসাহ প্রদান করে। ভিন দেশস্থ মার্কিন কোম্পানীর পরিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ ঠান্ডা করার জন্যই এটা করা হয়। অপর দিকে বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণ করে আমেরিকা দেশের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী করে এবং তাই দিয়ে সে তার বৈদেশিক লেন-দেনের হিসাব মেটায়।

তা সত্ত্বেও বাইরের সব কোম্পানীই আমেরিকায় পণ্য এবং পুঁজি রপ্তানি করতে আগ্রহী। এই কোম্পানীগুলো মুনাফা অর্জন ছাড়াও আন্তর্জাতিক ইউরো-কারেন্সী ( মুদ্রা ) বাজারের মাধ্যমেও অর্থ সংগ্রহে সক্ষম। ঐ বাজারগুলো গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তৃতীয়ত, আমেরিকা হচ্ছে পুঁজিবাদী বিশ্বের সব চেয়ে বড় বাজার। আমেরিকায় মাথাপিছু আয় ৪৩৮০ ডলার। অপর দিকে ই-ই-সির (ইউরোপীয় ইকনমিক কাউন্সিলের) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মাথাপিছু আয় ২০৪০ ডলার, সুইডেনে ৩২৩০ ডলার এবং কানাডায় ৩০১০ ডলার। কোন কোম্পানী যদি একবার আমেরিকায় ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে তার কারবারের এবং মুনাফার পরিমাণ বিরাট আকার ধারণ করে। ডলারের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা তার বৈদেশিক বিনিময় হারের তুলনায় অনেক কম হলেও আমেরিকার বাজার পাবার জন্য হুড়োহুড়ির অন্ত নেই।

প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। ব্যতিক্রম হচ্ছে তিনটি পশ্চিম জার্মান আন্তর্দেশীয় রাসায়নিক কোম্পানী—হেক্সট্, বেয়ার এবং বি-এ-এস-এফ; ইটালীর অলিভেত্তি কোম্পানী—এই কোম্পানী আন্ডারউড টাইপরাইটারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে এবং বৃটিশ পেট্রলিয়াম।

এর আসল কারণ, মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো আকারের দিক দিয়ে সত্যই দৈত্য বিশেষ। ১৯৬৯ সালে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-

গুলোর সঙ্গে ইউরোপীয় আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর একটা তুলনা করা হয়েছিল। তাতে দেখা যায় ২৩টি মার্কিন কোম্পানী বছরে ৩০০ কোটি ডলারের পণ্য বিক্রয় করে। ইউরোপে এই পরিমাণ অর্থের পণ্য বিক্রয় করা কোম্পানীর সংখ্যা মাত্র ছয়টি। ইউরোপের এই ছয়টি বৃহদাকার কোম্পানী হচ্ছে: শেল, ইউনিলিভার, ফিলিপস্, ভোকসওয়াগেন, বৃটিশ পেট্রলিয়াম, ইম্পিরিয়াল কেমিকাল ইন্ডাস্ট্রিজ। ভোকসওয়াগেন পশ্চিম জার্মানীর বৃহত্তম কোম্পানী কিন্তু তা সত্ত্বেও পণ্য বিক্রয়ের পরিমাপে এই কোম্পানী আমেরিকার সপ্তদশ স্থানাধিকারী কোম্পানীর কাছাকাছি যায় মাত্র। রেনল্ট হচ্ছে ফ্রান্সের বৃহত্তম কোম্পানী কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাপে রেনল্ট আমেরিকার ৪০তম স্থানের অধিকারী কোম্পানীর কাছাকাছি যায় মাত্র।[২]

মার্কিন মনোপলি পুঁজির "আগ্রাসী অভিযান" ক্রমেই বেশী বেশী সাফল্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রভাবে ইউরোপে এবং স্বতন্ত্রভাবে ইউরোপের একই দেশে পুঁজিবাদের অন্তর্বিরোধের বিধি ও কাজ সুরু করে দেয়। ইউরোপের প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশের মনোপলিগুলো নতুন পরিস্থিতিতে মিলনের (merger) পন্থা অবলম্বন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে মিলন ঘটল অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মিলন ঘটল আপোষে। বৃটেনের হিসাবে প্রকাশ, বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে মিলনের শতকরা ৯০ ভাগই ঘটেছে আপোষে। মিলন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব পক্ষই পরস্পরের সম্মতিক্রমে মিলিত হয়েছে। সমগ্রভাবে ইউরোপেও অনুরূপ মিলনের শতকরা হার এর থেকে বেশী ছাড়া কম হবে না।

বৃটেনে মাত্র দুই বছরের মধ্যে ৫০০০ কোম্পানী নিজেদের মধ্যে মিলনের পন্থা অবলম্বন করে। ঠিক এই কালপর্বের আগেই বৃটেনে এক দশককাল ধরে শিল্পের পুঞ্জীভবন ঘটেছিল। ষাটের দশক শেষ হতে না হতেই বৃটিশ শিল্পের সমস্ত চেহারাটাই একেবারে পাল্টে যায়।

গ্রাহাম ব্যানক তাঁর "দ্য জাগারনাটস্" গ্রন্থে লিখেছেন: "ফ্রান্স ও বৃটেনে ১৯৬৭ সালে ৯৯ শতাংশ মোটর গাড়ী উৎপাদন করেছিল ৪টি কর্পোরেশন; পশ্চিম জার্মানীতে ৯৬ শতাংশ মোটর গাড়ী তৈরী করেছিল চারটি মোটর গোষ্ঠী; সুইডেনে মোটরগাড়ী উৎপাদনকারী কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মাত্র দুটি এবং ইটালীর প্রায় সব মোটর গাড়ীই বানিয়েছিল মাত্র দুটি কোম্পানী। ১৯৬৭ সালে জাপানের ৭২ শতাংশ মোটরগাড়ী তৈরী করেছিল মাত্র ৪ টি কোম্পানী

এবং আমেরিকায় ৯৫ শতাংশ মোটর গাড়ী তৈরী করেছিল মাত্র তিনটি কোম্পানী।"

বর্তমান বৃটেনে দি ইন্টারন্যাশানাল কম্পিউটরস্ নামে একটি অতি বৃহৎ কোম্পানী আছে। আমেরিকার বাইরে এত বড় কোম্পানী আর কোথাও নেই। এই কোম্পানী প্রকৃতপক্ষে ১০ টি পৃথক কোম্পানীর মিলনের ফল। ফ্রান্সেও মোটামুটি এই একই রকমের ঘটনা ঘটে।

পশ্চিম জার্মানীর চিত্র একটু ভিন্ন প্রকারের। সেখানে সমগ্র অর্থনীতিই তিনটি ব্যাঙ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যাংকগুলো হচ্ছে ঃ ডুয়েট্স্ ব্যাংক, দি ড্রেসডেনার ব্যাংক এবং দি কমারজ ব্যাংক। এই ব্যাংকগুলো শিল্প কোম্পানীগুলোকে ঋণ দেয়, মূলধন লগ্নী ট্রাষ্ট চালায়, শেয়ার বাজারে দালালী করে। নতুন শেয়ার বিক্রীর ব্যবস্থাপনা করে। এই তিন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্যদের অন্যান্য নানা কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডেও দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিম জার্মানীর শিল্প পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত এবং তার উপর উপরোক্ত ডিরেক্টরদের প্রভাব যে কি প্রচন্ড তা সহজেই অনুমেয়। সেখানে কোম্পানীগুলো পরস্পরকে গ্রাস করার সহযোগিতামূলক চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করতেই ভালবাসে।

ইটালীতে ফিয়াট, পিরেল্লি এবং ওলিভেত্তির মত বিশাল বিশাল কোম্পানী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হলেও রাষ্ট্রের অধীনেও এক বিশাল শিল্পক্ষেত্র বিদ্যমান। রাষ্ট্রীয় হোল্ডিং কোম্পানী (বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারেব অধিকারী) ইন-ষ্টিটিউটো পার লা রিকন্ট্রুজিয়োন ইন্ডাস্ট্রিয়ালে (সংক্ষেপে আই-আর-আই) কার্যত ১৪০ টি কোম্পানীর মালিক এবং আরও বহু কোম্পানীর নিয়ন্ত্রক। আলফা রোমিও, আলিটালিয়ে, প্রধান প্রধান ইস্পাত কোম্পানী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বেতার কোম্পানী, বহু সংখ্যক ব্যাংক এবং আরও বহু উদ্যোগের মালিক এই আই-আর-আই।

ইটালীতে আর একটি বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানী হচ্ছে এন্টে ন্যাজিয়োনেল ইড্রোকারবুরি (সংক্ষেপে ই-এন-আই)। এই কোম্পানী ইটালী ও তার বাইরে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের কারবার করে। কখনও আই-আর-আই এবং ই-এন-আই যৌথভাবে কাজ করে। তাদের যৌথ প্রচেষ্টা যে খুবই কার্যকর হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সুইজারল্যান্ডে দুটি বৃহদাকার রাসায়নিক এবং ঔষধ কোম্পানী সিবা (C I B A) এবং গিগি (G E I G Y) একত্রিত হয়েছে। হল্যান্ডে বৃহত্তম

রাসায়নিক কোম্পানী এ-কে-ইউ এবং কে-জেড-ও (A. K. U and K. Z. O) পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুইডেনে ষাটের দশকে ২০০০ কোম্পানী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। দেশের ২০ শতাংশ শিল্প-শ্রমিক তাতে অসুবিধায় পড়ে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইউরোপে শিল্প পুঞ্জীভবন এবং কেন্দ্রীভবনের পথে এগিয়ে গেছে এবং বৃহদাকার কোম্পানীর আবির্ভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অন্যান্য দেশের চেয়ে বৃটেনেই পুঞ্জীভবনের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। গ্রাহাম ব্যান্নক মনে করেন যে পুঞ্জীভবনের ব্যাপারে বৃটেন আমেরিকার প্রায় সমকক্ষ। বৃটেনে উৎপন্ন সিগারেটের ৮০ শতাংশের মালিক তিনটি মাত্র কোম্পানী। ইলেকট্রিক বাল্ব তৈরীর দুটি বৃহৎ কোম্পানী বৃটেনের ৬৫ শতাংশ বাল্ব তৈরী করে, বৃটেনে যে পেট্রল বিক্রী হয় তার ৮০ ভাগই সরবরাহ করে তিনটি তৈল কোম্পানী, বৃটেনে যত ড্রাই ব্যাটারি বিক্রী হয় তার ৮০ শতাংশ সরবরাহ করে একটি কোম্পানী। বৃটেনে ব্যবসা-বাণিজ্যে মোট যে মুনাফা অর্জিত হয়, তার প্রায় অর্দ্ধেকই গিয়ে ঢোকে বড় বড় ১০ টি কর্পোরেশনের সিন্দুকে (১৯৬৮ সালের হিসাব অনুযায়ী) এবং বৃটেনের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিক-কর্মচারীর এক তৃতীয়াংশই ঐ কর্পোরেশনগুলোয় নিযুক্ত। বর্তমানে বৃটেনে শিল্পের মুনাফার এক তৃতীয়াংশই গ্রাস করে প্রথম ২৫টি কর্পোরেশন। এই পুঞ্জীভবনের ব্যাপারে আমেরিকার সঙ্গে বৃটেনের একটা পার্থক্য বিদ্যমান। বৃটেনে উপরের দিকের স্থান দখল করে আছে তৈল ও কেমিকাল কর্পোরেশনগুলো কিন্তু আমেরিকায় শীর্ষ স্থানাধিকারী হচ্ছে তৈল ও মোটর কর্পোরেশনগুলো।

ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশে মনোপলিগুলোর এই বিরাট পুঞ্জীভবন সত্বেও বহু কোম্পানী সংযুক্ত মার্কিন সংস্থাগুলোর (conglomerates) সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারেনি। তাই পুনরায় সেই পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিধির শিকার হয়ে ইউরোপীয় মনোপলিগুলো আন্ত-ইউরোপীয় মিলনের পথে পা বাড়ায়। অর্থাৎ একটি দেশের মনোপলি ইউরোপের অপর দেশের মনোপলির সঙ্গে মিলিত হতে সুরু করে। কিন্তু মনোপলি-গুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সেই প্রচেষ্টা যথেষ্ট সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

তবে দুটি ফোটোগ্রাফিক কোম্পানীর মিলনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন : পশ্চিম জার্মানীর আগফা বেলজিয়ামের গেভার্টের সঙ্গে মিলিত হয়। দুটি ছোট

খাট বিমান তৈরীর কারখানাও মিলিত হয়ঃ জার্মান ভেরিনিগেট ফ্লাগটেকনিশে ওয়ার্কে (ভি. এফ. ডব্লিউ) এবং ওলন্দাজ ফকার। বৃটিশ ডানলপের সঙ্গে ইটালীর পিরেল্লি কোম্পানীরও মিলন ঘটে এবং সেটা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম টায়ার ও রবার কোম্পানীতে পরিণত হয়।

তেলের ক্ষেত্রে এ্যাঙ্গলো-ডাচ মিলনজাত শেল গোষ্ঠী যথেষ্ট পুরোনো সংস্থা। অনুরূপ দ্বিতীয় আন্ত-ইউরোপীয় মিলনজাত কোম্পানী ইউনিলিভার। আগেরটায় ওলন্দাজদের অংশ বৃটিশ অংশের চেয়ে বেশী। ইউনিলিভারের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের অংশ সমান সমান (৫০ ঃ ৫০)।

ইটালীর ফিয়াট কোম্পানী ফরাসী কোম্পানী সিট্রোনের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। বৃটিশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিঅর্গানাইজেশন কর্পোরেশন বল বিয়ারিং শিল্পে সুইডিশ এস-কে-এফ'র বৃহৎ অংশ আরও পরিবর্দ্ধনে সাহায্য করেছে।[৩]

একথা কারও অজানা নেই যে যতই পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে, ততই অর্থনৈতিক ক্ষমতা আরও কম কম সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। কিন্তু বিষয়টির উপর গবেষণারত বিশিষ্ট পণ্ডিতরা বলেন যে "বহু সংখ্যা-তাত্ত্বিক জটিলতা শিল্প কাঠামোর আসল চেহারা গোপন করে রাখে। সুতরাং এই পুঞ্জীভবনের সঠিক পরিধি নির্ণয় করা খুবই কঠিন।"[৪]

পুঞ্জীভবনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সীমানা অতিক্রমের প্রক্রিয়া সুরু হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোম্পানীকে, কোন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীকেই "আন্ত-র্জাতিক কোম্পানী" আখ্যা দেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-গুলোই নিজেদের "আন্তর্জাতিক কোম্পানী" বলে আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে এবং উদাহরণ হিসাবে ইউনিলিভার ও রয়েল ডাচ শেল গোষ্ঠীর নাম করে। কিন্তু এই দুটো সংস্থাকে বড় জোর বৃহদাকার দ্বি-দেশীয় অথবা দ্বি-জাতিক কর্পোরে-শন বলা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক কোম্পানী বলে কোন মতেই আখ্যা দেওয়া চলে না। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় কোম্পানী কিন্তু কাজ-কারবার করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর সকল অধঃস্তন সংস্থাই সাধারণ বিশ্বব্যাপী কর্মকৌশল ও সাধারণ বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর শৃঙ্খলার আওতায় কাজ করে। এবং সমগ্রভাবে কোম্পানীর মুনাফা অর্জন ও লক্ষ্য পূরণে কোন অধঃস্তন সংস্থার অবদান কত, তা সেই ভাবেই মূল্যায়িত হয়। প্রকৃত

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকেন্দ্র হচ্ছে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর পিতৃদেশে অবস্থিত সদর দপ্তর।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কোন স্থানীয় অধঃস্তন সংস্থা কখনও কখনও স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে এবং গভর্ণমেণ্টে আস্থাভাজন হবার জন্য সন্দেহজনক বাণিজ্যিক সম্ভাবনাযুক্ত কোন প্রকল্পে অংশও নিতে পারে। কিন্তু মূল কথাটা হচ্ছে এই যে পিতৃ কোম্পানীর প্রতি স্থানীয় অধঃস্তন সংস্থার আনুগত্য হল সবার উপরে এবং সেই দায়িত্বই তাকে সর্বাগ্রে পালন করতে হয়।

এখানকার একটি ছোট ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। দুই বছর আগে ইউনিলিভারের স্থানীয় অধঃস্তন সংস্থা হিন্দুস্থান লিভার কলকাতার কাছে হলদিয়ায় একটা কারখানা বানায়। সেই উপলক্ষে ইউনিলিভারের বর্তমান চেয়ারম্যান স্যার ডেভিড ওর নিজে হলদিয়ায় আসেন। ইউনিলিভার এবং হিন্দুস্থান লিভার বিশ্বের এই অংশে কৃৎকৌশল পরিবৃদ্ধির ব্যাপারে অনেক কিছু করেছে বলে তিনি বাগাড়ম্বর করেন। তবে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর লক্ষ্যটা খুবই সরল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউনিলিভারের বহু অধঃস্তন সংস্থা আছে। তারা দূর দূর দেশ থেকে অর্দ্ধ প্রক্রিয়াজাত কাঁচা মাল আমদানী করতে বাধ্য হয়। তাতে তাদের খরচ পড়ে যায় অনেক। এখন থেকে হলদিয়ার কারখানায় সেই কাঁচামাল তৈরী হবে এবং সস্তায় চালান যাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে ইউনিলিভারের অধঃস্তন সংস্থাগুলোর কাছে। অর্থাৎ আনা-নেওয়ার খরচটা অনেক কমে যাবে।

কানাডিয়ান আলকান এলুমিনিয়ামের কথাটাই ধরা যাক। এই কোম্পানী কার্যত আমেরিকার মেলন গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু আমেরিকার বাইরে আলকানের আকার সত্যিই খুব বৃহৎ। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী বহির্ভূত দেশ-গুলোর বাইরে পৃথিবীতে যত এলুমিনিয়াম তৈরী এবং বিক্রয় হয়, তার অর্দ্ধেকই তৈরী এবং বিক্রয় করে এই কোম্পানী। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম কোম্পানী উপরোক্ত মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কানাডায় অবস্থিত অধঃস্তন সংস্থারই একটি অবদান)।

এলুমিনিয়াম তৈরী হয় বকসাইট থেকে। আলকানের যে বকসাইটের খনিগুলো রয়েছে, তার বেশীর ভাগই ক্যারিবিয়ানে অবস্থিত। আগে এলুমিনা তৈরী ক'রে পরে তাই থেকে এলুমিনিয়ামের বাঁট বানানো হয়। তার জন্য

দরকার প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তির। তাই আলকান সেই কাজটা করে কানাডা এবং নরওয়েতে। উপরোক্ত দুই দেশে বিদ্যুৎশক্তি সস্তা। কারণ উভয় দেশেই বিরাট বিরাট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। এলুমিনিয়ামের বাটগুলো অতঃপর পাঠানো হয় বিভিন্ন দেশে অবস্থিত অধঃস্তন সংস্থাগুলোর কাছে। তারা ঐ বাটগুলো থেকে রান্নার হাঁড়ি কুড়ি, ইলেকট্রিকের তার, মোটরগাড়ীর বডি এবং গৃহনির্মাণের এবং গৃহসজ্জার সাজ সরঞ্জাম তৈরী করে। শতাধিক দেশে আলকানের বিক্রয়-অফিস, স্থানীয় প্রতিনিধি, এজেন্ট ইত্যাদি বিদ্যমান। পশ্চিম জার্মানীর নর্ফে আলকান একটি রোলিং মিল তৈরী করেছে। ইউরোপীয় মহাদেশের সর্বত্র এই কারখানা থেকে মাল সরবরাহ করা হয়। আলকান যখন কোথাও কোন নতুন কারখানা অথবা অফিস খোলে অথবা এজেন্ট নিয়োগ করে তখন যায়গাটা সে বেছে নেয় নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এবং যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা ক'রে। এক এক জন জেনারেল ম্যানেজার যতখানি এলাকায় কাজ চালাতে সক্ষম, ঠিক ততখানির ভারই তার উপর অর্পণ করা হয়। তার বেশী একটুও নয়। সদর দপ্তরে ছক করা হয় কোম্পানীর কার্যক্রমের পরিকল্পনার। তবে সেই পরিকল্পনা এমন ভাবে ছকা হয় যাতে আলকান যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেই আলকান তার কার্যক্রমে নতুন প্রকল্প জুড়তে অথবা ছাঁটাই করতে পারে। কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ছাড়াও সদর দপ্তর অধঃস্তন সংস্থায় ব্যবহার্য কাঁচামাল বণ্টন ও তার মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটাও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে। আলকান গোষ্ঠী যে এলুমিনা ও এলুমিনিয়ামের বাঁট তৈরী ক'রে বিভিন্ন দেশের অধঃস্তন সংস্থার কাছে পাঠায়, তার পুরোটাই সদর দপ্তর নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় মজুত ভান্ডারের মাধ্যমেই বিক্রয় করা হয়। এর সঙ্গে সামরিক ইউনিটের কর্মপদ্ধতি তুলনীয়। খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ ছাড়া যেমন মিলিটারী ইউনিটের কাজ চলে না, তেমনি আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর অধঃস্তন সংস্থার পক্ষে অর্থের যোগান ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। এই আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ভারটা পুরোপুরিই থাকে সদর দপ্তরের হাতে।[৫]

এই আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ভার যে কি সাংঘাতিকভাবে সদর দপ্তরের হাতে কেন্দ্রীভূত, মার্কিন মুলুকের আন্তর্দেশীয় কোম্পানী—ইণ্টারন্যাশানাল টেলি-ফোন ও টেলিগ্রাফই ( আই-টি-টি ) তার দৃষ্টান্ত। আই-টি-টি বহু কোম্পানী সংযুক্ত এক অতি বৃহৎ সংস্থা ( কনগ্লোমারেট )—পৃথিবীতে যার জুড়ি বেশী নেই। সারা দুনিয়া জুড়ে চলে এর কাজ-কারবার। টেলি যোগাযোগ

ব্যবস্থা, শেরাটন হোটেল, মোটর গাড়ী ইত্যাদির কারবারে এই কোম্পানী ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

এই কোম্পানী দাবী করে যে এদের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে সেরা। এমন বিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্ম ব্যবস্থা আর কারও নেই। সুতরাং সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকারী তিনটি বৃহত্তম আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর তালিকায় যে আই-টি-টির নাম রয়েছে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। অপর দুটিও মার্কিন মুলুকের দি জেনারেল মোটরস এবং এক্সন।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতা অতি মাত্রায় কেন্দ্রীভূত এবং পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে কার্যত পুঁজিবাদী দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্পর্কে অতি আধুনিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা খুব কঠিন। তবে যেটুকু যা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে বৃটেন ও আমেরিকার বৈদেশিক লেন-দেনের দায় শোধের ক্ষেত্রে এই আন্ত-র্দেশীয় কোম্পানীগুলোর আভ্যন্তরীণ লেন-দেন একটা চূড়ান্ত ভূমিকা নিয়ে নিয়েছে।

বৃটিশ বোর্ড অফ ট্রেডের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে ১৯৬৬ সালে বৃটেনের মোট রপ্তানির ২২ শতাংশ (টাকার অংশে) সম্পন্ন হয়েছিল পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর মধ্যে। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, বৃটেনে অবস্থিত বৃটিশ অথবা মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর শাখা সংস্থা তার ভিন্ন দেশস্থ অধঃস্তন সংস্থার কাছে পণ্য বিক্রয় করেছিল। যেমন ধরুন বৃটেনের ফোর্ড মাল বেচেছে বেলজিয়ান ফোর্ডের কাছে অথবা বৃটেনের ইম্পিরিয়াল কেমিকাল ইন্ডাষ্ট্রিজ মাল বেচেছে পশ্চিম জার্মানীর ইম্পিরিয়াল কেমিকাল ইন্ডাষ্ট্রিজের কাছে। বৃটেনে অবস্থিত মার্কিন নিয়ন্ত্রিত আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর ভিন্ন দেশীয় বাণিজ্যিক অংশীদার হচ্ছে তাদের ভগিনী সংস্থাগুলো। ক্রিস্টোফার টুগেন্ডহাট দেখিয়েছেন যে "১৯৬৬ সালে তাদের মোট রপ্তানির ৫৬ শতাংশই পাঠানো হয়েছিল তাদের অধঃস্তন সংস্থার কাছে। বিদেশী মালিকানাধীন অন্যান্য কোম্পানীগুলো তাদের মোট রপ্তানির ৩৫ শতাংশ পাঠিয়েছিল তাদের অধঃস্তন সংস্থার কাছে এবং বৃটিশ মালিকানাধীন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলো তাদের মোট রপ্তানির ২৭ শতাংশ পাঠিয়েছিল তাদের ভিনদেশস্থ অধঃস্তন কোম্পানীগুলোর কাছে।"

১৯৬৪ সালে মার্কিন-মুলুকের আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো তাদের

ভিনদেশস্থ অধঃস্তন সংস্থার কাছে যে পণ্য বিক্রয় করেছিল তা আমেরিকার মোট রপ্তানির ২৫ শতাংশ। ১৯৬৫ সালে আমেরিকার ৩২০টি কোম্পানী ৮৫০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। তার অর্ধেকই বিক্রীত হয়েছিল উপরোক্ত কোম্পানীগুলোর ভিনদেশী অধঃস্তন সংস্থার মাধ্যমে। অধ্যাপক জ্যাক এন বেহরম্যান (আমেরিকা) হিসাব করে দেখিয়েছেন যে এক বছরে বেলজিয়ামের ফোর্ড সংস্থাগুলোর সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর ফোর্ড সংস্থাগুলো যে পণ্য বিনিময় করছিল, তা বেলজিয়ামের সে বছরের মোট আমদানী রপ্তানীর এক ষষ্ঠমাংশ।

কোন একটি দেশের পক্ষে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর উপর এই নির্ভরশীলতা অতি বিপজ্জনক আকার ধারণ করতে পারে। সাধারণত আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-গুলো তাদের নখ এবং দাঁত দেখাবার ব্যাপারে খুব সতর্ক। কিন্তু দরকার পড়লে মুখোস খুলে নিজের অতি হিংস্র স্বরূপ প্রকাশ করতে তার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। খাস বৃটেনেই এমনটা ঘটেছিল। কিছুকাল আগে বৃটেনের সেইনস্‌বারি কমিটি দেশের ঔষধ শিল্প ঢেলে সাজাবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কাজে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন রেকশল ড্রাগ এন্ড কোম্পানীর চেয়ারম্যান জাষ্টিন ডার্ট চোখ রাঙিয়ে গর্জে ওঠেন।

তিনি বলেন, "বৃটিশ ঔষধ শিল্পের দুই তৃতীয়াংশের নিয়ন্ত্রণ-ভার আমেরিকানদের হাতে কেন্দ্রীভূত। বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে যে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড উদ্বৃত্ত হয়েছে, তার ৫ কোটি পাউন্ডই এনে দিয়েছে মার্কিন কোম্পানীগুলো। তারা আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া অথবা খোদ ইউরোপ থেকেই (বৃটেন ছাড়া) এই পণ্য রপ্তানি করতে পারত…। যদি দেখা যায় যে, মার্কিন মুলুকের কোম্পানীগুলোর রপ্তানি বিকাশের পক্ষে বৃটেনের আবহাওয়া অনুকূল নয় তাহলে, তারা সেই কারবারের অন্ততঃ একটা অংশ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে।"

এই হল আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর আসল চেহারা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চিরাচরিত তত্ত্ব (অর্থনীতিবিদ্যায় যা শেখানো হয়) আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর ক্রিয়া কলাপের কাছে নিছক কাগুজে তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর উৎপাদনের কলকারখানা এবং বাজার সারা দুনিয়ায় ছড়ানো। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী একই সঙ্গে ক্রেতাও বটে বিক্রেতাও বটে। বিশ্বের নানা দেশে ছড়ানো কলকারখানাগুলো (আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর)

পরস্পরের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। যে কোন পণ্য এমন ভাবে তৈরী হয় যে মনে হয় যেন একই কারখানার দুটি বিভাগ সেটা তৈরী করেছে। কিন্তু কার্যত সেই কারখানা দুটি হয়ত দুই ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থিত এবং তাদের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান বিদ্যমান।

ক্রিস্টোফার টুগেণ্ডহাট বলেছেন, "এদের ব্যবসা বাণিজ্য অবাধ এবং নির্ব্যক্তিক প্রতিযোগিতা অথবা দরকষাকষির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। হয় ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। কোথায় কারখানা বসবে এবং অধঃস্তন সংস্থাগুলোর কর্তব্য কি, তা ব্যবস্থাপকরাই স্থির করে।"

আমেরিকার আই-বি এম'র কথাই ধরা যাক। আই-বি-এম আমেরিকার বাইরে কোথাও পুরো কম্পিউটর তৈরী করে না। মোট ৩৬০টি যন্ত্রাংশ জুড়ে পুরো কম্পিউটর তৈরী হয়। এই যন্ত্রাংশগুলো তৈরীর জন্য বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালী ও অন্যান্য দেশে আই-বি-এম'র কারখানা রয়েছে। প্রত্যেকটি ভিন দেশী কোম্পানীই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম তৈরী করে। সেগুলো সব এক যায়গায় এনে জুড়ে জুড়ে পুরো কম্পিউটর বানানো হয়।

ট্রাকটরও তৈরী হয় এই ভাবে: ফোর্ড ট্রাকটরের হাইড্রলিক্স্ এবং ইঞ্জিন তৈরী হয় বৃটেনে (বাসিলডন) এবং বেলজিয়ামে আর সমগ্র স্পীড গীয়ার ব্যবস্থাটা তৈরী হয় আমেরিকায় (ডেট্রয়েটে)। মার্কিন ইন্টারন্যাশানাল হার্ভেষ্টার কিছুকাল আগে বার্ষিক রিপোর্টে ঘোষণা ক'রেছিল যে তাদের পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সস্থিত অধঃস্তন সংস্থাগুলো একযোগে নতুন লাইনের ট্রাকটর উৎপাদন করছে। পশ্চিম জার্মান সংস্থার উপর ভার পড়েছে ডিজেল ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ সম্পন্ন করার আর ফরাসী সংস্থার উপর ভার দেওয়া হয়েছে ট্রান্সমিশন ও ফাইনাল ড্রাই এসেম্বলী তৈরী করার। কানাডার ম্যাসি-ফার্গুসন কানাডায় বিক্রয়ের জন্য আমেরিকায় ট্রাকটর বানাতে পারে। তাতে থাকবে বৃটিশ ইঞ্জিন, ফরাসী ট্রান্সমিশন এবং মেক্সিকান এক্সেল।

ফোর্ড এস্কর্ট (Escort) নামে একটা ছোট মোটর গাড়ী বানায়। এর প্রথম আবির্ভাব বৃটেনে। বৃটেন থেকে যন্ত্রাংশ এনে বেলজিয়ামের কারখানায় জোড়া লাগিয়ে এই গাড়ী বিক্রয় করা হয় পশ্চিম জার্মানীতে। জাতীয় পরিচয় নির্দেশের জন্য কখনও কখনও গাড়ী এবং ইঞ্জিনের কিছু অদল বদল হতে পারে, তবে অন্যান্য যন্ত্রাংশ হুবহু একই হয়।

উত্তর আমেরিকার বাজারের জন্য ফোর্ড "পিন্টো" নামে একটা গাড়ী তৈরী

করে। সেটা তৈরী হয় নিউ জার্সি ও মিশৌরী ( আমেরিকা ) এবং কানাডার ওন্টারিয়োয় কিন্তু এর অধিকাংশ ইঞ্জিন এবং ট্রান্সমিশন আসে বৃটেন থেকে। উপরোক্ত দেশগুলোর কোথাও ধর্মঘট-জাতীয় কোন অঘটন ঘটলে ফোর্ড যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্য পশ্চিম জার্মানীর কারখানা ব্যবহার করতে পারে। আসল উদ্দেশ্য হল ক্ষমতা মজুত রাখা।

শুধু ফোর্ড কেন, সমস্ত আন্তর্দেশীয় কোম্পানী সব সময়ই প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ তৈরীর বিকল্প ব্যবস্থা মজুত রাখে। নিরাপত্তারও দ্বিতীয় লাইন হচ্ছে কম্পুউটরের সাহায্যে মজুতপণ্য নিয়ন্ত্রণ। তাতে সম্ভাব্য বাধা বিঘ্ন অনেক হ্রাস করা যায়। তৃতীয় লাইন হচ্ছে উৎপাদনে নমনীয়তা যাতে অতি অল্পসময়ের মধ্যে এক মডেলের পরিবর্তে আর এক মডেল চালু করা যায়।

ওলন্দাজ আন্তর্দেশীয় কোম্পানী ফিলিপস্ ফ্ল্যাট আয়রণ এবং মিকসার বানায় হল্যান্ডে, ইলেকট্রিক পাখা ও হীটার বানায় স্কটল্যান্ডে, আর ক্যাসেট টেপ রেকর্ডার বানায় অস্ট্রিয়ায়। রেফ্রিজারেটর প্রধানত বানায় ইটালীতে।

অনুরূপভাবে অলিভেত্তি তার পোর্টেব্‌ল টাইপ-রাইটার বানায় স্পেনে। এদের কায়িক শ্রমে পরিচালিত মেসিনগুলো তৈরী হয় স্কটল্যান্ডে। ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার তৈরী হয় ইটালী ও মেক্সিকোয় এবং যোগ-বিয়োগের মেসিন হয় ইটালী ও আর্জেন্টিনায়।

কোথায় মাল তৈরী হবে, সেটা যেমন স্থির করে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর সদর দপ্তর, তেমনি মাল কোথায় বিক্রী হবে, তাও তারাই স্থির করে দেয়। অধঃস্তন কোম্পানীগুলো নিজেদের ইচ্ছামত ভিন দেশে মাল রপ্তানি করার অধিকারী নয়। জেনারেল মোটর তার বৃটিশ অধঃস্তন সংস্থায় তৈরী ভক্সল মোটরগাড়ী বিক্রয় করে কানাডায়, আর আমেরিকায় বিক্রয় করে বেলজিয়ামের অধঃস্তন সংস্থায় তৈরী ওপেল গাড়ী। এই গাড়ী কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতেও তৈরী হয়। ফোর্ড পশ্চিম জার্মানীর টনুসের বদলে বৃটিশ কর্টিনা আমেরিকায় আমদানী করত। তারপর যখন সে পিন্টো তৈরী করতে লাগল, তখন কর্টিনা বিক্রী বন্ধজনিত ক্ষতি পূরণের জন্য পিন্টোর ইঞ্জিন তৈরীর ভার দেওয়া হল ফোর্ডের বৃটিশ অধঃস্তন সংস্থার উপর।

আগেই বলেছি, আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র হচ্ছে বৃটেন। বৃটেন থেকে কলকারখানা জাত যে পণ্য রপ্তানি হয়, তার ৪০ শতাংশই আসে মার্কিন-নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে। আরও ১০ শতাংশ আসে বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে। অন্যান্য দেশও

তাদের স্ব-স্ব-দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য বিদেশী নিয়ন্ত্রিত কোম্পানীগুলোর উপর এর চেয়ে বেশী নির্ভরশীল। কার্যত বিশ্ব বাণিজ্যের এক বিরাট অংশই নিয়ন্ত্রণ করে আন্তর্দেশীয় কোম্পানী ও তাদের অধঃস্তন সংস্থাগুলো।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর কার্যপদ্ধতি কি রকম, তা বুঝতে হলে ইণ্টারন্যাশানাল বিজনেস মেসিনের কাজকারবার দেখলেই বোঝা যাবে। আমেরিকায় বিভিন্ন ধরনের সাধারণ কাজের জন্য ডিজিটাল কম্পিউটর বিক্রী হয়। তার ৭০ শতাংশ আসে আই-বি-এম'র কারখানা থেকে। বর্তমান পশ্চিম ইউরোপে যত কম্পিউটর চালু আছে, তার অর্ধেকই তৈরী করেছে আই-বি-এম'র গবেষণাগার। এই গবেষণাগার আমেরিকায় আছে ১৯টি অথচ ইউরোপে মাত্র ৮টি। কিন্তু আই-বি-এম'র সব কিছু এবং সকল অধঃস্তন সংস্থা আগাগোড়া মার্কিন মুলুকস্থিত সদর দপ্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। আমেরিকার বাইরে অবস্থিত আই-বি-এম গবেষণাগারের কার্যসূচী মার্কিন সদর দপ্তরের কার্যসূচীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। কোন গবেষণাগারই গবেষণার পুরো কাজটা সম্পন্ন করার ভার পায় না। প্রত্যেকেই আংশিক গবেষণার ভারপ্রাপ্ত। সদর দপ্তরের কাজ হচ্ছে এই আংশিক গবেষণালব্ধ ফলাফল একত্রিত করে গবেষণা সম্পূর্ণ করা। ভিন্ন দেশে আই-বি-এম'র কোন অধঃস্তন সংস্থা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়, তাতে আই-বি-এম'র কিছু আসে যায় না। কম্পিউটারের এক এক ধরনের যন্ত্রাংশ এক এক দেশে তৈরী করা হয়। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ত অধঃস্তন সংস্থার কাজ-কারবার বন্ধ করে অন্যত্র সেই যন্ত্রাংশগুলো অনায়াসেই বানিয়ে নিতে পারে আই-বি-এম। অর্থাৎ আই-বি-এম অপর কোন দেশের উপর কোনক্রমেই নির্ভরশীল নয়। অন্য দেশে স্থাপিত গবেষণাগারের স্থানীয় কর্মীদের উপরও নয়।

সূক্ষ্ম কারিগরী গবেষণার ব্যাপারটা চিরকালই একেবারে গোপন রাখা হয়। ভিন্ন দেশে অবস্থিত গবেষণাগারগুলো সে সম্বন্ধে কিছুই জানতে পায় না। মার্কিন মুলুকে অবস্থিত সদর দপ্তর কিন্তু কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা সবই জানে। ভিন দেশে অবস্থিত আই-বি-এম গবেষণাগারে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে, তা সেই দেশের গভর্ণমেন্টও জানতে পায় না। জানতে পায় শুধু আমেরিকা। তাহলেই বুঝুন, যে সব দেশে আই-বি-এম কাজ-কারবার করে, সেই সব দেশে উপরোক্ত ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য কি গভীর!

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যে সব দেশে কাজ কারবার করে সেখানকার গভর্ণমেণ্টগুলো আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর অর্থ হস্তান্তরের বেলায় প্রায়ই জর্জরিত হয়। **ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে** ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর (E.E.C)

শিল্প বিভাগের প্রাক্তন কমিশনার প্রিন্স গ্রুইডো কোলোন্না ডি পালিয়ানো হিসাব কষে দেখিয়েছিলেন ( ১৯৭০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ) যে দেশে বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত মার্কিন কোম্পানী এবং ব্যাংকের হাতে মজুত নগদ অর্থের পরিমাণ ৩০০০ থেকে সাড়ে ৩ হাজার কোটি ডলার। "এই অর্থ দৈত্যাকার তরঙ্গের মত এক দেশ থেকে আর এক দেশে প্রবাহিত হয়।" এই দৈত্যাকার তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টগুলোর নেই। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-গুলোর মধ্যে এই দৈত্যাকার অর্থ-তরঙ্গের আনাগোনা সুরু হলে যে কোন দেশই বিপদের সম্মুখীন হতে পারে, এমন কি তার জাতীয় নীতিও বানচাল হতে পারে। এই অর্থ-তরঙ্গ সব সময়ই নিয়ন্ত্রিত হয় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সদর দপ্তর থেকে। আর সদর দপ্তর সারা দুনিয়া জুড়ে তার নিজস্ব স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট। সেখানে নির্দিষ্ট দেশের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই।

একটি আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিষ্টোফার টুগেণ্ডহাটকে বলেছিলেন, "জেনে শুনে কোথাও আইন ভংগ করা আমাদের রীতি নয়। আমরা একদল লোক পুষি, যারা আইনটা আমাদের বুঝিয়ে দেয় এবং অপর একদল লোক পুষি যারা আমাদের আইনের ফাঁকটা দেখিয়ে দেয়!" আর একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেছেন, "গভর্ণমেণ্টের কাজ আইন তৈরী করা এবং আমাদের কাজ হচ্ছে আইনের ফাঁক খুঁজে বার করা।"

কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেণ্ট আইনের ফাঁকটা বুজিয়ে দেয়। পর মুহূর্তেই দেখা যায় আর একটা ফাঁক বেরিয়ে পড়েছে।

যখন কোন দেশের মুদ্রার উপর খুব চাপ পড়ে, তখন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো সেই দেশে দায় পরিশোধ স্থগিত রাখে, এমন কি নিজেদের অধঃস্তন কোম্পানীতে অর্থ প্রেরণ বন্ধ করে দেয়। আর সেই দেশ থেকে তাড়াহুড়ো করে প্রচুর অর্থ অন্যত্র চালান করে দেয়। এইভাবে বৃটেনে কারবার করা বহু মার্কিন কোম্পানী পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের সময় প্রচুর ফালতু অর্থ কামিয়ে নেয়।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো নানা অপকৌশল অবলম্বন ক'রে কিভাবে ফাঁকতালে টাকা কামায় তার এক বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে **ফরচুন** পত্রিকায়। মার্কিন ইউ-এম-এস কর্পোরেশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট জন ওয়েবের উক্তি হিসাবে সেই বিবরণী ছাপা হয়েছিল। জন ওয়েব বলেন, "আমাদের এক ডেনিস অধঃস্তন সংস্থার হাতে কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ জমে যায়।

মোটা অর্থ তারা ঋণ দেয় আমাদের আর এক ডেনিশ অধঃস্তন সংস্থার কাছে। শেষোক্ত অধঃস্তন সংস্থা মালপত্র আমদানী করত আমাদের সুইডিশ অধঃস্তন সংস্থার কাছ থেকে। ডেনিশ কোম্পানী সুইডিশ কোম্পানীর পাওনা অগ্রিম মিটিয়ে দেয়। সেই অর্থের সাহায্যে সুইডিশ পণ্য ফিনল্যাণ্ডের অধঃস্তন সংস্থায় রপ্তানি করা হয়। এর লাভটা কি হল শুনবেন? ফিনল্যাণ্ডকে ঐ মাল আমদানী করতে হলে ১৫ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে হত, কারণ ফিনল্যাণ্ডে তখন ওর চেয়ে কম সুদে ঋণ পাওয়া যেত না। সুইডিশ অধঃস্তন সংস্থাকে এই বিক্রয়ের অর্থ যোগান দিতে হত, তাহলে তাকে ৯ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে হত। কিন্তু ডেনমার্কে ঋণের সুদ ছিল মাত্র ৫.৬ শতাংশ, উপরন্তু ডেনিশ মুদ্রা ছিল খুবই কম-জোর ( সুইডিশ মুদ্রার তুলনায় )। আমরা তাড়াতাড়ি সুইডেনকে পাওনা মিটিয়ে দিয়ে অল্প সুদে ঋণ তো পেলামই, ডেনিশ কোনারেও (মুদ্রা) আমাদের কোন ঝুঁকি রইল না।"

আর এক ধরনের জোচ্চুরি হচ্ছে এই রকম ঃ কোপেনহ্যাগেন মুক্ত বন্দর। কোন বৃটিশ অথবা অন্য দেশীয় কোম্পানী তার ডেনিশ অধঃস্তন সংস্থার কাছে মাল পাঠানো এবং তার ইনভয়েস তৈরী করল স্বাভাবিক ভাবে। সেই মাল ডেনমার্কে পেঁছোবার আগেই অন্য ইনভয়েসে উচ্চতর মূল্যে অন্য দেশে চলে যেতে পারে। পণ্যের বাড়তি দামটা পাবে ডেনিশ অধঃস্তন সংস্থা। অবশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে লাভের পুরোটাই চলে যাবে পিতৃ কোম্পানীতে।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো সব সময়ই এমন একটা ভাব দেখায়, যেন তারা দেশের ( অর্থাৎ যে দেশে কারবার করে ) সৎ নাগরিক। গভর্ণমেণ্টের মনে তারা এই বিশ্বাস জন্মাতে চায় যে তারা আইন মেনে চলে এবং ট্যাক্স দেয়। কিন্তু আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর অলিখিত বিধি হচ্ছে, যতদূর সম্ভব ট্যাক্স ফাঁকি দাও। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর নির্বাহীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করার সময় বলেন, "কত টাকা ট্যাক্স দেব, না দেব, তা আমরাই স্থির করি, গভর্ণমেণ্ট নয়।"

বাজারের অবস্থা আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর তহবিল হস্তান্তরকে প্রভাবিত করে। হস্তান্তরের জন্য অধঃস্তন কোম্পানীর কাছ থেকে কি মাত্রায় মূল্য আদায় করা হবে, তাও বাজারের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আন্ত-র্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মধ্যে গলা-কাটা প্রতিযোগিতার সংগে এর একটা সম্পর্ক আছে। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী গঠন পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায় না। বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা দামের লড়াইয়ের রূপ পরিগ্রহ করে।

কোন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কোন অধঃস্তন সংস্থা যদি এমন এক তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, যেখানে পণ্যের দাম না কমালে টিঁকে থাকা মুস্কিল, তাহলে সদর দপ্তর বিভিন্ন দেশে ঐ পণ্যের দাম বাড়িয়ে কমিয়ে প্রতি-যোগিতার সম্মুখীন অধঃস্তন সংস্থাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর যদি কোন আন্তর্দেশীয় কোম্পানী কোন একটি দেশের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করতে চায়, তাহলে তথাকার অধঃস্তন সংস্থাকে পণ্যমূল্যে ভর্তুকি দিয়ে দরের লড়াইয়ে জিতিয়ে দিতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীকে বাজার থেকে হটিয়ে দেবার জন্য অথবা তার মুনাফার হার নামিয়ে দেবার জন্য ( যাতে অন্যত্র সে তার কারবার সম্প্রসারণ না করতে পারে ) উপরোক্ত ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৬]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বৃহদাকার কোম্পানীর সাফল্য অথবা ব্যর্থতার মূলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ নীতি। মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন নিয়ে কোন কোম্পানীর ব্যবস্থাপকরা বাইরের লোকের সঙ্গে কখনও আলোচনা করেন না। এটা তাদের একটা পবিত্র মন্ত্রগুপ্তি।

আমেরিকার ডাঃ জেমস শুলম্যান ৮টি মার্কিন কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপ গবেষণা করে বহু তথ্য উদ্ঘাটন করেন।[৭]

উপরোক্ত ৮টি কোম্পানীই নিজেদের মধ্যে সংবন্ধ প্রতিষ্ঠান। দেশ বিদেশে এদের কলকারখানা চলে পরস্পরের সহযোগিতায়। তাদের বিভিন্ন অধঃস্তন সংস্থার মধ্যে তৈরী জিনিষের আদান-প্রদান তেমন একটা হয় না। আদান-প্রদান হয় প্রধানত কাঁচামালের এবং আধা তৈরী পণ্যের। আমেরিকা থেকে মাল যায় তার ভিন দেশস্থ অধঃস্তন সংস্থায় এবং এক অধঃস্তন সংস্থার মাল অপর অধঃস্তন সংস্থায়, কিন্তু কোন অধঃস্তন সংস্থার মালই আমেরিকায় যায় না। মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে অধঃস্তন সংস্থাগুলো পুরোপুরি সদর দপ্তরের উপর নির্ভরশীল। খুচরো ও পাইকারী দর এবং অধঃস্তন সংস্থাগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ লেন-দেনের দর—সবই স্থির করে দেয় সদর দপ্তর।

প্রধানত একই পণ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় হয়। নির্দিষ্ট আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর নিজস্ব উৎস ছাড়া অন্য কোথাও মাল কেনার অধিকার অধঃস্তন কোম্পানীর নেই।

কোম্পানীগুলোর অবিচল নীতি হল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া। তাদের একজন অফিসার ডঃ শুলম্যানকে বলেন, "বিশ্বের যে কোন স্থানেই প্রয়োজনাতিরিক্ত ট্যাক্স দেওয়া আমরা অপচয় বলে মনে করি।"

## সূত্র ও উল্লেখপঞ্জী


১ ক্রিস্টোফার টুগেন্ডহাট : **দ্য মাল্‌টিন্যাশনালস্‌** ।

২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ দেখুন ।

৩ পূর্বোক্ত গ্রন্থ ।

৪ গ্রাহাম বান্নুক : **দ্য জাগারন্যাটস্‌** ।

৫ ক্রিস্টোফার টুগেণ্ডহাট : **দ্য মালটিন্যাশানালস্‌** ।

৬ পূর্বোক্ত গ্রন্থ ।

৭ পূর্বোক্ত গ্রন্থ ।

পঞ্চম অধ্যায়

## হান্স অ্যাণ্ডারসনের গল্পের মতো

কিছুদিন আগে আই-সি-আই-এর প্রাক্তন ডেপুটি চেয়ারম্যান, লর্ড বীচিং ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে উক্তি করেছেন, "প্রথমটির ক্ষেত্রে একটি একক ও স্পষ্ট প্রাথমিক লক্ষ্য রয়েছে সেটি হলো, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন—ম্যানেজমেণ্টের দ্বারা যতটা অর্জন করা সম্ভব। অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের লক্ষ্য অসংখ্য, যার একটি হল লাভযোগ্যতা। অন্যগুলোর চরিত্র নানা ধরনের, প্রায়শ অস্পষ্ট, কখনও বা অসংগতিপূর্ণ।"

এই মৌল ভিত্তির উপরেই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলির কাজকর্ম নির্ভরশীল। এই লক্ষ্য পূরণে তারা কেবল যে শ্রমিক ও কর্মচারীদের সর্বোচ্চ-মাত্রায় শোষণ করছে তা নয়, ক্রেতাদেরও ডাহা ঠকানোর রাস্তা নিচ্ছে। এই কারণেই পরিকল্পনার অর্থনীতিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ জন জিউকস বলেছেন, "ক্রেতাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল। পরিবর্তনটা যদি খুব দ্রুত না হয়, তাহলে ক্রেতার প্রায় অগোচরেই জীবনযাত্রার মান নামিয়ে আনা যায়।"

গ্রাহাম ব্যান্নক তাঁর "দ্য জাগারন্যাটস্" গ্রন্থে বলেছেন, "শিল্পায়ত দৈত্যদের অপ্রয়োজনীয় আকারের ফলে" কর্মচারী এবং ভোক্তাদের স্বার্থ বিনষ্ট হয়েছে। কাজেই কেন্দ্রীভূত শিল্পগুলোতে দর যে সচরাচর পড়ে না, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত বড় বড় কর্পোরেশনগুলো দর নিয়ে প্রতিযোগিতা করে; দর নিয়ে আবার প্রতিযোগিতা হয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা ছোট ছোট কোম্পানিগুলোকে ব্যবসাক্ষেত্র থেকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে। গ্রাহাম ব্যান্নক বলেছেন, "দর নিয়ে আই-বি-এম-এর প্রতিযোগিতা করার দরকার নেই, কিন্তু বোয়িং এখনও করে।" স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে উপনীত হবার পর, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর উৎপাদিত সামগ্রী ক্রমেই একে অপরের সঙ্গে মিলে যেতে থাকে কিন্তু ভোক্তারা এই ভুল বিশ্বাস নিয়েই থাকে যে তাদের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। সত্যিকার পার্থক্যটা রয়েছে বাজারে জিনিস চালু করার পদ্ধতিতে। সিগারেট, ডিটারজেণ্ট,

পেট্রোল, স্টেনলেস্ স্টীলের ব্লেড অথবা এমনকি বেশির ভাগ মোটর গাড়ির দামই যে কেবল এক ধরা হয় তা নয়, তারা দেখতেও একরকম এবং বলতে গেলে অভিন্ন।

এই অবস্থায় পৌঁছে গেলে আর নতুন কিছু প্রবর্তন করার উৎসাহ বজায় থাকে না। কেবল প্রবর্তন করাই নয়, একবার কেন্দ্রীভূত হয়ে গেলে এবং আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন বিপুল আকার ধারণ করলে কোনো কিছুর উদ্ভাবনও হয় না। বলা হতো জেনারেল ইলেকট্রিক এবং ওয়েস্টিংহাউস—দুটিই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন—বিদ্যুৎচালিত মোটর গাড়ি উদ্ভাবন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা যে কয়েকটি প্রোটোটাইপ তৈরি করেছিল এ-তথ্যও সুপারিজ্ঞাত। বৈদ্যুতিক মোটরের জন্য কোনো গিয়ারবক্স লাগে না, যান-এর যে-কোনো জায়গায় এমন কি চাকাতেও বসানো যায়; এর কোনো শব্দ নেই, নিরাপদ এবং বাতাস দূষিত করে না। সমস্যা কেবল ব্যাটারি নিয়ে। চাই খুব বড় আকারের এবং দামী ব্যাটারি। তবে জেনারেল ইলেকট্রিক অথবা ওয়েস্টিংহাউস কারো পক্ষেই এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা কঠিন নয়। কিন্তু কিছুই করা হলো না; কারণ মোটর শিল্পে সবচেয়ে বড় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন জেনারেল মোটরস্ তা বরদাস্ত করবে না, আর জেনারেল ইলেকট্রিক বা ওয়েস্টিংহাউস কেউই জেনারেল মোটরস্‌কে চটাতে চায় না। তাদের ভয় চটিয়ে দিলে পাছে জেনারেল মোটরস্ ওই দুই রাঘববোয়াল একচেটিয়া বিদ্যুৎকারবারীর মৌরসীপাট্টায় নাক গলিয়ে বসে!

জেনারেল মোটরস্-এর কারখানায় তৈরি হয় শেভ্রোলে, পন্টিয়াক, বুইক, ওল্ড্‌স্‌মোবিল, ক্যাডিলাক, ওপেল, ভক্সল, হলডেন প্রভৃতি মোটর গাড়ি। এর দুনিয়াজোড়া খ্যাতির পিছনে কিন্তু কোনো উদ্ভাবন নেই। সেই ১৯২০-র দশক থেকেই মোটরগাড়ী উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে এমন কোনো নতুন প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবই বলতে গেলে ঘটতে দেওয়া হয়নি।[১] জেনারেল মোটরস্, ফোর্ড এবং অন্যান্য সকলেই তাদের তৈরি মোটর গাড়ি বাজারে চালাবার কায়দা-কানুনের সাহায্যে বিপুল মুনাফা লুটছে। আর আছে ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপন, কালে কালে যা ক্রেতার মনোভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সাধারণ ক্রেতা অবশ্য শিল্পে উদ্ভাবন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। সে চায় নানা জিনিসের মধ্য থেকে বেছে নেবার সুযোগ, চায় নিরাপত্তা এবং অবিরত যোগান। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের বাড়বৃদ্ধির ফলে সে যা চায় তা পায় না। কর্পোরেশনগুলো যত বেশি পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কারখানার

সংখ্যাও তত কমে যাচ্ছে, এর ফলে মনোমতো পছন্দের সুযোগও কমে যাচ্ছে। ক্রেতার বৈচিত্র্যের বাসনা মেটানো হচ্ছে মোড়কের বাড়তি খরচ এবং বিজ্ঞাপনে, যা একই জিনিসকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হাজির করছে। এসব ক্ষেত্রে বাস্তবের চেয়ে মায়াই বেশি সক্রিয়।

কেবল বৈচিত্র্য নয়, উৎপাদিত সামগ্রীর মান-এর উৎকর্ষ বিধানের পথেও অন্তরায় সৃষ্টি করে রয়েছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের আধিপত্য। ভালোমতো একবার গুছিয়ে বসতে পারলে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন উৎকর্ষ নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না। রয়্যাল ডাচ শেল-এর একদা চেয়ারম্যান প্রোফেসর ম্যাকফাদজীন বলেছিলেন, "যদি আমাদের জেনারেল ম্যানেজারদের মধ্যে কেউ এমন একটি আগাম কর্মসূচী পেশ করতেন যার ভিত্তি সর্বোচ্চ লাভযোগ্যতা অর্জনের চেয়ে কিছু কম লক্ষ্যমাত্রিক......তাহলে তাঁর চাকরি যেত।"

আরো আছে, "কিন্তু যার উপরে আমরা সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতাম এবং সম্ভবত যার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল সবচেয়ে বেশি, তা হলো, আমাদের উৎপাদন মূল্যের উপর কোনো বিশেষ বিনিয়োগ-সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া। প্রতিযোগীদের সংগে দামের আপেক্ষিক উন্নতি ঘটানোয় অবিচল প্রচেষ্টা, একমাত্র নয়, পরন্তু সুনিশ্চিতভাবে সর্বোচ্চ লাভযোগ্যতা অর্জনের মুখ্য পথ......দামের বিচারটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো 'ভ্যালু ইনজিনিয়ারিং'-এর নীতি অনুসরণ করে থাকে। এর অর্থ উৎপাদিত সামগ্রী থেকে উৎপাদন খরচ ছাঁটাই করা। অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে এটা করা হয়ে থাকে। কাজেই পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎকর্ষ বিধানের প্রশ্ন বিবেচিত হলেও হতে পারে।

ষাটের দশক থেকে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করা থেকে তাদের মনোযোগ সরিয়ে এনেছে বন্টন এবং বিক্রয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে। এই কাজের নাম দেওয়া হয়েছে 'মার্কেটিং'। নতুন এই 'মার্কেটিং' কলাকৌশলের বিকাশসাধনে অনেক বাঘা বাঘা মাথা কাজ করছে। প্রচুর অর্থও এই বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু এর পুরোটাই অপব্যয় এবং অপ্রয়োজনীয়,—ক্রেতার স্বার্থের দিক থেকেও বটে আবার উৎপাদনের কলাকৌশলের বিকাশের স্বার্থের দিক থেকেও বটে।[২]

"মার্কেটিং ইন এ কমপিটিটিভ ইকনমি" গ্রন্থে এল. ডবলু. বজার লিখে-

ছেন, "মার্কেটিং হলো ব্যবস্থাপক-ক্রিয়াকলাপ (management function) যার কাজ সেই সব ব্যবসায়িক কাজকর্ম সংগঠিত এবং পরিচালিত করা, যে সব কাজের মধ্যে রয়েছে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার মূল্যায়ন করা এবং (ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতাকে) বিশেষ কোনো সামগ্রী অথবা সেবার (service) প্রতি কার্যকর চাহিদায় পরিবর্তিত করা এবং শেষ পর্যন্ত যিনি কিনবেন বা ব্যবহার করবেন তার দিকে সামগ্রী অথবা সেবা চালিত করা যাতে কোম্পানী নির্ধারিত মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা অথবা অন্যান্য অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।"

কাজেই কিছু একটা বিক্রী করা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের মঙ্গলের জন্য, ক্রেতার মঙ্গলের জন্য নয়। ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতাকে কর্পোরেশনের মঙ্গলে নিয়োজিত করাই 'মার্কেটিং' এর কাজ হয়ে উঠেছে। থম্পসন অর্গেনাইজেশনের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেকটর হ্যারি হেনরি এ-কথাই ব্যক্ত করেছেন যখন তিনি বলেন, "কোনো একটি কোম্পানী ব্যবসা করছে সে কথাটা একমাত্র এ-ভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে যে সে তার মিলিত লক্ষ্য কিভাবে পূরণ করছে", যার অর্থ মুনাফা। গ্রাহাম বান্নকের মতে, মার্কেটিং-এর কাজ হলো "ক্রেতা নিয়ন্ত্রণ"। কাজেই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো আজ প্রযুক্তিবিদ্যাগত এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না।

পণ্য কৃত্য নিয়েও তাদের কোনো উদ্বেগ নেই, তাদের আধুনিক পদ্ধতি বাজার নিয়ে গবেষণা, নতুন নতুন ক্রেতা ঠিক করা এবং অভিনব মোড়ক তৈরি করার কাজে পুরোপুরি নিয়োজিত। এইভাবে আজ সব সংস্থাই বাজার-কেন্দ্রিক। উৎপাদন-কেন্দ্রিকতা বলে আর কিছু নেই।

মার্কেটিং পদ্ধতির স্পষ্ট চারটি দিক আছে ঃ (ক) বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় প্রসার, (খ) গণ সংযোগ, (গ) বিক্রয় ও বণ্টন এবং (ঘ) উৎপাদিত সামগ্রীর পরিকল্পনা। বিজ্ঞাপনের কাজে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের দাবি অনুযায়ী বিজ্ঞাপন যদি কেবল ক্রেতাদের কাছে তথ্য সরবরাহ করার কাজই করতো তাহলে তা এমন ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হতো না। আজকের পরিস্থিতিতে বিজ্ঞাপন তথ্য সরবরাহকারী নয়, প্ররোচনা সৃষ্টিকারী। ক্রেতা নিয়ন্ত্রণের দুটি পথের মধ্যে বিজ্ঞাপন একটি। গণ-প্রচার মাধ্যমে সামগ্রী বিজ্ঞাপিত করা ছাড়াও বিক্রয় প্রসারের অন্যান্য কায়দা কানুনও বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যেমন, ধারে কেনার সুযোগ সুবিধে, বিনামূল্যে উপহার, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা এবং ট্রেডিং স্ট্যাম্প ইত্যাদি। যেই ক্রেতা ট্রেডিং স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতে সুরু করবেন

তিনি স্বভাবতই সেই সরবরাহের বিশেষ উৎস এবং ফলত একটি বিশেষ মার্কার জিনিসের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে উৎসাহিত হবেন।[৩]

Public relations বা গণসংযোগ বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে জনসাধারণকে প্রভাবিত করার যাবতীয় কার্যকলাপ রয়েছে। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই গণসংযোগও অন্যতম পথ, যে পথে বিদেশী আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে দমন করা সম্ভব হয়। সব সময়েই এমন একটা ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা যেন কর্পোরেশন চলছে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায়, অথচ প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। গণসংযোগ দপ্তরের কাজ হলো, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন জনসাধারণকে যতটুকু জানতে দিতে চায় ঠিক ততটুকু জানানো। গণসংযোগের কাজ তখনই সবচেয়ে কার্যকর বলে বিবেচিত হবে যখন দেখা যাবে কর্পোরেশনের সঙ্গে জনমানস একসূত্রে বাঁধা এবং জনসাধারণ কর্পোরেশনকে খুবই স্নেহের চোখে দেখছে। এইভাবে গণসংযোগ এবং বিজ্ঞাপনের কল্যাণে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর আভ্যন্তরিক গঠন, অথবা তাদের নীতি-নির্ধারণ ও মূল্যমান ঠিক করার বিষয়ে যে বিশেষ কিছুই জানা যাচ্ছে না তা প্রায় কারো নজরেই পড়ছে না।

গণসংযোগ এবং বিজ্ঞাপনের কাজ যেখানে সুকৌশলে জনসাধারণকে প্রভাবিত করা সেখানে বিক্রয় ও বণ্টন (Sales and Distribution) ক্রেতাকে প্রভাবিত করে একেবারে সরাসরি। এইভাবে তার পছন্দের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়ায় জনসাধারণ বিশেষ মার্কাওয়ালা জিনিস কিনতে বাধ্য হয়।

গ্রাহাম বান্নক বলেন, "মার্কেটিং-এর মূলে কথাটি যেন হান্স্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসনের সেই অসাধু দর্জির গল্প, যারা কোন এক সম্রাটকে বুঝিয়েছিল যে তাঁর পরনের অনবদ্য পোষাকটি তাঁরই জন্য তারা তৈরি করেছে, অথচ বাস্তবে তিনি ছিলেন উলঙ্গ। দর্জিরা তাদের পোষাক এমন দক্ষতায় বাজারে ছেড়েছিল যে সম্রাট চাইলেন তিনি তাঁর নতুন পোষাক পরে রাস্তায় সকলের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা করে যাবেন। বড় বড় কর্পোরেশনগুলো অবশ্য এতদূর এগোয় না, তবে তারা 'নয়'-কে 'হয়' করতে খুবই দক্ষ এবং ক্রেতাকে বোঝায় আগের চেয়ে এখন তিনি অনেক ভালো আছেন।"

আরো একটি জোচ্চুরি হলো নিজের পছন্দমতো নিজে কেনার দোকান (self service stores)। প্রায়শ এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে বড় বড় কর্পোরেশন। সেল্সম্যান রাখার খরচ কমানোর পক্ষে এই কায়দা বেশ কাজ দেয়। খদ্দেরকেই বেশি শ্রমস্বীকার করতে হচ্ছে এবং তার প্রতি কোনো মনোযোগও দেওয়া হয় না।

সুপার মার্কেটের ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা, এখানেও সীমিত পরিমাণে জিনিস পাওয়া যাবে এবং ক্রেতারাও ধাঁধায় পড়ে আত্মহারা।

কেন্দ্রীভূত হওয়ার ব্যাপারটা খুচরো বিক্রীর ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। যেমন, ব্রিটেনের সংবাদপত্র এবং ঔষধ তৈরির কারবারী স্মিথস অ্যান্ড বুটস্। আজ যদি তারা ঠিক করে বিশেষ এক ধরনের বই অথবা আপনার চাহিদামতো মান-এর খাম অথবা প্রয়োজনীয় প্রসাধন সামগ্রী তারা রাখবে না, এ-রকম তারা করেই থাকে, তাহলে ব্রিটেনের বহু শহরেই সে সব জিনিস জোগার করা একে-বারে অসম্ভব না হলেও, খুবই কঠিন হবে। পেট্রোল এবং বীয়ার-এর ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। আজ যদি কোনো ক্রেতা কম-দামের পেট্রোল স্টেশন থেকে গাড়িতে তেল ভরতে চান বা জনবিরল পানশালায় খেতে চান তাহলে তাঁকে দূরে, আরো দূরে যেতে হবে।

এর পর আসছে Product Planning বা উৎপাদিত সামগ্রী বাজারে কিভাবে ছাড়া হবে তার পরিকল্পনা। পণ্যের মান হ্রাস করণ এর অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য পণ্যের নক্শা বিন্যস্ত করা প্রয়োজন, যাতে খরচা ও জটিলতা হ্রাস পায়। নিকোলাস তোমালিন তাঁর অনুসন্ধানে ('সানডে টাইমস্'-এ প্রকাশিত) দেখতে পেয়েছেন যে, "সিগারেট ব্যবসায়ে সাফল্য প্রায়শ মোহ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়,—মোহটি হলো, আরো দেওয়া হচ্ছে এই ভাব দেখিয়ে সব সময়ে তা না দেওয়া।" এটা করা হয় 'product modification'—বা পণ্যের ধরন ধারণ বদলানোর সূত্রে। বদল হয় ঠিকই তবে তার গতি নিম্নমুখী। সিগারেট প্রস্তুতকারকরা যদি আজ তাদের সব সিগারেট থেকে তামাকের পরিমাণ ত্রিশভাগের এক কমিয়ে আনে তাহলে বড় বড় তিনটি তামাক কোম্পানী তাদের প্রাক্-কর মুনাফা এক তৃতীয়াংশ বাড়াতে পারবে শুধুমাত্র তামাক-শুল্কে খরচা কমানোর সুবাদে। অন্যান্য কারচুপির সুযোগও রয়েছে : সিগারেটের ব্যাস কমিয়ে আনা যায়, ভেতরে তামাক আরো ফাঁপিয়ে তোলা যায়। এই পদ্ধতির নাম এফ পি আই—filling-power improvment [8]

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে যেহেতু উৎপাদিত সামগ্রীর মান-এর উৎকর্ষসাধন প্রায় অসম্ভব সেই কারণে স্বভাবতই উৎপাদিত জিনিসের ওপরেই এই কাটছাঁট চলে।

ব্রিটেনের জ্যাম ও মার্মালেড প্রস্তুতকারক দ্বিতীয় বৃহত্তম সংস্থা Schweppes 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে মিলিত

হয়েছিল। সংবাদদাতা লিখেছেন, "জ্যাম শিল্পের ক্ষেত্রে একটি অশুভ লক্ষণ হলো, নতুন সামগ্রী বিকাশের চিহ্ন, মনে হয়, খুবই অল্প, প্রায় নেই বললেই চলে। এর অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে Schweppes সাফ্ সাফ্ জানিয়ে দিল, "জ্যাম সবসময়েই জ্যাম, মিষ্টি আঠালো একটি পদার্থ রুটি আর মাখনের উপর ছড়ানো থাকে।" ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় চোলাইকারী গোষ্ঠী বাস ক্যারিংটন-এর (Bass Charrington) চেয়ারম্যান বলেন, "চিনি, নাট-বল্টু অথবা বীয়ার যা-কিছুই তৈরি করুন না কেন, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সেই একই।"[৫]

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো অবশ্য এমন একটা মোহের সৃষ্টি করে যাতে মনে হয় তারা তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। কিন্তু এইসব পরিবর্তন নিতান্তই ওপরে ওপরে। ভাসা ভাসা পরিবর্তনের এই পদ্ধতিকে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো সূক্ষ্ম কলাশিল্পে পরিণত করে ফেলেছে।

আমেরিকায় মোটর শিল্পে একমাত্র পরিবর্তন মোটর গাড়ির কেতার (style) পরিবর্তন এবং এই কেতার-আবর্তন কোনো রকম প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি এড়িয়ে চলার কৌশল। আমরা আগেই দেখেছি, ১৯২০-র দশক থেকে আমেরিকায় এবং অন্যান্য অধিকাংশ দেশে মোটর গাড়ি উৎপাদনে প্রযুক্তিবিদ্যাগত কোনো বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেনি। তবে মোটর গাড়ির আকৃতির পরিবর্তন হামেশাই ঘটেছে, এটা করা হয়েছে বাজারে চাহিদা চাগিয়ে তুলতে।

ধরনধারণ ও মোড়কের কলাকৌশলের অবিরত পরিবর্তন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের পণ্য সামগ্রীর রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতেই বোঝা যায় সব রকম কারিগরী অগ্রগতিই প্রকৃতপক্ষে থেমে আছে। কেবল মোটর গাড়ির ক্ষেত্রেই নয়, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি, বৈদ্যুতিক আসবাবপত্র, টেলিভিশন এবং রেডিওর ক্ষেত্রেও একথা সত্য। সকল ক্ষেত্রেই মূল কাজকর্ম এবং মান অপরিবর্তিত থাকছে, কখনো সামান্য সংযোজন ঘটছে অথবা বড় রকমের বাহ্যিক পরিবর্তন হচ্ছে।

সিগারেট প্রসঙ্গে নিকোলাস তোমালিনের সাক্ষ্যকেই আর একবার স্মরণ করা যাক। তিনি বলেন, "সেই একই ৫৬ নং তামাকের মিশ্রণ ভ'রে বেনসন অ্যান্ড হেজেস কিং সাইজ ('পিওর গোল্ড ফ্রম বেনসন অ্যান্ড হেজেস') সিগারেট বিক্রী করে ২০টা ৬ শিলিং দামে, কংকোয়েস্ট ২০টা ৫ শিলিং দামে এবং নেলসন ২০টা ৪ শিলিং ১০ পেন্স দামে।

"কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ফিলটার তামাকের স্বাদ এমন আমূল বদলে দেয় যে একই মিশ্রণ ভিন্ন ভিন্ন আকারের ব্র্যান্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদ এনে দেয়।"

'প্লেয়ার্স'-এ মার্কেটিং-এর কাজ করেন, এমন একজন ব্যক্তির উক্তি

তোমালিন উদ্ধৃত করেছেন। এই ব্যক্তিটি, "তাদের একটি পণ্য সামগ্রীর পরিবর্তিত আকৃতির গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণের প্রক্রিয়া আমার কাছে বর্ণনা করলেন। প্রথমে তারা পরীক্ষামূলক নমুনা তৈরী করলো, প্রত্যেকটি এক মিলিমিটারের পাঁচ ভাগের একভাগ খাটো করলো, অথবা সরু করলো এক মিলিমিটারের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ অথবা ফিলটার বদলে দিল। এরপর তারা এইগুলো দিল তাঁদের বিশেষভাবে নির্বাচিত 'ধূমপায়ী-প্যানেল'-কে। প্যানেলের চোখে যদি ধরা না পড়ে তখন ছাঁটাইকরা সিগারেটগুলো আরো গভীর-ভাবে যাচাই করার জন্য যাবে। নমুনাস্বরূপ সারা দেশের মধ্য থেকে এলো-পাথাড়িভাবে নির্বাচিত করা ০০০ জন ধূমপায়ীর কাছে।

"এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য তারা সংস্কৃত পণ্যটিকে পাঠাবে একটা স্বাধীন আলোচনা-গোষ্ঠীর কাছে। পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য একজন যোগ্য মনস্তত্ত্ববিদ আলোচনাটি টাইপ করে এবং আড়ি পেতে ধরে রাখবেন।"[৬]

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এইভাবে বাজারের হালচাল জেনে নেবার ব্যাপারটিকে নিজেরাই মার্কেটিং রিসার্চ বলে বর্ণনা করেছে। একমাত্র লক্ষ্য হলো পণ্যের উৎপাদন মূল্য কমানো এবং ক্রেতাকে ঠকানো ; অভীষ্ট কিভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা লোটা যায়।

অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকেও বাণিজ্যিক টেলিভিশনের উপর নির্ভর করতে হয়। এমন কি জে. কে. গলব্রেথকেও এ-কথা স্বীকার করতে হয়েছিল, যখন তিনি বলেন, "শিল্পায়ত ব্যবস্থা বাণিজ্যিক টেলিভিশনের উপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল, এবং একে বাদ দিয়ে সে তার বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে পারে না।"

বাণিজ্যিক টেলিভিশন এইভাবে ব্যবহার করে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো ক্রেতাদের জীবন নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলে সম্প্রতি তার পরিচয় পাওয়া গেছে আফ্রিকার দেশগুলোতে এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণার সূত্রে। আফ্রিকার দেশগুলোতে দেখা যায় সেখানকার শিশুরা নানা রোগে ভোগে, এবং সযত্ন গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে রোগের কারণ বেবীফুড—বাজারে যে বেবী-ফুডের বন্যা বইয়ে দিয়েছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো। বেবীফুডের প্রচার চালানো হয় টেলিভিশনের মাধ্যমে। নিয়মিত বেবীফুড এনে দিতে না পারলে আফ্রিকার মায়েরা তাদের স্বামীদের তিষ্ঠোতে দেন না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের ( WHO ) গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, শিশুদের

এনজাইম প্রয়োজন, এবং এই এনজাইম একমাত্র রয়েছে মাতৃস্তন্যে। টেলি-ভিশন প্রচারের কল্যাণে আফ্রিকার মায়েরা প্রসাধনের কারণে সন্তানদের বুকের দুধ দিতে গা করেন না, নির্ভর করেন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর বেবী-ফুডের উপর। বাজারের বেবীফুডে মূল্যবান এনজাইম থাকে না।

বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি সুপারিশ করেছে, সিগারেট প্যাকেটের মতো প্রতিটি বেবীফুডের মোড়কেও সতর্কীকরণের স্লোগান রাখতে হবে। এই নিয়ম ভারতেও চালু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সতর্কীকরণে অভিপ্রেত ফল পাওয়া যাবে কিনা সে স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

পণ্য সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধনে নতুন কলাকৌশল প্রয়োগে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর অস্বীকৃতি কিভাবে তাদের মানবজীবন ধ্বংসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করে ফেলেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তব্য সরকারী তথ্যে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। অটোমবিল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ রালফ্ নাদের 'দ নেশন' পত্রিকার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "অটোনির্মাতারা সম্মিলিত অনতিক্রম্য পাশবিকতায় জীবন-রক্ষাকারী প্রযুক্তিবিদ্যাকে অবিচলভাবে অস্বীকার করে চলেছেন।" তারা যদি জীবন-রক্ষাকারী প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করতো, তাহলে হাইওয়েতে আমাদের (আমেরিকার) বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা বছরে ৪০ হাজার থেকে ১২ হাজারে বা আরও কমে, নামিয়ে আনা সম্ভব হতো।' এবং হার্ভার্ডের এক বিজ্ঞানী ডঃ বাক্সবম লক্ষ্য করেছেন যে, আমেরিকায় প্রতি বছর মোটর গাড়ি-জনিত মৃত্যুর প্রায় অর্ধেকের জন্যই দায়ী অটোমবিলের যান্ত্রিক বিকলতা।

মার্কিন শ্রম দপ্তর প্রকাশিত হ্যান্ডবুক অব লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স্ অনুযায়ী নির্মাণকর্মে আঘাতজনিত অক্ষমতার পরিমাণ চার বছরে বেড়েছে ৩০ শতাংশ সমরোপকরণ নির্মাণ কর্মীদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ ৯০ শতাংশ; রাবার এবং প্লাস্টিক কর্মীদের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ; ব্লাস্ট ফার্নেস এবং ইস্পাত শিল্পে বৃদ্ধির পরিমাণ ৭০ শতাংশের বেশী এবং অ্যালুমিনিয়াম রোলিং-এ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫৭ শতাংশ। উৎপাদনের কলাকৌশলে যে অগ্রগতি ঘটেছে তাকে কাজে লাগিয়ে কাজের পদ্ধতির উন্নতি ঘটাতে পরাক্রান্ত মার্কিন পুঁজিপতিদের অনীহা এইসব আঘাতের কারণ।

"পেন্টাগণ ক্যাপিট্যালিজম" গ্রন্থে সেমুর মেলম্যান লিখেছেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি সত্ত্বেও ১৯৬৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প বিশ্বের প্রাচীনতম মেটাল-ওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেছে; ৬৪ শতাংশ ছিল দশ বছর কি তারে চেয়েও বেশী পুরোনো।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো রেলপথেই এমন কিছু চলে না যার গতি জাপান এবং ফ্রান্সের দ্রুতগামী ট্রেনের সংগে তুলনীয়। জাহাজের বয়সের ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সওদাগরী জাহাজগুলোর স্থান ২৩ তম। ১৯৬৬ সালে জাহাজের বিশ্ব-গড় বয়স ছিল ১৭ বছর, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ২১ এবং জাপানের ৯ বছর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশীসংখ্যক গবেষক বিজ্ঞানী এবং ইনজিনিয়ার কাজে লাগায় সেখানে ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের মতো প্রধান প্রধান শিল্পে সে ঘরোয়া বাজারেই অসুবিধের মুখোমুখি হয়; ১৯৬৭ সালে, সেই প্রথম, আমেরিকা রপ্তানীর চেয়ে বেশি যন্ত্রপাতি আমদানী করেছিল।

একটিমাত্র ক্ষেত্রে যেখানে বলতে গেলে প্রতিঘণ্টায় প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি ঘটছে সেটি হলো সকলরকম অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও বিকশিত করার ক্ষেত্র। প্রতিযোগিতায় ফিরে আসার জন্য বোয়িং বিমান আজও বাড়তি উদ্যোগ ব্যয় করে থাকে এবং তা-ও বিমানটির উন্নতিকল্পে অতিরিক্ত গবেষণা ছাড়াই। কিন্তু এর ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচীর দৌলতে এই একই বোয়িং বিমান বছরে ১০৫ শতাংশ পর্যন্ত লাভ করে থাকে। আজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনীতিতেই সামরিক উৎপাদন অর্থনৈতিক উদ্দীপনার স্বীকৃত পথ। যুদ্ধের ব্যয়বরাদ্দ ১০০ শত কোটি ডলার। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের জন্য সমগ্র সরকারি ব্যয়বরাদ্দের ৯০ শতাংশই চলে যায় সামরিক খাতে। সামরিক উদ্দেশ্যে গবেষণার জন্য তেল, মোটর, বিমান এবং ইলেকট্রনিক শিল্পেও আরও শত শত কোটি ডলার ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্রের জন্য কমপিউটার শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম; এবং এ ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে অন্যান্য সব দেশের অনেক ওপরে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।[৭]

কিন্তু অন্যান্য শিল্পে কাজের ব্যবস্থাপনায় এমনকি ন্যূনতম সতর্কতা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয় না। যার ফলে মার্কিন শ্রমদপ্তরের তৈরি প্রতিবেদন অনুযায়ী, "প্রতি বছর ১৫০০০ জন শ্রমিক নিহত হন—ভিয়েতনাম যুদ্ধের যে- কোনো বছরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত মোট সংখ্যার চেয়ে বেশি—এবং কাজ করার সময় আহত হন ২২লক্ষ শ্রমিক। পেশাগত রোগে পঙ্গু হয়ে যান ১০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক······প্রতিটি কাজের দিন মারা যাচ্ছেন ৫৫জন, পঙ্গু হয়ে পড়েছেন ৮৫০০ জন এবং আহত হচ্ছেন ২৭০০০ জন।"

মার্কিন শ্রমদপ্তর প্রকাশিত 'দ হ্যান্ডবুক অব লেবার স্ট্যাটিসটিক্স'-এ বলা

হয়েছে, বড় বড় নির্মাণমূলক এবং অ-নির্মাণমূলক শিল্পে পাঁচ বছরে মোট ১১২০০০০০ জন শ্রমিক নিহত এবং আহত হয়েছেন ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মোট মার্কিন ক্ষয়ক্ষতি ১০৫৮০০০ জনের চেয়ে এই সংখ্যা প্রায় এগারগুণ বেশি।"

গবেষণা ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে পণ্যের উৎকর্ষ বিধানের কোনো চেষ্টা না থাকলেও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো নানা পথে সব সময়েই বাড়তি কিছু ডলার লাভ করছে। তাদের সামনে অন্যতম খোলা পথ হলো অনবরত পণ্যের দাম বাড়ানোর প্রবণতা। এটা পুঁজি বাড়াবারও পদ্ধতি। গ্রাহাম বান্নক ঠিকই লক্ষ্য করেছেন "এখনও পুঁজি বাড়াবার সস্তা উপায়, অবশ্য বাজারে কর্পোরেশনের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলে তবেই, এর দাম বাড়ানো এবং উচ্চতর বাড়তি আয় বিনিয়োগ করা। এইভাবে ক্রেতারাই পুঁজি যোগাচ্ছে।"

এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তেলের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো। বব এডওয়ার্ড'স মন্তব্য করেছেন, তেলের ভুবন মানেই EXXON-এর ভুবন ; জন ডি রকেফেলার'স স্ট্যান্ডার্ড অয়েল ট্রাস্ট-এর উত্তরাধিকারী কোম্পানীগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় এবং বিশ্বের সবচেয়ে ধনী সংস্থা বলে একে গণ্য করা হয়। কোম্পানীর প্রধান জন কে. গেমিসন। ১৯৭৩ সালে তাঁর মাইনে ছিল ৪০১৬৬৬ ডলার। ওই একই বছর EXXON-এর তেল উৎপাদন পেঁাছেছিল দিনে ৫৫ লক্ষ ব্যারেল-এ ; এই পরিমাণ আফ্রিকার সমস্ত দেশের মোট গড় তেল উৎপাদনের সমান। EXXON ১৬৪টি ট্যাংকারের মালিক। সে বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাহাজ কোম্পানি। পেট্রোল পাম্প স্টেশন এবং তেল শোধনাগারের বেশির ভাগ অংশের সে মালিক। EXXON আমেরিকার পঞ্চম বৃহত্তম কেমিক্যাল উৎপাদক।[৮]

বব এডওয়ার্ড'স-এর মতে ১৯৭৩ সালে EXXON-এর আয় ছিল ২.৪ শত কোটি ডলার। ১৯৭৪ সালে কোম্পানির লাভের পরিমাণ ছিল ৪ শত কোটি ডলার ; যেটা পশ্চিম জার্মানীর (FRG) যাবতীয় শিল্পসংস্থার ছ'ভাগের একভাগ শেয়ার কেনার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু অংকে যা দেখা যায় EXXON-এর প্রকৃত প্রতাপ তার চেয়েও বহুগুণ বেশি। বিশ্বের সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনের পিছনে EXXON-এরই হাতযশ। বব এডওয়ার্ড'স লিখেছেন, "সাম্প্রতিককালে নাটকীয়ভাবে তেলের দাম বাড়িয়ে দেবার চেষ্টাটা প্রথমে ইরানের শাহ রেজা পহ্লেবিও করেন নি, সৌদি আরবের প্রয়াত রাজা ফয়জলও করেন নি বা লিবিয়ার গদ্দাফিও করেন

নি ; এটা করেছিল রকেফেলার মর্গান্‌স ক্লাবের মার্কিন তেল ও আর্থিক ম্যাগনেটরা, করেছিল EXXON।"

তেলের দাম নিয়ে EXXON যে কি রকম জোচ্চুরি করেছে কদিন আগেও সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। ঘটনাটা এই রকম। ১৯৭১ সালে, তেল কোম্পানীগুলিতে অংশগ্রহণের জাতীয় অধিকার নিয়ে তেল উৎপাদক দেশগুলি কথাবার্তা শুরু করার আগেই Aramco ম্যানেজারগণ তাঁদের নিউ ইয়র্কের সদর দপ্তরে খবর পাঠালেন, শীঘ্রই সৌদি আরব Aramco নিজেদের হাতে নিয়ে নেবে এবং মার্কিন সংস্থাগুলোকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় তেল ও আর্থিক পুঁজিপতিরা বিশাল Chase Manhattan Bank-এর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ালেন। ওয়াশিংটনের সাংবাদিক জ্যাক অ্যান্ডারসনের মতে, এরা মনে করেছিল, এই ধরনের জাতীয়করণের ফল হবে ভয়াবহ, তারা ভেবেছিল, সৌদি আরবের তেল তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। কাজেই তারা তাদের রণকৌশল এইভাবে ঠিক করল : মার্কিন তেল সংস্থাগুলো তাদের অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ তেলক্ষেত্রগুলোকে আবার সক্রিয় করে তুলবে, এগুলো ১৯৭৩ সালে সাময়িকভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রগুলো থেকে উৎপাদিত তেলের দাম ব্যারেল ( ১৫৯ গ্যালন ) প্রতি ২ ডলার। ওই সময় বিশ্বের বাজার দরের চেয়ে তা বেশি ছিল। এর পর ঠিক হলো Aramco-র মাধ্যমে EXXON সৌদি আরবের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। মতলব ছিল সৌদি আরবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তেলের ওপরে তার রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াতে রাজী করা এবং ধীরে ধীরে তেলের দাম বাড়িয়ে ব্যারেল পিছু ৪-৫ ডলারে পৌঁছে যাওয়া। এতে আমেরিকার কয়েকটি ছোট ছোট তেল সংস্থারও ক্ষতি হলো। তারা মনে করলো প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকা আর তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, কাজেই অনেকেই তেলের ব্যবসা ছেড়ে কয়লার ব্যবসায়ে নেমে পড়ল।

Chase Manhattan Bank-এর পরিচালক সমিতির চেয়ারম্যান ডেভিড রকেফেলার রিয়াদে পাড়ি দিলেন রাজা ফয়জলের সঙ্গে দেখা করতে। উদ্দেশ্য, তেলের দাম যাতে না বাড়ে তার চেষ্টা করা।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। আরবরা তখনো ব্যারেল পিছু ১৮ ডলার দামে তেল বেচবার কথা বলছে। কিন্তু এর পর কয়েকজন গিয়ে দেখা করলো মন্ত্রী ইয়ামানির সঙ্গে এবং তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হলো যে, সৌদি আরব তার তেল উৎপাদন বাড়াবে এবং একই সঙ্গে তেলের দাম ব্যারেল পিছু ৫·৫ ডলার নামিয়ে

আনবে। তেলের এই দামই EXXON এবং Aramco-র মনোমত। এবং তার পর থেকেই তেলের দাম নিয়ে খেলা চলতে থাকলো।[৯]

তেল উৎপাদক দেশগুলোর বিরুদ্ধে সহস্র বিষোদ্গার সত্ত্বেও তেল ব্যবসায়ে নিযুক্ত আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কি পরিমাণ লাভ করে চলেছে তার হিসেবটা কম কৌতুহলোদ্দীপক নয়। ১৯৭৯ সালের জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ১০টি বৃহত্তম মার্কিন কোম্পানি কি পরিমাণ মুনাফা লুটেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইকনমিক প্রেস তার একটা হিসেব প্রকাশ করেছে। ১৯৭৮ সালের ওই তিন মাসের তুলনায় ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCO | ৩২.০৪ | কোটি ডলার | | + | ৪০ শতাংশ |
| AMOCO | ৫৩·৩৮ | ,, | ,, | + | ৪০ ,, |
| SHELL | ৩৯·৩৩ | ,, | ,, | + | ৬৩ ,, |
| SOCAL | ৫৭·৬ | ,, | ,, | + | ৭৩ ,, |
| GULF | ৪১·৬ | ,, | ,, | + | ৯৭ ,, |
| EXXON | ১১৪·৫ | ,, | ,, | + | ১১৮ ,, |
| MOBIL | ৫৯·৫ | ,, | ,, | + | ১৩১ ,, |
| CONOCO | ২৪·৭১ | ,, | ,, | + | ১২৫ ,, |
| SOHIO | ৩৬·৬২ | ,, | ,, | + | ১৯০ ,, |
| TEXACO | ৬১·২২ | ,, | ,, | + | ২১১ ,, |

কোন কলকাঠি নেড়ে এইরকম দুহাতে মুনাফা লোটা যায় সে সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন সেনেটর জন ডার্কিন। এইভাবে মুনাফা শিকারকে তিনি ওয়াটার গেট কেলেংকারির সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১০]

আরব দেশগুলোতে অবিরত অশান্তি লেগে থাকার পিছনে যে একচেটিয়া তেল পুঁজিপতিদের ভূমিকা রয়েছে এ কথা সুবিদিত, তার পুনরুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লিপ্সা কিভাবে নাশকতামূলক কাজ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত তার আর একটি উদাহরণ দিয়েই আমরা এই অধ্যায় শেষ করবো। ঘটনাটি ITT-র। FORTUNE প্রণীত বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থার তালিকা অনুযায়ী, পনের বছরে ITT ৫২তম স্থান থেকে ১১শ স্থানে উঠে এসেছে। এটি এক হাজার সংস্থার একটি সাম্রাজ্য। সমস্ত আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন যে পথে ব্যবসা করে এরাও সেই একই পথে বৈদ্যুতিক ইনজিনিয়ারিং, খাদ্য সামগ্রী এবং সেবার (Service) ব্যবসা করে থাকে। এই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সাহায্যেই প্রেসিডেন্ট নিকসনের উপদেষ্টা পিটারসন সি-আই-এর সহ-

যোগিতায় চিলির আলেন্দে সরকারকে উৎখাত করার ১৮ দফা কর্মসূচী হস্তগত করেছিলেন। ( এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হবে। )

অস্ত্রশস্ত্র, আকাশ ও মহাকাশ, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এবং এই ধরনের অন্যান্য যেসব শিল্প একান্তভাবে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় সেসব ক্ষেত্রে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো সর্বপ্রকার প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতিকে কাজে লাগায়। অন্যদিকে যেসব শিল্প সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজে নিয়োজিত সেসব ক্ষেত্রে সমস্ত রকমের প্রযুক্তিবিদ্যাগত উদ্ভাবনের পথ পরিত্যক্ত। আদৌ যদি কোনো কিছু উদ্ভাবিত হয়ও তবে তাকেও নষ্ট করে ফেলা হয়। সর্বোচ্চ মুনাফা লোটার পিছনে ছোটার এটাই হলো অর্থ।

একই সংগে কিন্তু আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো বৈচিত্র্যকরণের কার্য-কলাপে নিজেদের ব্যাপৃত রাখে। বড় বড় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান আজ নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে—বিশেষ করে আমেরিকায়। যেমন রেডিও কর্পোরেশন অব আমেরিকা (R.C.A.)-র মতো ঐতিহ্যবাহী সংস্থাও গাড়ি ভাড়া দেয়, বই প্রকাশ করে এবং কম্পিউটার তৈরি করে। ওয়েস্টিংহাউস নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর বানায়, সমুদ্রের জলের নোনতা স্বাদ কমানোর জন্য কারখানা তৈরি করে, জমি ইজারা নেয় এবং বোতল বিক্রীও বাদ রাখে না। বড় বড় তেলের কোম্পানিগুলি পারমাণবিক শক্তি, কেমিক্যাল এবং সার-এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তথ্য প্রক্রিয়ণ শিল্পে নিযুক্ত শিল্পপতিরাও তাদের উৎপন্নদ্রব্য ও কার্যকলাপের চৌহদ্দি বাড়াচ্ছে! যেখানে পারছে সেখানেই তারা তাদের বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের কড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ব্যাংক, বীমা কোম্পানি অথবা ঋণপত্র যেখানে যা পাচ্ছে তারা শুষে নিচ্ছে—এইসব ক্ষেত্রগুলো তথ্যসরবরাহ-শিল্পের (information industry) দৌলতে ভবিষ্যতে এয়ার ট্র্যাভেল, কণ্টেনার ট্রান্সপোর্ট, প্রকাশনা, শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, এবং নির্মাণকর্মের মতই প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত হবে।

বৈচিত্র্যের স্পৃহা যে কতটা ১৯৫০ সালের আমেরিকার বৃহত্তম এক হাজারটি কোম্পানির সংগে ১৯৬২ সালের হাজারটি কোম্পানির তুলনা করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। এক ধরনের জিনিস তৈরি করে এইরকম সংস্থা ৭৯টি থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৯টিতে, ২ থেকে ৫ রকমের জিনিস তৈরিকারী সংস্থার সংখ্যা ৫৪টি থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২২৩টিতে। অন্যদিকে ১৬ থেকে ৫০টি জিনিস তৈরিকারী

সংস্থা ১২৮ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৬টিতে এবং ৫০টির বেশি জিনিস তৈরি করে এমন সংস্থার সংখ্যা ৮ থেকে বেড়ে ১৫-তে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬০ সালের হাজারটি বৃহত্তম কোম্পানির দুই তৃতীয়াংশ ১৯৬২ সালেও হাজারটি সর্ববৃহৎ কোম্পানির মধ্যে স্থান পেয়েছে। হাজারটি বড় কোম্পানির মধ্যে সবচেয়ে বড় তারাই, বিশেষ করে যাদের মধ্যে বৈচিত্র্য সাধনের প্রবণতা স্পষ্ট লক্ষ্য।

এইভাবে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন একধারে খাড়া এবং আনুভূমিক, তাদের জাল বিশ্বের সর্বত্র ছড়ানো, এবং এক অর্থে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার উপর এখন তাদের প্রায় সর্বব্যাপক প্রভাব।[১১]

## সূত্র ও উল্লেখপঞ্জী

১ বব এডওয়ার্ডস্ : মালটিন্যাশনাল কোম্পানীজ এণ্ড দ্য ট্রেড্ ইউনিয়নস্।

২ গ্রাহাম বান্নক : দ্য জাগারন্যাটস্।

৩ পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৪ পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৬ পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৭ গ্যাস হল : ইম্পিরিয়ালিজম টুডে।

৮ বব এডওয়ার্ডস : মালটিন্যাশনাল কোম্পানীজ এণ্ড দ্য ট্রেড ইউনিয়নস্।

৯ পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১০ ওয়ার্ল্ড ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট।

১১ ট্রেড ইউনিয়নস্ এগেনস্ট দ্য মালটিন্যাশনাল কোম্পানীজ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

## দ্বন্দ্ব—সংকট—দ্বন্দ্ব—সংকট......

আমরা আগে দেখেছি, এবং পরে আরো দেখব, যে আজ আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতের কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতারও প্রতিভূ। এই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সংখ্যা দিনকে-দিন আরো কমছে। একই সঙ্গে একদিকে এই কেন্দ্রীভবন, অন্যদিকে আর এক ধরনের কেন্দ্রীভবন। এই অন্যদিক সম্পর্কে মার্কস বলেছেন, ক্রমবর্ধমান "দুঃখ, নির্যাতন, দাসত্ব, অপমান, শোষণ।" পুঁজিবাদের একই অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী এই উভয় প্রকারের কেন্দ্রীভবন ঘটেছে।

কিন্তু অন্য ধরনের কেন্দ্রীভবন ছাড়াও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর গঠন "পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটেরও" প্রতিফলন। বলতে গেলে, পুঁজিবাদ কখনও সংকটমুক্ত ছিল না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাবের ফলে পুঁজিবাদের সংকট সাধারণ সংকটে পর্যবসিত হয়েছে। অন্যান্য কারণের কথা বাদ দিলে এই সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার আবির্ভাব ও বিকাশ এবং একই সঙ্গে অতীতের উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির মুক্তির ফলে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চক্রাকারে পুঁজিবাদ তার সংকটের চিহ্ন রেখে গেছে; পুঁজিবাদের ১৫০ বৎসরব্যাপী অস্তিত্বে অবশ্যম্ভাবীরূপে এইসব সংকট এসেছে এবং চলে গেছে।

যা থেকে পুঁজিবাদের সংকট আসে তাকে বলা হয় "উৎপাদনে অরাজকতা"। এর অর্থ পুঁজিবাদের বিকাশ সর্বদাই অসম; এই ধরনের বিকাশ প্রক্রিয়ায় এমন সময় আসে যখন বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। পুঁজিবাদের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এই লক্ষণীয় অসম বিকাশ দেখা গেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং অঞ্চল বিভিন্ন হারে বৃদ্ধিলাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রসারণ ও সংকোচন পর্বের মধ্যেও সর্বদাই একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে। এই অস্থিরতা ঘুরে ঘুরে এত নিয়মিত দেখা দিত যে অনেকেই এই চক্রাবর্তনকে "দশসালা"

বলে বর্ণনা করেছেন। বাস্তবেও অবশ্য প্রতি দশবছর অন্তর এই চক্রের দেখা পাওয়া যেত।

১৯২৯-৩১ পর্যন্ত যে সংকট দেখা গিয়েছিল তাকে বলা যেতে পারে জঘন্যতম সংকটের একটি, ঐসময় শ্রমশক্তির প্রতি চারজনের একজনই ছিলেন বেকার এবং শিল্প প্রকল্পগুলিতে ৫০ শতাংশেরও বেশি উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকত। পশ্চিম ইওরোপ কিছুটা সামলে উঠতে পেরেছিল কারণ নতুন করে অস্ত্র নির্মাণের কর্মসূচীর ফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের কিছুটা সুরাহা হয়েছিল। প্রাক-সংকট স্তরে পেঁছিতে আমেরিকার অনেক বেশি সময় লেগেছিল। ঐ পর্বের সংকটের সময় অনেকেরই মনে পড়ে গিয়েছিল মার্কসের সেই বিখ্যাত উক্তি, "পুঁজিবাদী মালিকানা উৎপাদিকা শক্তিসমূহের অধিকতর বিকাশের বেড়ি হয়ে উঠেছে।" এই প্রপঞ্চ এই মার্কসীয় বিশ্লেষণকেই প্রমানিত করে যে "পুঁজিবাদ উৎপাদনের সম্প্রসারণ উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) নিঙড়ে নেবার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংঘাতের সম্মুখীন হয়।"

সামান্য প্রসঙ্গান্তরে গেলে আমরা দেখতে পাব যে, উদ্বৃত্ত-মূল্য নিষ্কাশন প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ পর্বে সক্রিয় থাকে ভিন্নভাবে। আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের শিল্পগুলিতে এই ধরনের সম্প্রসারণ ( তেজী অবস্থা ) পর্বে মজুরি কাঠামো বিশ্লেষণ করে মরিস ডব প্রমাণ করেছেন যে "এমনকি অনুকূল অবস্থাতেও পণ্যের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনে মজুরের আনুপাতিক অংশ পরি-বর্দ্ধনের ব্যাপারে পুঁজিবাদের মধ্যে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ কাজ করে। উদ্বৃত্ত মূল্যের উপর শ্রমিকের মজুরীর ভাগ বসাবার একটা সুদৃঢ় সীমা নির্দেশ করা আছে।"

উৎপাদনের প্রক্রিয়া যদি শুধুমাত্র সামাজিক লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যার অর্থ সমগ্র সমাজের বৈষয়িক মঙ্গলের বৃদ্ধি, ( সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ভাষায়, "উচ্চতর কলাকৌশলের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের অবিরত সম্প্রসারণ এবং বিশুদ্ধিকরণের মাধ্যমে সমগ্র সমাজের অবিরত বর্ধমান বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা সর্বোচ্চভাবে মেটানোর লক্ষ্য অর্জন।" ) তাহলে উৎপাদনের সর্বাংগীণ সম্প্রসারণের কোনো সীমা থাকবে না, মানুষের চাহিদা পুরোপুরিভাবে মেটানো সম্ভব হবে।

কিন্তু পুঁজিবাদের অধীনে, উৎপাদনের নতুন উপায়ে পুঁজি লগ্নী করা হয় কিছু-না-কিছু মুনাফার প্রত্যাশা নিয়ে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ হলে আবার কিন্তু একটা মুনাফা হলেই প্রত্যাশা পূরণ হবে না, মুনাফার হার হওয়া চাই সর্বোচ্চ।

দেখা গেছে, সম্প্রসারণ পর্বের পর এমন একটা সময় আসে যখন আশানুরূপ হারে মুনাফা আদায় সম্ভব হয় না। নতুন করে লগ্নীর পরিমাণ কমে যায়, এবং সকল রকম সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে নতুন মেশিন ইত্যাদির জন্য বরাতও বন্ধ হয়ে যায়। অনিবার্য ফল হিসেবে দেখা দেয় বেকারী। কলকারখানাগুলোতে যতটুকু উৎপাদন ক্ষমতা অবশিষ্ট রয়েছে তারও পুরো সদ্ব্যবহার করা হয়ে ওঠে না। ফলে, সেইসব শিল্প উৎপাদনের উপায় ( যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি ) তৈরি করে, যে সব শিল্পে উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে ফলস্বরূপ অন্যান্য শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদাও কমে যায়। মার্কস বলেন, "উৎপাদনের পুঁজিবাদী ধরন উৎপাদনের বিশেষ এক পর্যায়ে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়।...সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর দ্বারা নয়, উৎপাদন এবং মুনাফা আদায়ের দ্বারা নির্ধারিত এক বিন্দুতে গিয়ে তা ( উৎপাদন ) একেবারে থেমে যায়।"

এই প্রক্রিয়া বুঝতে হলে আমাদের আরো একবার কার্ল-মার্কসের শরণাপন্ন হতে হবে। শিল্পের দুটি প্রধান বিভাগ মার্কস এইভাবে ভাগ করেছেন : (ক) একটি উৎপাদন করে মূলধনী সামগ্রী (Capital goods), নিজের ব্যবহারের জন্য এবং অন্যান্য শিল্পের ব্যবহারের জন্যও, এবং (খ) অন্যটি তৈরি করছে ভোগ্য পণ্য, যা শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ী মারফৎ ব্যক্তিগত ক্রেতার কাছে বিক্রীত হবে। 'ক' বিভাগটিকে আরো দুটি বিভাগে ভাগ করা চলে—(১) 'ক'-এর নিজের ব্যবহারের জন্য মূলধনী সামগ্রী উৎপাদন ; যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি এবং (২) 'খ' বিভাগের ব্যবহারের জন্য মূলধনী সামগ্রী উৎপাদন ; সুতো তৈরি ও বস্ত্র বয়ন করার যন্ত্র উৎপাদন। একইভাবে, 'খ' বিভাগকেও দুটি ভাগে ভাগ করা চলে—(১) মাইনে-করা লোকের জন্য ভোগ্যপণ্য তৈরি করা এবং (২) পুঁজিবাদী ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের উপভোগের জন্য বিলাস দ্রব্য তৈরি করা।

বাজার তেজী থাকলে লগ্নী বাড়ে এবং যন্ত্রের চাহিদাও ( 'ক' বিভাগ উৎপাদিত ) বাড়ে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যায় এবং মোট মজুরি ও মুনাফা দুই-ই বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ উভয়ের এবং ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ( 'ক' এবং 'খ' দুই বিভাগের উৎপাদিত সামগ্রী ) বাড়িয়ে দেয়। নতুন নতুন প্রকল্প তৈরি হয় ; শিল্পের উভয় ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

কিছুকাল পরে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি চাহিদা বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হয়ে

যায়। এবং তখন মুনাফার হার কমে যায়। এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন লগ্নী থেমে যায়; 'ক' বিভাগের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদায় ভাটা পড়ে এবং তারপর ধাপে ধাপে চাহিদা, কর্মবিনিয়োগ ও উৎপাদনে সার্বিক মন্দা। কাজেই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মুনাফার হারই পুরো ব্যাপারটার মূলে।

এক ধরনের কৃত্রিম উদ্দীপনা সৃষ্টি করে 'ক' বিভাগ উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা বাড়ানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়ঃ এই কৃত্রিম উদ্দীপনা হলো বিশাল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কর্মসূচী। কিন্তু মরিস ডব যেমন বলেছেন, এটা হলো "কেবল হত্যা ও ধ্বংসের ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করা।" তবে এ-থেকেও কিন্তু মুনাফা আসবে প্রচুর।

কিন্তু রপ্তানীর সাহায্যে কি 'ক' এবং 'খ' উভয় বিভাগের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা বাড়ানো সম্ভব নয়? হ্যাঁ, সম্ভব এবং পুঁজি রপ্তানী তথা ভোগ্যপণ্য রপ্তানীর মতো ঘটনার এটাই হলো মূল কথা। রঙ্গমঞ্চে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর প্রবেশও এই বিশেষ প্রেক্ষাপটে।

একই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য দেশগুলোও রপ্তানী-কারক ঐ দেশটি থেকে দিনের পর দিন বাড়তি পণ্য ও যন্ত্র কিনেই যাবে অথচ বিনিময়ে তার কাছে কিছু বিক্রী করবে না, তা-ও চলতে পারে না। এই বাধা দূর করা যায় যদি অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা হয় ধারে অথবা ঋণ হিসেবে। এই পদ্ধতিতেও কেবল উদ্বৃত্ত-রপ্তানী সম্ভব।

এইভাবে কাজ করাটাই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব।

বিশ্বকে পুনরায় ভাগ করা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী (আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন-গুলো) বৈরতাই যে দুটি বিশ্ব যুদ্ধের কারণ তা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে ব্যাপকতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় ফ্যাসিবাদ ও মুক্তি যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল সে অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ। যুদ্ধের চরিত্র যা-ই হোক না কেন, এর ফলে বিভিন্ন দেশে বিরাজিত সমগ্র অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিছু না কিছু বদলে গিয়েছিল।

আধুনিক যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক যাবতীয় সম্পদের সার্বিক সমাবেশ; সমর শিল্পের প্রসারও এর জন্য প্রয়োজন। ফলস্বরূপ এই ধরনের যুদ্ধের সুবাদে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটে, যার নির্গলিতার্থ অর্থ, শ্রম, মূল্য, বৈষয়িক বরাদ্দ ইত্যাদির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। একই সঙ্গে

অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের বাজারে রাষ্ট্রই হয়ে ওঠে প্রধান ক্রেতা। সেনাবাহিনীকে এবং এমনকি জনসাধারণকেও প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করে রাষ্ট্র।

এই ঘটনায় জন-শক্তিরও সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সমাবেশ ঘটে, ফলে একটা সময়ের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সাধারণত রাষ্ট্র ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ এবং শ্রমের উপর নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করলেও যুদ্ধের সময় শ্রমজীবী মানুষ বেশ কিছুটা সুযোগসুবিধা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। কোনো ক্ষেত্রেই অবশ্য পুঁজিবাদের উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের প্রক্রিয়ার নিয়ম লঙ্ঘিত হয় না।

তাছাড়া যুদ্ধের সময় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের উপর তাদের প্রভাবকে বাড়াতে পারে, কেননা তারাইতো জিনিসপত্র এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে— ভোগের জন্য তথা প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য। এ-ভাবেই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রসার ঘটে এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় এই ধরনের প্রসার সকলের চোখেই ধরা পড়েছিল। এটাই সব নয়, যুদ্ধের সময় প্রকৃতপক্ষে প্রসার ঘটেছিল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের (State Monopoly Capitalism)।

এই বিশেষ ঘটনাটি অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। রাষ্ট্র যেখানে সবসময়েই চেষ্টা করবে এমন সব নীতি অনুসরণ করতে যাতে তা সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থে কাজ করে, সেখানে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা চাইবে এমনভাবে রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে যাতে তা ছোট ছোট পুঁজিপতিদের স্বার্থের বিনিময়ে তাদের পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে।[১]

এখানে প্রধান দ্বন্দ্বের একটি সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হলো: গোষ্ঠীগত স্বার্থ এমনভাবে নিজের সর্বোচ্চ লাভের কথা ভাবে যে সামগ্রিকভাবে সেই ব্যবস্থাকেই চূর্ণ করতে উদ্যত এবং সেই ব্যবস্থাকেই আবার চিরস্থায়ী করার প্রত্যাশা—দ্বন্দ্ব এই দুই-এর মধ্যে।

সশস্ত্র হানাহানি থেমে যাবার পরেও পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যুদ্ধকালীন তেজীভাব থেকে যায়। শিয়রে তখন কোনো সমন নেই। তাহলে এটা কি এই থিসিসেরই প্রমাণ নয় যে "সংকট অতীতের বিষয় "এবং" পুঁজিবাদ ও তার সংকট বিষয়ে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ ভুল।"

সত্যি যা ঘটেছে তা হলো এই। যুদ্ধ থেমে যাবার ঠিক পরে যন্ত্র ও জিনিসপত্রের চাহিদা ( 'ক' এবং 'খ' উভয় বিভাগের উৎপাদিত সামগ্রী ) থেকেই যাবে। কারণ রাষ্ট্রের সামনে তখন যুদ্ধের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি পূরণের কাজ:

জিনিস পত্রের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করতে হবে, সারাই-এর বকেয়া কাজ শেষ করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্প ও যন্ত্রপাতি নতুন করে তৈরি করতে হবে। আমরা আগেই জেনেছি, এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি সুবিধে হয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কারণ যুদ্ধের আঘাত আমেরিকার উপর সরাসরি পড়েনি; ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু দেবার অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে আমেরিকা প্রচুর পরিমাণে মুনাফা লুটে নিল।

কিন্তু এই সুদিন শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। ১৯৪৯ সালের মধ্যেই মূলধনী সামগ্রী এবং ভোগ্য পণ্যের চাহিদা পড়ে গেল এবং এর পরে কি সংকট আসছে তা-ও উপলব্ধি করা গেল। কিন্তু এর পরেই এলো কোরিয়ার যুদ্ধ, সংগে সংগে আমেরিকার অস্ত্র বাবদ ব্যয় এবং সমরোপকরণ মজুতের পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে গেল।

এই তেজীভাবও বেশিদিন রইলো না। ১৯৫৩ সালের মধ্যেই শোনা যেতে লাগলো, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ১৯২৯ সালের মতো আবার একটি সংকট ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু এবারেও তেমন কোনো সংকট দেখা গেল না। বরং পঞ্চাশের দশকে একটা সময় পুঁজিবাদী দেশগুলোতে লগ্নীর পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এটা ঘটলো কি ভাবে?

মরিস ডব এই ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন, এবং তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৯৫০-এর দশক প্রত্যক্ষ করেছিল সেইরকম একটি প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব…যে বিপ্লব তার আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের তীব্র আগ্রহ নিয়ে লগ্নীর শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।…প্রযুক্তিবিদ্যাগত উদ্ভাবনের এই পর্ব উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের পর্যায়ের সংগে যুক্ত, যাকে আমরা জেনেছি স্বয়ংক্রিয়তা (automation) রূপে।…

আবার একরাশ থিসিসের বন্যা বইলো, সংক্ষেপে যার দাবি, পুঁজিবাদকে এতদিন যেরূপে জেনে আসা হয়েছে এখন আর সে সেই পুরোনো চেহারায় নেই। কোনো কোনো লেখক 'বিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী বিপ্লবের' কথা বললেন। 'আমেরিকান শতাব্দী'—এই পুরোনো বুলিও কপচাতে শোনা গেল।

১৯৫৯ সালের মধ্যেই অবশ্য উৎপাদনে নিশ্চলতা আবার শুরু হয়ে গেল, এবং এর গড় হার ছিল ১০৫·৬ ( ১৯৫৭=১০০ ধরে ) ১৯৬৯ সালে অবশ্য এই সূচক বেড়ে দাঁড়ালো ১৭৬·৬। মার্কিন শিল্পে বৃদ্ধির হার হলো দ্বিগুণেরও বেশি—পৌঁছে গেল পাঁচ শতাংশে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর। কিন্তু এর কারণগুলো যদি বিশ্লেষণ করি তাহলেই পরিষ্কার

বোঝা যাবে এই উদ্দীপনাও এসেছে যুদ্ধ থেকে। ষাটের দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় বেড়েছে দ্বিগুণ, বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ফলে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতেই আবার সংকট। এই সংকট সত্তরের দশকের শুরু থেকেই পুঁজিবাদী দুনিয়াকে বিব্রত করছে। জুর্গেন কুচ্‌জিয়ানস্কির ভাষায় "......পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সক্রিয় বিশেষ উপাদানগুলো দৃশ্যপট থেকে সরে যেতেই, ১৯২৯-৩৩ সালের পরে অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রথম আন্তর্জাতিক বৃত্তাকার সংকটরূপে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের নতুন অবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখা গেল।"

অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রী করে আন্তর্দেশীয় পর্যায়ে পুঁজিবাদ আজ মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে বৃত্তাকার সংকট থেকে আরো একবার পরিত্রাণ পাবার। নতুন কোনো যুদ্ধ না বাধিয়ে এই সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এই কারণেই নতুন যুদ্ধের বিপদ আজ এত বাস্তব।

পুঁজিবাদের এইসব সংকট আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোরও সংকট। পুঁজবাদী ব্যবস্থার সহজাত দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ এই সংকট দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বগুলো কি?

প্রথমত, এটা হলো উৎপাদনের উপায়ের (means of production) পুঁজিবাদী মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; এটাই পুঁজিবাদের মূল দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদীদের ভিতরকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বের ফলে আলাদা আলাদাভাবে বহু পুঁজিবাদী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে ফেলে। একচেটিয়া পর্যায়ে এই দ্বন্দ্ব থেমে থাকে না, বরং নিজেদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা সত্ত্বেও একচেটিয়াপতিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আরো প্রবল হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, এক দেশের একচেটিয়াপতির সঙ্গে অন্য দেশের একচেটিয়াপতির দ্বন্দ্ব। "পৃথিবীকে পুনরায় ভাগ করা" অথবা নিজেদের প্রভাব ও শোষণের এলাকা বাড়াবার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় দ্বন্দ্বের ফলেই দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছিল। চতুর্থত, মেট্রোপলিটন দেশগুলোর একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে উপনিবেশ এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশ-গুলোর পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব—ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় উপনিবেশ এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে এখন অল্পোন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। পঞ্চমত, বিশ্বের এক অংশে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের পর বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে।

আজকের দিনের প্রধান দ্বন্দ্ব বিশ্ব পুঁজিবাদ এবং বিশ্ব-সমাজবাদের মধ্যে ; প্রথমটি বিশ্বব্যাপী শোষণ ব্যবস্থার এবং দ্বিতীয়টি সারা বিশ্বের মুক্তির প্রতিভূ । এই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দেখা গেছে, যে-সব দেশ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে এবং যারা দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছে, তাদের বিরুদ্ধেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ঘটছে ।

মূল এই দ্বন্দ্ব বাদ দিলেও পুঁজিবাদের অন্যান্য দ্বন্দ্ব দূর হয়নি । বিশ্ব পুঁজিবাদের (সাম্রাজ্যবাদ) পান্ডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র ( সোভিয়েত ইউনিয়ন ) এবং সারা বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোনো অভিন্ন মোর্চা গড়ে উঠেনি । ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধের সময়েই পরিষ্কার বোঝা গেছে এই জঘন্য যুদ্ধে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের পাশে কেউ ছিল না । সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংঘাতে ইংগ-মার্কিন শিবির আজও কাউকে দলে টানতে পারেনি ।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আজও চলেছে । এর দ্বারা লেনিনের উক্তির যথার্থ্যই প্রমাণিত হয় ঃ অতি-সাম্রাজ্যবাদ (Super-imperial-ism) বলে কিছু থাকতে পারে না ।

ঠিক এই জাতীয় দ্বন্দ্বই লক্ষ্য করা যায় একটি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ও অন্যটির মধ্যে, আমেরিকার আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ও অন্যান্য দেশের কর্পোরেশনের মধ্যে ।

এই বিশেষ প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে দেখা যাক । সকলেই জানেন উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠন (NATO) গঠিত হয়েছিল আমেরিকা ও ব্রিটেনের অনুরোধে । এটি গঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল । 'ন্যাটো' একটি সামরিক জোট, এর লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিরোধিতা করা । অল্প কিছুদিন পরেই মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির ( আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলি ) মাথায় এলো যে, ইউরোপে অর্থনৈতিক ভিত গড়ার কাজে এই সামরিক জোটকে মদত দিলে আখেরে তাতে কাজ দেবে, কাজেই ইউরোপের একচেটিয়া পুঁজি-গুলোকে ( আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো ) একটি অর্থনৈতিক সংগঠনে সামিল করার চেষ্টা শুরু হলো । এই ভাবে ১৯৫১ সালের ১৮ এপ্রিল গঠিত হলো কয়লা এবং ইস্পাতের জন্য ইউরোপীয় গোষ্ঠী ( Europeon Commu-nity for Coal and Steel ) । এরপর ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ স্বাক্ষরিত

হলো রোম চুক্তি (Treaty of Rome)। এই চুক্তিতেই ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থা ( EEC ) গঠনের ব্যবস্থা ছিল।

অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য, মার্কিন নেতৃত্বে 'ন্যাটো'-কে অর্থনৈতিকভাবে মদত দেবার জন্য ইউরোপের আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত 'ইইসি' নিজেই ষাটের দশকে বদলে গেল, ইউরোপের আন্ত-র্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো অধিকতর শক্তিশালী হয়ে পড়লো, বাস্তবে হয়ে দাঁড়ালো মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর অর্থনৈতিক প্রতিযোগী।

বিশ্ব পুঁজিবাদী উৎপাদনে শতকরা অংশীদারত্ব কার কতটা তা থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

| | মার্কিন অংশীদারী | 'ইইসি' অংশীদারী |
|---|---|---|
| ১৯৪৮ ('ন্যাটো' গঠনের আগের বছর) | ৫৫% | ১৩% |
| ১৯৫৬ ('ইইসি' গঠনের আগের বছর) | ৪৮% | ১৩% |
| ১৯৬৪ ('ইইসি' বিদ্রোহ শুরু) | ৪৪% | ২০% |
| ১৯৭০ (বৈরতা বৃদ্ধি ) | ৪১% | ১৯%[২] |

এই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে, এই সময়ের মধ্যে মোট বিশ্ব পুঁজি-বাদী উৎপাদনে অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদীদের ( নব্যস্বাধীন দেশগুলি সহ ) অংশও বেড়ে গেছে, ফলে পুঁজিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরো তীব্রতর হয়েছে।

আমেরিকা ও 'ইইসির' মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে খোলাখুলি যুদ্ধ শুরু হতে দেখা যাচ্ছে। যে সব নিয়ে এই বাণিজ্য যুদ্ধ তার মধ্যে কৃষিজাত উৎপাদনও রয়েছে। মুদ্রার (Currency) প্রশ্নেও গুরুতর মতভেদ রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের রীতিনীতি ও কৌশল নিয়েও উভয়ের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়।

আমেরিকা এবং 'ইইসি'র মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব রয়েছে তেমনি 'ইইসি'র শরিকদের নিজেদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। যেমন, 'ইইসি'র নয়জন শরিকের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী পশ্চিম জার্মানি (FRG) ও ব্রিটেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এছাড়াও রয়েছে রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে চতুর এবং সবচেয়ে মার্কিন-বিরোধী ফ্রান্স ও অন্যান্য শরিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সাম্প্রতিককালে বিশেষ একটি প্রবণতা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাচ্ছে; বহু আন্তর্জাতিক প্রশ্নে ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্মানি সহমত পোষণ করছে, এবং প্রকাশ্য মার্কিন-ঘেঁষা নীতি অনুসরণের ফলে ব্রিটেন ক্রমেই একঘরে হয়ে পড়ছে। ইতালী ও

অন্যান্য দুর্বলতর শরিকরা নানা ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নে দোদুল্যমান মানসিকতার পরিচয় দিয়ে থাকে।

এবার ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ও তাদের আচরণের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। সকলেই জানেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে অরাজকতার রাজত্ব। এর ফলে বিশ্ব বাণিজ্যের বাজারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের (আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তা আরো প্রবলতর হয়ে ওঠে। বিগত ১৫০ বছর ধরে এক ধরনের মুদ্রাই বাজারে সর্বদা চালু ছিল, এই মুদ্রা ছিল স্থিতিশীল ; এই মুদ্রা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য বিচার হতো। প্রথমে ছিল পাউন্ড স্টার্লিং এবং পরে মার্কিন ডলার। পরবর্তীকালে ডলার বিশ্বে তার প্রাধান্য হারিয়েছে। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের ফলে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হয়েছে। আজ সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কোনো বিশেষ একটি মুদ্রা নিরাপদ নয়। স্থিতিশীল একমাত্র আন্তর্জাতিক মুদ্রা হচ্ছে স্বর্ণমান। বহু দেশ, বিশেষ করে আমেরিকা সোনাকে মুদ্রার জগত থেকে বাইরে রাখার চেষ্টা করে পাগলামি বিধিবন্ধ করার প্রয়াস পাচ্ছে। এর ফল হয়েছে এই যে, বিশ্ব মুদ্রা বাজারে অরাজকতার ফলে ঘরোয়া বাজার-দরেও দেখা দিয়েছে পুরো পুরি মাৎস্যন্যায়।

এই উভয় উপাদানই একে অপরের উপর ক্রিয়া করে। ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে ব্রিটেনে ঘরোয়া বাজারে মুদ্রাস্ফীতি প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়ায় পাউণ্ডের আরো অবমূল্যায়ন ঘটাতে হয়। অন্যদিকে, ১৯৭৩ সালে ডলার-এর অবমূল্যায়নের ফলে আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে যায়। দেখা গেছে প্রধান ছটি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে মাত্র একটিতে (FRG) মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১১ শতাংশের কম, এবং সবচেয়ে বেশি ছিল দুটি দেশে—২০ শতাংশ।

১৯৭০ থেকে ১৯৭২ এই দুবছরে পাউন্ড স্টার্লিং ছাড়া আর সব মুদ্রাই ডলারের তুলনায় মূল্য বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ এবং ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ এই সময়ের মধ্যে ডলারের তুলনায় পাউন্ড স্টার্লিং এবং ইতালীর লিরা-র মূল্য হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ফরাসী ফ্রাঁ এবং জাপানী ইয়েন-এর চেয়ে ডলারের মূল্য কম। ফেডারেল জার্মান মার্ক-এর চেয়েও ডলারের মূল্য অনেক কমে গেছে।

মুদ্রা হিসাবে ডলারের এই ক্ষতিস্বীকারের কারণ ভিয়েতনাম যুদ্ধোত্তর মার্কিন অর্থনীতির দুরবস্থা ; ইতালীর অর্থনীতিতে যে ব্যাপক দুর্নীতি চলেছে তারই ফল হিসেবে কমেছে লিরার দাম ; পাউন্ড স্টার্লিং-এর দাম

কমেছে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের চেয়ে ব্রিটিশ অর্থনীতি পিছিয়ে পড়ায়, তাছাড়া উপনিবেশগুলো একে একে হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ায় ধীরে ধীরে তারও প্রভাব সমগ্র অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়ছে ; আলজিরিয়ার যুদ্ধ শেষ হবার পর ফরাসী অর্থনীতি খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, ফলে ফ্রাঁ-র দামও বেড়েছে ; ফেডারেল জার্মানির মার্ক এবং জাপানের ইয়েন-এর মধ্যেও খানিকটা দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে।

প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলোর সব মুদ্রাই তাদের বাণিজ্য যুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ফলে বিশ্বের বাজারে এইসব দেশগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আরো তীব্রতর হয়। যে-সব দেশ মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই ভেবেছিল যে-সব দেশ মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটায়নি তাদের যেসব অসুবিধা থেকে গেল সেই সব দেশের অনুপাতে বিশ্বের বাজারে তাদের পণ্য বিক্রী করা সহজতর হবে। এই ঘটনাটি নতুন। ১৮০০ থেকে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সকলেই মনে করতো যে দেশ মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটায় সে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল, আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু এর পর থেকে বিশ্বের বাজারে নিজের অবস্থানের উন্নতি ঘটানোর জন্য অবমূল্যায়ন প্রতিযোগীর একটি কৌশল বলে গণ্য হলো। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের এ আর একটি পরিচয়।

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের নতুন পর্বে দু'বার ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটে ঃ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে এবং ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে। ডলারের এই অবমূল্যায়নের বাস্তব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ফেডারেল জার্মান মার্কের তুলনায় দাম যে ১৫ শতাংশ কমানো হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই একটি কৌশল। কৌশলটি আমেরিকা নিয়েছিল বাজারে সুবিধে পাবার জন্য। অনান্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ডলারের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ সুরু করায় অবশ্য ১৯৭৫ সালের মার্চ থেকে আগস্টের মধ্যে ডলারের দাম ১১ শতাংশ বাড়াতে হয়েছিল। এই আক্রমণ প্রধানত চালিয়েছিল ফেডারেল জার্মান আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো। কারণ ঐ কৌশলে বিশ্বের বাজারে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো বিশেষ সুযোগ সুবিধে লুটে নিচ্ছে এটা তাদের মনঃপূত ছিল না।

বিশ্বের বাজারে বাণিজ্য যুদ্ধের সংগে সংগে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো ঘরের বাজারেও অতি-উৎপাদনের (Over-production) জটিল সমস্যার মুখো-

মুখি হয়েছে। প্রথম এই সংকটের মুখোমুখি হয় মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো। আমেরিকায় এই সংকটের শুরু ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে। তারপর একে একে জাপানে (১৯৭৪, গ্রীষ্ম), পশ্চিম জার্মানিতে (১৯৭৪, গ্রীষ্ম), গ্রেট ব্রিটেনে ( ১৯৭৪, শরৎ ), ফ্রান্সে ( ১৯৭৪, শরৎ ) এবং ইতালীতে ( ১৯৭৪, শরৎ )।[৩]

ঘরে বাজারের সংকট, অন্তত সাময়িকভাবে হলেও, কাটিয়ে ওঠার অন্যতম পথ হলো আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর কাজকর্ম এক বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। 'মস্কো ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড ইকনমিক্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশানাল রিলেশন্স'এ ভাষণ দেবার সময় বি. কোমসিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের জনৈক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, "আমাদের উৎপাদিকা শক্তিকে বেশ কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং প্রতিটি দেশে আমাদের যেসব কারখানা থাকবে বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে বিশেষ ধরনের সামগ্রী উৎপাদিত হবে, আর এইভাবেই আমরা সত্যিকার স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে পারব, অর্থনৈতিক অস্থিরতা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশের ক্ষতি করলেও তা আমাদের স্পর্শ করবে না। ১৯৬২ সালে ইতালীতে, ১৯৬৬ সালে পশ্চিম জার্মানিতে এবং ফ্রান্সে, ১৯৬৮ সালে যে সংকট দেখা দিয়েছিল আমাদের কর্পোরেশন এভাবেই তা থেকে আত্মরক্ষা করেছিল। শুধু কি তাই, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকার অর্থনীতিতে যে মন্দা চলেছিল তখনো আমাদের কর্পোরেশনের গড় কাজকর্ম বৃদ্ধির হার ১৬-১৮ শতাংশের নিচে নামেনি।"

কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক সংকট শুরু হয়, যেমন এখন হয়েছে, তখন আর আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো এই কৌশল আঁকড়ে থাকতে পারে না। আজকের পরিস্থিতিতে, যখন সব কটি বড় বড় পুঁজিবাদী দেশই সংকটে ক্ষতবিক্ষত, তখন মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোও অশেষ সংকটে কবলিত। এবং পশ্চিম জার্মান চ্যান্সেলর হের স্মিড-এর মতে, আমেরিকা যতদিন না এই সংকট থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে ততদিন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের অর্থনীতিতে কোনো উন্নতি আশা করতে পারে না।

ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক, দুই বাজারেই মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন-গুলো সমান গভীর সংকটে পড়েছে। গ্যাস হল-এর হিসেব অনুযায়ী [illegible] দেশের মাটিতে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর যে-সব শিল্প [illegible] তাতে "২০০ শত কোটি ডলার মূল্যের সামগ্রী উৎপাদিত হয়" এবং [illegible] বিক্রী হয়; কিন্তু "তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর একটা বিরাট অংশ আ[illegible]রি

সামগ্রীর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য জাহাজে করে আবার আমেরিকাতেই ফিরে আসে।" ২০০ শত কোটি ডলার মূল্যের সামগ্রী মানে মার্কিন রপ্তানীর প্রায় পাঁচ গুণ বেশি জিনিসপত্র ; মূল্যের দিক থেকে বিশ্বের সব কটি শিল্পোন্নত দেশের রপ্তানিমূল্যের চেয়েও বেশি। এবং গ্যাস হল আরো বলেছেন, "বিদেশে এই লগ্নীর ফলে আমেরিকার ৩০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।"

মার্কিনী আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো বিদেশে নতুন ১০০০০-টি সহায়ক-সংস্থা স্থাপন করেছে। অতীতে প্রধান মার্কিনী কর্পোরেশনের এই ধরনের সহায়ক সংস্থাকে, মোটামুটি, বলা যেত উপাঙ্গ। আজ আর তা বলা যায়না। আজকের পরিস্থিতিতে এই সব সহায়ক-সংস্থাগুলো পুঁজিবাদী শ্রমবিভাজনের নতুন উচ্চতর পর্যায়ের প্রতিভূ এবং এগুলো একচেটিয়াপতিদের কাছে আরো অপরিহার্য।

লক্ষ্য করার বিষয়, যাকে বলা হয় আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য, তার প্রায় ৫০ শতাংশই আমেরিকা ভিত্তিক আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন এবং তাদের বিদেশী লাইসেন্সধারী পেটেন্টের অধিকারী এবং বিদেশের অন্যান্য যেসব কোম্পানীর সঙ্গে বিলিব্যবস্থা রয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় সমান সমান ভাবে রপ্তানী ও আমদানী হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হয়। ( ন্যাট গোল্ডফিঙ্গার : "মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীজ অ্যান্ড দেয়ার এফেক্ট অন দি আমেরিকান ইকনমি")। এইভাবে "আমেরিকান বৈদেশিক বাণিজ্যের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ এখন আন্তঃ কোম্পানী লেনদেনের সাহায্যে গঠিত"।[৪] এছাড়াও আরো আছে, ১০০টিরও বেশী দেশে যেখানে জেনারেল ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেখানে জি. ই. সি. এবং অন্যান্যরা "খোদ আমেরিকাতেই কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে।"[৫]

মার্কিন কর্পোরেশনগুলো যখন সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তাদের থাবা সম্প্রসারিত করছিল তখন আমেরিকাতে কিন্তু ঘরোয়া বাজারে "বিদেশী প্রতিযোগিতা" গণ্য করার মতো বিষয়ই হয়ে উঠতে পারেনি। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের প্রেক্ষাপটে আজ কিন্তু এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর মধ্যে একটি বিচিত্র স্ববিরোধিতা রয়েছে : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যার ভিত রয়েছে সেই একই আন্তর্দেশীয় কোম্পানি একই সঙ্গে ঘরের বাজারে প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। একে পাগলামী ছাড়া আর কি বলা যায় ? আর এই বিচিত্র প্রতিযোগিতার ফলে আমেরিকাতেই আমেরিকার শিল্পের হাড়ে বাতাস লাগছে।

কাজে কাজেই এইসব প্রচারে নামতে হয়, "আমেরিকার তৈরি জিনিস কিনুন," "আমেরিকায় তৈরি জিনিসের ব্যবহার বাড়ান", ইত্যাদি।

ইত্যবসরে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কিন্তু তাঁদের নিংড়ে আদায় করার কাজে বিন্দুমাত্র কামাই দেয় না। ঘটনাটা এইভাবে ঘটে : রাষ্ট্রকে অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী বেশি পরিমাণে সরবরাহ করার সময় একচেটিয়াপতিরা (অর্থাৎ আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলি) রাষ্ট্রের কাছে অত্যধিক দাম দাবি করে এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভরতুকি পায় এবং কয়লা ও বিদ্যুতের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পজাত উৎপাদনের জন্য ও রেলে মালভাড়া বাবদ সবচেয়ে কম দাম দেয়।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলির প্রতি রাষ্ট্রের এ-হেন বদান্যতায় এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, আদায় করা কর-এর সাহায্যে আর সরকারী ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব হয়ে ওঠে না। (গাস হল যে তথ্য নথীভুক্ত করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকায় ফেডারেল ট্যাক্স-এর ৭০ শতাংশই দিয়ে থাকেন দেশের শ্রমজীবী মানুষ, আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলো দেয় ৩০ শতাংশ।) কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলো এইভাবে আরো ঋণে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্য ঋণ পেতে গেলে সরকারকে অবশ্যই এবিষয়ে সুনিশ্চিত হতে হবে যে ঋণের প্রবাহে কোনো থামতি নেই। এর জন্য আবার অর্থ চলাচলের (money in circulation) পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন এবং যার অনিবার্য ফল মুদ্রাস্ফীতি।

মুদ্রাস্ফীতির মধ্যেও কিন্তু আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলো সর্বোচ্চ মুনাফা লুটতে থাকে, আর চাকুরীজীবীরা ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগোতে থাকে। অন্যদিকে ফেডারাল ঋণের পরিমাণ বছর বছর বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সালে আমেরিকায় ফেডারাল ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৪৪.১ শত কোটি ডলার। ১৯৫৫ ও ১৯৩৫ সালে এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭৪.৪ শত কোটি ডলার এবং ২৮.৭ শত কোটি ডলার।

এর ফলেও কিন্তু আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলির ঝুলিতে বাড়তি মুনাফা ঢুকবে, মাইনে করা লোকেদের কপালে যেমন জুটবে বাড়তি দুর্ভোগ (আমেরিকায় করদানের বাধ্যবাধকতা যথাক্রমে ৩০ ও ৭০ শতাংশ)।

এর অনিবার্য পরিণতি অতি-উৎপাদন এবং এই চক্রাবর্তন চলতেই থাকে।

'ক' বিভাগে মন্দা তো আছেই, সেই সঙ্গে 'খ' বিভাগেও গুরুতর অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে আমেরিকায় স্থায়ী বেকারের সংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষ।[৬] সেখানে প্রায় ৪ কোটি মানুষ দারিদ্র্য ভোগ করে। মুনাফা

বিদেশে লগ্নী হয়ে যাওয়ায় দেশে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়ে। দেখা গেছে, যেসব কারণে আমেরিকায় হাল্‌কা যাত্রীবাহী গাড়ি খুব বেড়ে গেছে তার অন্যতম কারণ হলো, আমেরিকা-নিয়ন্ত্রিত কারখানায় উৎপাদিত ছোট ইওরোপীয় গাড়ি আমেরিকায় বিক্রী করা। বলা বাহুল্য, আমেরিকার মোটর গাড়ি শিল্পে কর্মহীনতার সমস্যা এতে বাড়ে বই কমে না।

গাস হল-এর মতে মোট ব্যক্তিগত ও সরকারি ঋণের পরিমাণ আকাশছোঁয়া দুই ট্রিলিয়ন ডলারে (১ ট্রি.=১,০০০$^{৩}$) গিয়ে পেঁছেছে। ঋণের সুদ বছর বছর দিতে হয়। তা-ও গিয়ে পড়ে সেই একই দেবতার পায়ে, সেই আদি ও অকৃত্রিম আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন। সুদের অর্থ যোগাচ্ছেন, বলা বাহুল্য, আমেরিকার জনগণ। এই সব ঋণের বার্ষিক সুদের পরিমাণ প্রায় ৫০ শত কোটি ডলার।

এই সব কিছুর মিলিত ফল অতি উৎপাদনের সাধারণ ও সার্বিক সংকট। কেবল সমর শিল্পের সম্প্রসারণ ও নতুন বিনিয়োগ অতি-উৎপাদনের সার্বিক সংকট দূর করতে পারে না, বরং সামরিক খাতে এই বিপুল ব্যয় বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মুদ্রাস্ফীতিকেই বাড়িয়ে দেবে।

মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লোভে আমেরিকাতেই কি ধরনের জটিলতা ও সংকটের সৃষ্টি করেছে তা জাপানের অগ্রগতির উদাহরণ নিলেই বোঝা যাবে। জাপানী আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতার ফল আজ আমেরিকার ঘরোয়া বাজার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এটা আসলে পুঁজিবাদের অসম বিকাশ এবং ফলস্বরূপ তার আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বেরই আর একটি প্রকাশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকাই জাপানের অগ্রগতি ও বিকাশে উৎসাহ জুগিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ইউরোপে জার্মানি এবং প্রাচ্যে জাপান সবসময়েই একটা বিশেষ স্থান পেয়ে আসছে। এখন আর একথা গোপন নেই যে, হিটলারের ফ্যাসিস্ত শাসন আমলেও আমেরিকা জার্মানীকে অস্ত্র দিয়েছে এবং হিটলারের শিল্প ও সামরিক যন্ত্র বিকাশে যাবতীয় সাহায্য দিয়েছে।

আর আজ পুঁজিবাদী শিবিরভুক্ত জাপান এবং জার্মানি উভয়েই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। শত হলেও, মার্কসবাদী বিজ্ঞানের ভূরি ভূরি সমালোচনা করলেই তো আর পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠা যায় না। আসলে জাপান আর পশ্চিম জার্মানির অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বিশেষত, নতুন পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদী পিরামিডে জাপানের অবস্থানকেই বদলে দিয়েছে। সত্তর দশকের গোড়ায় জাপান পুঁজিবাদী দুনিয়ায় দ্বিতীয় শিল্পোৎপাদন জাতিতে পরিণত হয়েছিল। উৎপাদনের মাত্রা ছিল মার্কিন উৎপাদন স্তরের ৩৬ শতাংশ এবং পশ্চিম জার্মানির ১৫৭ শতাংশ। জাপানের বৃদ্ধির হার যদিও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

তেল এবং কম্পিউটার ছাড়া সব বড় বড় শিল্পের উপর জাপান প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ রেখে দিয়েছে,—পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো তা করেনি। আর তার ফলেই দেখতে পাচ্ছি, সরাসরি মার্কিন লগ্নী যেখানে ব্রিটেনে ৭২ শত কোটি ডলার, পশ্চিম জার্মানিতে ৪৩ শত কোটি ডলার, ফ্রান্সে ২০ শত কোটি ডলার, ইতালীতে ১'৪ শত কোটি ডলার, সেখানে জাপানে মাত্র ১ শত কোটি ডলারের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যে-সব দেশে মার্কিন বিনিয়োগের পরিমাণ কম, সে-সব দেশে বৃদ্ধির হার বেশি।

জাপানী আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো অবশ্য তাদের পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার সঙ্গেই থাকে, তবু তাদের নিজেদের উচ্চাকাংক্ষা রয়েছে। এর পরিচয় পাওয়া যাবে বিদেশে জাপানী লগ্নীর ক্রমবর্ধমান হার-এ। ১৯৬০ সালে বিদেশে জাপানী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র ৯'৪ কোটি ডলার ; কিন্তু ১৯৭০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ালো ৯৬'৮ কোটি ডলারে। কেবল ইন্দোনেশিয়াতেই জাপানী আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো ৬৫টি প্রকল্পে ২৫'৯ কোটি ডলার লগ্নী করেছে ; ওই দেশে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর লগ্নীর পরিমাণ, ৫৮টি প্রকল্পে ৫২'৮ কোটি ডলার। জাপানী আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলি আজ থাইল্যান্ডে পয়লা নম্বর, হঙকঙে দু' নম্বর এবং মালয়েশিয়ায় পয়লা নম্বর শোষক। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশ সম্পর্কেও তাদের ওই বিশ্লেষণে বিশেষিত করা যায়।[৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে পশ্চিম জার্মানিতে আছে তিনটি এবং জাপানে আছে তিনটি। বৃহত্তম জার্মান আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন হলো ভক্সওয়াগেন, সিমেন্স এবং হোয়েস্ট আর জাপানের হলো নিপ্পন স্টিল, হিতাচি, ইলেকট্রিক্স ও টয়েটো মোটরস্।

প্রসঙ্গত, জার্মান ভক্সওয়াগেনের নিজস্ব কাহিনীটি শুনবার মতো। ছোট এই গাড়িটির আংশিক পরিকল্পনা ও নক্শা তৈরি করেছিলেন অ্যাডল্ফ হিটলার। তিনি চেয়েছিলেন নাৎসি 'শিল্পায়ত সমাজতন্ত্রের' নমুনা হিসেবে

এই গাড়িটি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবেন। উৎসাহটা তাঁর মনে জেগেছিল হেনরি ফোর্ডের জীবনী পড়ে। যাই হোক, হিটলার কিন্তু তাঁর স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ দেখে যেতে পারেননি কারণ ১৯৪৫ সালের আগে ভক্সওয়াগেন কারখানা থেকে বেরোতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ দখলদারী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে এটি তৈরি হয়েছিল। ভক্সওয়াগেনের ইকুইটি শেয়ারের ৪০ শতাংশ আজ জার্মান ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের।[৮]

জাপানেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রণালয় চেষ্টা করছে জোর করে ছোট ছোট মোটর কোম্পানীগুলোকে টয়োটা এবং নিশান-এর অন্তর্ভুক্ত করতে। কিন্তু জাপানের ছোট ছোট মোটর কোম্পানীগুলিকে এখনো বাগে আনা যায়নি, তারা ভালোই ব্যবসা চালাচ্ছে। এই রকম একটি কোম্পানি হোন্ডা মোটরস। এর স্থাপয়িতা সোইচিরো হোন্ডা-ই এটা চালান। তিনি পেশায় ইনজিনিয়ার। এই কোম্পানি সাধারণত মোটর সাইকেল তৈরি করে কিন্তু সম্প্রতি এখন একটি মোটর গাড়ি বের করেছে যা খুবই অভিনব। আর একটি ছোট কোম্পানি টোয়ো কোগিয়ো ওয়াঙ্কেল ইন্‌জিন প্রবর্তনে সাহায্য করেছে। এর ব্যবসাও ভালোই চলছে।

অতি উৎপাদনের ঘটনাটি উৎপাদন ও বাজারের মধ্যে সত্যিকারের একটি দ্বন্দ্ব—যে বাজার জনসাধারণের নিয়ন্ত্রিত ভোগের দ্বারা নির্ধারিত। মার্কসের ভাষায়, "সকল রকমের প্রকৃত সংকটের পিছনেই চূড়ান্ত কারণ হিসেবে সর্বদা থেকে যায় দারিদ্র্য এবং জনসাধারণের নিয়ন্ত্রিত ভোগের ক্ষমতা, যার বিপরীতে রয়েছে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশে পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রচেষ্টা, যেন সমাজের চূড়ান্ত ভোগের ক্ষমতাই একমাত্র তাদের সীমারেখা স্থির করে।"[৯]

অতি-উৎপাদনের ঘটনাটি পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়, এটি পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সহজাত। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে' (Communist Manifesto) মার্কস এবং এঙ্গেলস একে এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"এই সব সংকট একটা মহামারীর আবির্ভাব ঘটে—অতি-উৎপাদনের মহামারী। আগেকার যুগে এমন ঘটনা অসম্ভব বলেই বিবেচিত হত। সমাজ সহসা সাময়িকভাবে নিজেকে একটা বর্বর অবস্থার মধ্যে আবিষ্কার করে; মনে হয় যেন একটা দুর্ভিক্ষ, একটা বিধ্বংসী যুদ্ধ প্রাণ ধারণের প্রতিটি রসদের সরবরাহ ছিন্ন করে দিয়েছে; যেন শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে সভ্যতার বাড়াবাড়ি, প্রাণ ধারণের রসদের বাড়াবাড়ি, শিল্পের বাড়াবাড়ি এবং বাণিজ্যের বাড়াবাড়ি। সমাজের হস্তগত

উৎপাদনী শক্তিগুলো বুর্জোয়া সম্পত্তি বিকাশের অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে না। বরং তার উল্টোটা। তারা এত বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে নির্দিষ্ট অবস্থা তাদের ধরে রাখতে পারছেনা বরং অবস্থাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের প্রতিবন্ধক : এবং যে মুহূর্তে তারা তাই বাধা অতিক্রম করছে, সেই মুহূর্তেই সমগ্র বুর্জোয়া সমাজে বিশৃংখলার আবির্ভাব ঘটাচ্ছে, বুর্জোয়া সম্পত্তির অস্তিত্ব বিপন্ন করছে। তাদের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ ধরে রাখার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা একেবারেই অপ্রতুল। বুর্জোয়ারা এই সংকট কাটিয়ে ওঠে কি ভাবে? একদিকে তারা উৎপাদনী শক্তিগুলোকে জোর ক'রে ধ্বংস করে, অপরদিকে নতুন নতুন বাজার জিতে আনে এবং পুরোনো বাজারগুলোকে আরও ব্যাপকভাবে শোষণ করে। অর্থাৎ কিনা, তারা আরও ব্যাপক এবং আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথ প্রশস্ত করে এবং যে সব উপাদান সংকট নিবারণ করে, সেই সব উপাদান হ্রাস পাইয়ে দেয়।"

## সূত্র ও উল্লেখ পঞ্জী


১ মরিস ডব : **ক্যাপিটালিজম— ইয়েসটার ডে এন্ড টুডে**

২ জারগেন কুচজিনস্কি : **ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ক্রাইসিস্ অব ক্যাপিটালিজম**

৩ পূর্বোক্ত গ্রন্থ

৪ গ্যাস হল : **ইম্পিরিয়ালিজম টুডে**

৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ

৬ **ওয়ার্ল্ড ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট**

৭ জারগেন কুচজিনস্কি : **ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ক্রাইসিস অব ক্যাপিটালিজম**

৮ গ্রাহাম বান্নক : **দ্য জাগার ন্যাটস্**

৯ কার্ল মার্কস : **ক্যাপিটাল**, খণ্ড ৩

সপ্তম অধ্যায়

# পায় সবচেয়ে বেশি, তবু আরো চাই, আরো চাই

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সহায়ক সংস্থাগুলোর অন্যান্য নীতির মতো আর্থিক নীতিও মুখ্যত মূল কোম্পানির স্বার্থ ও উদ্দেশ্যনির্ভর। কাজেই প্রায় সব সময়েই দেখা যায় সকল সহায়ক সংস্থাগুলো যে-দেশে বসে ব্যবসা করছে সে-দেশ থেকে পুঁজি রপ্তানী করছে। আরও একটা কাজ এরা করে থাকে, তাহলো স্থানীয় বাজার থেকে অর্থ আদায়। এর ফলে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সহায়ক সংস্থাগুলো যে-সব দেশে বসে ব্যবসা করছে সে-সব দেশ সব দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মতিগতির পরিচয় খুব সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন মার্কিন কণ্টিনেণ্টাল অয়েল-এর প্রেসিডেণ্ট জন জি. ম্যাকলিন ; তিনি বলেছেন, "বিদেশের মাটিতে আমরা দেখতে চাই, প্রতিটি গামলা তার নিজের তলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।" অন্যভাবে এর মানে দাঁড়ায় প্রতিটি সহায়ক সংস্থাই নিজের প্রয়োজনমত অর্থ যোগাতে সমর্থ থাকবে—নিজের তহবিল থেকে দেবে, না, স্থানীয় বাজার থেকে ধার করবে, তা তার নিজের ব্যাপার—এবং মূল কোম্পানিকে নিয়মিত লাভের কড়ি যুগিয়ে যাবে। কাজেই এটাই রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে যে, সহায়ক সংস্থাগুলো থেকে অর্থের প্রবাহ মূল কোম্পানির দিকেই বয়ে যাবে—বিপরীত ঘটনাটা কখনো ঘটবে না।

১৯৬৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Chase Manhattan Bank যে হিসেব করেছিল তা থেকে এই প্রক্রিয়ার একটা চিত্র পাওয়া যেতে পারে। ওই হিসেব অনুযায়ী, "সাম্প্রতিককালে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো বিদেশে কাজকর্ম চালাবার জন্য যে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে তার মোটামুটি ৪০ শতাংশ আসে বিদেশেই প্রাপ্ত নগদ অর্থ থেকে, ৩৫ শতাংশ আসে বিদেশের বাইরের উৎস থেকে, এবং ২৫ শতাংশ আসে আমেরিকা থেকে পুঁজি পাঠানোর সূত্রে।" ক্রিস্টোফার তুগেনহাট বলেছেন, "যেদিন থেকে মার্কিন সরকার আমেরিকা থেকে পুঁজি বাইরে বেরিয়ে যাবার উপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ আরোপ

করেছে সেদিন থেকেই যে বিদেশী উৎস থেকে পাওনার পরিমাণ আরো বেড়ে গেছে তাতে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই।"[১]

তুগেনহাট আরো দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ মালিকানাধীন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো প্রতি বছর বিদেশে তাদের বিনিয়োগের প্রায় ৭০ শতাংশ অর্থই পেয়ে থাকে তাদেরই বিদেশী সহায়ক সংস্থাগুলোর না-পাঠানো মুনাফা থেকে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে ব্রিটেনে অবস্থিত ১১৫টি বিদেশী সহায়ক সংস্থা থেকে লভ্যাংশের আকারে যে পরিমাণ পুঁজি বাইরে পাচার হয়ে গেছে, তা ওই সময়ের মধ্যে উপরোক্ত ১১৫টি সহায়ক সংস্থা তাদের মূল কর্পোরেশন এবং অনুমোদিত কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে পাওয়া অর্থের চেয়ে দেড় গুণেরও বেশি। ব্রিটেনেই যদি এরকম ঘটতে পারে তাহলে তার চেয়ে কম উন্নত দেশ-গুলোতে, ধরা যাক ভারতে, যে কি বিপুল শোষণ চলছে, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রথানুগ তহবিল পাচার ছাড়াও রয়েছে রয়্যালটি এবং সার্ভিস পেমেণ্ট। সব মিলিয়ে শোষণের এলাহি বন্দোবস্ত। একবার গেড়ে বসতে পারলে বিদেশী সহায়ক সংস্থাগুলো পুঁজি রপ্তানীর কাজে এক একটি রাঘব বোয়াল।

কখনো কখনো অবশ্য মূল কোম্পানি ( আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সদর দপ্তর ) তার বিদেশস্থ সংস্থার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করে। আমেরিকার ক্রাইসলার এরকম একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে ব্রিটিশ সরকার দেখলেন, দেশের অন্যতম প্রধান গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা রুটস মোটরসকে (Routes Motors) হয়তো বন্ধ করে দিতে হতে পারে, কারণ কোম্পানি চালাবার মতো অর্থের কোনো বন্দোবস্ত নেই। অন্যান্য ব্রিটিশ মোটর কোম্পানিগুলোকে বলা হলো রুটস-কে সাহায্য করতে। কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না। শেষ পর্যন্ত রুটস চলে গেল ক্রাইসলারের নিয়ন্ত্রণে। পরে পুরো কোম্পানির নাম হলো 'ক্রাইসলার ইউনাইটেড কিংডম'।

ফল কিন্তু ভালো হলো না, না আমেরিকার পক্ষে না ব্রিটেনের পক্ষে। আমেরিকায় ক্রাইসলার পড়লো সংকটে। তার ঢেউ গিয়ে পড়লো আমেরিকার শ্রমিকদের উপর। তাঁরা চাকরি খোয়ালেন। ব্রিটেনের ক্রাইসলার রুটসকে নিয়ে নেবার পর মজুরি দেবার পদ্ধতি বদলে গেল। হস্তান্তরের অব্যবহিত পরেই কর্তৃপক্ষ 'daily time study' চালু করলেন। এতে ব্রিটিশ শ্রমিকদের ভাগ্যে কম মজুরি জুটলো।

যেসব দেশ আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সহায়ক সংস্থাগুলোকে ব্যবসা করার সুযোগ দিয়েছে, মূল কোম্পানির তহবিল হস্তান্তরনের নীতির ফলে

তারা প্রায় সর্বদাই ক্ষতিস্বীকার করে থাকে। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কিছুদিন আগে আমেরিকার একটি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন দেখলো পর্তুগালে তাদের যে সহায়ক সংস্থাটি রয়েছে সেটি ঠিকমতো পুঁজির যোগান না হওয়ায় খুবই ঝামেলায় পড়েছে। সদর দপ্তর থেকে ব্রিটিশ এবং পশ্চিম জার্মান সহায়ক-সংস্থাকে বলা হলো, তারা যেন পর্তুগীজ সংস্থাটিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দেয় এবং এই বাবদ এক বছরের মধ্যে তারা যেন কোনো দাম আদায় না করে, তা-ও বলে দেওয়া হলো। এতে পর্তুগীজ সহায়ক সংস্থাটির উপকার হয়েছিল ঠিকই কিন্তু স্বার্থের হানি ঘটেছিল ব্রিটিশ এবং পশ্চিম জার্মান সংস্থা দুটির। বলা বাহুল্য, মূল কোম্পানির গায়ে আঁচটুকুও লাগলো না।

কখনো কখনো আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো ঠিক করে, কোনো কোনো দেশে অবস্থিত তাদের সহায়ক সংস্থাগুলোর অর্থ-তহবিল তারা ফিরিয়ে নেবে। এরকম ঘটনা ঘটলে তার ফল হয় খুবই সুদূরপ্রসারী। ব্রিটেনে এমনটি ঘটেছিল, ফলে সেখানে ১৯৬৪-৬৫ সালে স্টার্লিং অবমূল্যায়নের আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। ব্রিটেনে অবস্থিত বিদেশী-মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থাগুলো তাদের আয়ের পুরোটাই ( ১০০ শতাংশ ) পাঠিয়ে দিয়েছিল তাদের মূল কোম্পানিগুলোর কাছে। সহায়ক সংস্থাগুলোকে নির্ভর করতে হয়েছিল স্থানীয় বাজারে যতটুকু ধার পাওয়া যায় তার উপর। ব্রিটেন দুদিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

যে-সব দেশ অতিরিক্ত পরিমাণে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের মুখাপেক্ষী তাদের এমন সমস্ত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয় যা সচরাচর ঘটে না। একটা সময় আসে যখন, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো খোদ যে দেশের সে দেশের সরকার তার আর্থিক নীতি বদলে ফেলে, তখন যে-সব দেশে ঐসব আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সহায়ক সংস্থাগুলো ব্যবসা করছে সে-সব দেশ একেবারে ভরা-ডুবির মুখোমুখি হয়। মার্কিন এবং ব্রিটিশ উভয় সরকারই তাদের দেশে অবস্থিত আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে বারংবার বলছে তারা যেন তাদের পুঁজি রপ্তানীর পরিমাণকে সর্বনিম্ন সীমায় নামিয়ে আনে এবং একই সঙ্গে বিদেশের বাজারে তা যে আয় করছে তার একটা বড় অংশ দেশে নিয়ে আসে। দেশের বাজারে সঙ্গতির অভাবের ফলেই উভয় সরকারকে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, এমনকি মার্কিন সঙ্গতিও সীমাহীন নয়, বরং তাকেও আর্থিক সঙ্গতির ক্ষেত্রে সংকটের মুখোমুখি হতে হয়। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলির পিতৃভূমির সরকার এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ

করলে, যে-সব দেশে তাদের সহায়ক সংস্থাগুলো ব্যবসা করছে সে-সব দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

১৯৬৮ সালে বেলজিয়ামে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল দৃষ্টান্ত হিসেবে সেটি অনবদ্য।[২] প্রেসিডেন্ট জনসন আমেরিকা থেকে পুঁজি রপ্তানীর স্থগিতাদেশ জারী করলেন। (প্রসঙ্গত, ভিয়েতনাম আক্রমণ ও যুদ্ধের ফলে মার্কিন অর্থনীতি যে গভীর সংকটে পড়েছিল এই ঘোষণা তার একটি প্রমাণ।) 'ইইসি' দেশগুলোতে আমেরিকান পুঁজি রপ্তানী বন্ধ হয়ে গেল। জনসন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত সবচেয়ে বেকায়দায় ফেললো বেলজিয়ামকে। এতদিন বেলজিয়ামই ছিল মার্কিন আন্তর্দেশীয় বিনিয়োগের সবচেয়ে সুবিধাজনক দেশ। প্রায় আট বছরে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো বেলজিয়ামে ১০০ কোটি ডলার লগ্নী করেছে। বেলজিয়ামের অর্থনীতিতে আমেরিকান আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে; নির্মাণশিল্পে দেশের মোট বিনিয়োগের এক তৃতীয়াংশই তাদের দখলে। কাজেই বেলজিয়ামের শিল্পায়িত অর্থনীতিতে মার্কিন পুঁজির অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। কাজেই মার্কিন সিদ্ধান্তে সে নিতান্ত অসহায় বোধ করলো। ব্রাসেলসে দেখা গেল আতঙ্ক।

প্রেসিডেন্ট জনসনের গৃহীত ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, তাই ভরাডুবি থেকে বেলজিয়াম রক্ষা পেল। কিন্তু এর শিক্ষা খুব স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ন। "কোনো দেশ যখন বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন কোম্পানির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন সে, ওই সব কোম্পানির স্বদেশী সরকারের একতরফা সিদ্ধান্তেরও শিকারে পরিণত হয়"।[৩]

ওই অভিজ্ঞতার কঠিন আঘাতে বেলজিয়ামের মোহমুক্তি ঘটেছে, সে উপলব্ধি করেছে শুধু বেলজিয়াম নয় আমেরিকার সঙ্গতি ও সম্পদও সীমাহীন নয়। খোদ আমেরিকাতেই সমর শিল্প ছাড়া আমেরিকা-নির্মিত যাবতীয় যন্ত্রপাতির ৭৬ শতাংশই (১৯৭৯ সালে) সেকেলে অথবা অপ্রচলিত (আমেরিকার Trade Magazine of machine tool industry অনুযায়ী)। প্রায় সব শিল্পে, এখানেও সমর শিল্প বাদ, সেকেলে যন্ত্রের অনুপাত খুব বেশি; যার ফলে আমেরিকায় ইতিমধ্যেই একটি প্রচার শুরু হয়েছে, যাকে বলা হয়, 'আমেরিকাকে পুনঃ শিল্পায়িত করার প্রচার' ("The Campaign to Re-industrialize America")। সেখানকার আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো বাড়তি বিনিয়োগ ঋণ (additional investmant credit) চায়। একই সঙ্গে মার্কিন অন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো ১৯৭৯ সালে ৬৫.৯ শত

কোটি ডলার আমেরিকায় ফিরিয়ে এনেছে, আর বাইরে পাঠিয়েছে ৩৩'৫ শত কোটিডলার।

চিত্রটির আরো একটি দিক আছে। শ্রম-প্রধান ( লেবার ইনটেন্সিভ ) শিল্প স্থানান্তরের ফলে আমেরিকায় বহু লোকের চাকুরীর সুযোগ নষ্ট হয়।

এ-বিষয়ে কোনো রেকর্ড রাখা হয় না ; তবে AFL-CIO হিসেব অনুযায়ী এ-জাতীয় কর্ম-ক্ষতির সংখ্যা ৩০ লক্ষ। এই সংখ্যা যথাযথ নয় ; তবু এ-থেকে সমস্যাটির গুরুত্ব বোঝা যাবে।

বেলজিয়ামের অভিজ্ঞতার পর Chas. Pfizer & Company, chemical and pharmaceutical-এর প্রেসিডেন্ট জন জে. পাওয়ার্স বলেছিলেন "যে দেশ মার্কিন কোম্পানিগুলিকে ব্যবসা করতে অনুমতি দেয় সে দেশের জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে ঐসব কোম্পানির যে কোনো রকম যোগসূত্র নেই এই চরম আশঙ্কাই সত্য বলে প্রতিপন্ন হলো।"

যে-কোনো আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সহায়ক সংস্থার ক্ষেত্রেও এই একই চিত্র। সহায়ক সংস্থাগুলোর কাজকর্ম কোম্পানির নিজের প্রয়োজনে তথা তাদের স্বদেশী সরকারের নির্দেশে সুবিধাজনকভাবে পরিচালন করা এই উভয় দিক থেকেই এটি প্রযোজ্য।

এছাড়া অন্য কিছু হতেও পারেনা; কারণ প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশই কোনো না কোনো সংকটের আবর্তে। পুঁজিবাদী দেশগুলো আগে প্রতিষ্ঠা করেছিল 'ইইসি'—সেই 'ইইসি' এখন সংকটে। পরে ২৪টি দেশের অংশগ্রহণে যে ওইসিডি (OECD=Organisation for Economie Coordination and Development) তৈরি হলো তাও সংকটে পড়েছে। মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানি এবং ওইসিডি-দেশগুলোর মধ্যে এখন জোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে—ওইসিডি-র ঘরোয়া কোন্দল তো আছেই।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার যেখানে যেখানে তারা সক্রিয় সে সব এলাকা থেকেই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো অর্থ আদায় করতে পারে। ইওরোপে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো যার মাধ্যমে এই ধরনের কাজ করে তাকে বলা হয় ইওরোডলার। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর কাজে যদি কোনো সরকার বাধার সৃষ্টি করে তাহলে এই উপায় অবলম্বন করে তাকেও এড়িয়ে যাওয়া চলে। আমেরিকার ভূখণ্ডের বাইরে কোনো ব্যাংকে আমানত করা সাধারণ ডলারকেই ইওরোডলার নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হলো এই যে, লণ্ডনে ইওরোডলার যে ব্যবসা করছে তার পাঁচ ভাগের তিন

ভাগই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে সেই সব ব্যাংক যাদের সদর দপ্তর রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।[8]

১৯৫৯ সালে ইওরোডলার বাজারের আকার ছিল ১০০ কোটি ডলারের কিছু বেশি। ১৯৬৭ সালের শেষে তা দাঁড়ালো ১৭৫০ কোটি ডলারে; একবছর পরে ৩৩০০ কোটি ডলারে; ১৯৭০ সালে ৫৩০০ কোটি ডলারে। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এই বাজার ব্যবহার করে—যে অর্থ তারা তুলেছে অথচ এই মুহূর্তে যে অর্থের প্রয়োজন নেই তা থেকে সুদ আদায়ের জন্য। এই বাজারটিকে তারা মুনাফা মজুত রাখার কাজেও ব্যবহার করে। নিজের নিজের কাজ কারবারের মুনাফা দেশের ব্যাংকে জমা রাখার চেয়ে উপরোক্ত বাজারে মুনাফা পাচার করাই তাদের কাছে বেশী পছন্দসই।

ভারতে যা চলছে তার প্রক্রিয়া সামান্য ভিন্ন হলেও, ব্যাপারটা মূলত এক। ভারতে যে-সব আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ব্যবসা করছে তারা কদাচিৎ ভারতীয় ব্যাংকে ফান্ড জমা রাখে; তারা নিজের নিজের দেশের ব্যাংকই ব্যবহার করে থাকে। এ-দেশে যে সব বিদেশী ব্যাংক রয়েছে তাদের কাজকর্মের এটাই হলো তাৎপর্য। এ-থেকে আর্থিক ব্যাপারে কলকাঠি নাড়ার মারাত্মক সুযোগের সৃষ্টি হতে পারে।

যে-কোনো দেশেই বিদেশী ব্যাংকের রমরমা সে দেশের সরকারের গুরুতর মাথাব্যথার কারণ। ইওরোডলার বাজার যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে তাতে উদ্বেগ বোধ করছে ইউরোপের সরকারগুলো। এর কারণ কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ বা তাদের কাজকর্মের তত্ত্বতালাশ রাখার, বলতে গেলে, কোনো উপায়ই নেই। স্রোতের মতো অর্থ আসছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে; একই আমানত থেকে বেশ কয়েকবার ধার নেওয়া যায়। শেকলের একটি জোড় যদি কোনোরকমে একবার ভেঙে যায় তাহলে সারা আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিতে পারে।

ক্রিস্টোফার তুগেনহাট বলেন, "বাজার তাদের জাতীয় সুদের হার-এর কাঠামোকে যে ভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে তাতে ইওরোপীয়রা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। এধরনের বন্ধনের পরিণতি কি হতে পারে তার নাটকীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৯ সালে, যখন আমেরিকা ঋণ সংকোচন বলবৎ করলো এবং মার্কিন ব্যাংকগুলো ইওরোডলার বাজার থেকে ডলার ধার করে ঘরোয়া মজুত তহবিলকে ভর্তি করলো। এর ফলে সুদের হার "বাড়িয়ে দেওয়া

হলো এবং ফলত" অন্যান্য দেশ থেকে বাজারে অর্থ নিষ্কাশিত করে আনা হলো, যার ফল হিসেবে ওইসব দেশও তাদের সুদের হার বাড়ালো যাতে তাদের নিজেদের মুদ্রা থেকে অর্থ ঢালাওভাবে বেরিয়ে যেতে না পারে। বাজার 'আন্তর্জাতিক ফাটকাবাজীর অন্ধিসন্ধিকেও মসৃণ করে'। "এই পুরো ব্যাপারটাতে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কিন্তু সব সময়েই সুবিধা পেয়ে থাকে ; কারণ তাদের বিশাল আকার ও অসাধারণ ঋণের অনুপাতের সুবাদে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কোনো কোনো সরকারসহ অন্যান্যদের চেয়ে কম হারে সুদ দাবি করতে পারে।

অন্যান্য বিষয়ের মতো, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কোথায়, কোন এলাকায় নতুন নতুন প্রকল্প বসবে, কোন চালু প্রকল্প সম্প্রসারিত করতে হবে, ইত্যাদি বিষয়েও সমান সজাগ ও যত্নবান। কখনও এমনও দেখা গেছে যে, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন যেখানে লগ্নী করলো সেখান থেকে আশানুরূপ হারে ফেরৎ পাওয়া সম্ভব নয়, তথাপি জায়গাটি বিশেষ আকর্ষণীয়, তার কারণ ওইখানে সে অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ পাবে। আবার কখনো আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন আপাত-অপব্যয়ী বিনিয়োগ করে থাকে ; এটা করা হয় তাদের মোট উৎপাদনের অন্য কোনো অংশের নির্গমন পথকে সুনিশ্চিত করতে।

ব্যারী ব্লুস্টোন "The Causes and Consequences of Private Disinvestment" নামক গবেষণাগ্রন্থের রচয়িতা। আমেরিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ব্লুস্টোন বলেছেন, মার্কিন শিল্পে কারখানা বন্ধ করে দেবার ঘটনা নানা ভাবে ঘটে। এর মধ্যে অবশ্য সবচেয়ে চালু পথ হলো, যখন কোনো প্রকল্প তার নিউ জার্সির কোম্পানির ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছে এবং নতুন একটি খুলছে, এই একই কাজ করছে দক্ষিণ ক্যারোলিনা অথবা দক্ষিণ কোরিয়ায়। অন্যান্য প্রকল্প পুনরায় লগ্নী করার জন্য অথবা সম্পূর্ণ একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য শুধুমাত্র পুরোনো সুযোগসুবিধে জলাঞ্জলি দিয়ে এবং বকেয়া কর বাবদ সঞ্চিত অর্থ কাজে লাগিয়েই কোম্পানিগুলো আবার পুঁজির সন্ধান পেতে পারে। আর একটি চালু পন্থা হলো, যেখানে ইউনিয়নের অস্তিত্ব নেই অথবা যে এলাকায় মজুরির পরিমাণ কম সেখানে 'সমান্তরাল প্রকল্প' প্রতিষ্ঠা করে আগেকার সুযোগ সুবিধে পাওয়া শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কর্পোরেশনকে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধে দেওয়া।

"পুঁজি সরানোর এই নতুন পদ্ধতির অন্যতম সুচতুর ও ধ্বংসাত্মক ব্যাপার হলো, যাকে কোনো কোনো নিন্দুক অর্থনীতিবিদ অভিহিত করে থাকেন 'ক্যাশ

কাউ' ঘটনা বলে। জগাখিচুরিরা একটি উৎপাদনশীল প্রকল্প অথবা কোম্পানি দখল করবে, তা থেকে সবটুকু 'দোহন করবে', এইভাবে নগদ যা পাওয়া গেল তা, অন্য কোনো নতুন এবং এমনকি এর চেয়েও লাভজনক প্রকল্প বাগাবার কাজে লাগাবে। একদিন আয়ের উৎস শুকিয়ে গেলে 'ক্যাশ কাউ'-কে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে—তার উপর নির্ভরশীল শ্রমিক এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে একসঙ্গে।"

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো তাদের বিনিয়োগের এলাকা নির্বাচন করতে গিয়ে কি পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে, সে-সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অপর একজন লেখক জন ম্যানিং বলেছেন: "উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশাল বোর্ডেন গোষ্ঠী যখন থেকে দুগ্ধজাত উৎপাদনের উপর নির্ভর করলো তখন থেকে খাদ্য, ডেয়ারী এবং চিনির ব্যবসা করা বন্ধ করে দিল, কারণ তা থেকে ১০ শতাংশ বা তার থেকেও কম লাভ হচ্ছিল এবং জোর দিল কেমিক্যালের উপর। গত বছর বোর্ডেন-এর বিক্রীতে কেমিক্যালের অংশ ছিল ২৪ ভাগ কিন্তু লাভের পরিমাণ ছিল ৪০ শতাংশ। বোর্ডেন-এর ঘোষিত লক্ষ্যহলো কেমিক্যালে ৫০ শতাংশ বিনিয়োগ।"

"সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য এইরকম সর্বাত্মক অভিযানের নির্মমতা" সম্পর্কেও ম্যানিং মন্তব্য করেছেন—যার অনিবার্য ফল পরিত্যক্ত কলকারখানা এবং ধ্বংস-প্রাপ্ত সম্প্রদায়।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কিভাবে বিভিন্ন দেশে লগ্নীর উপযোগী পরিবেশ নির্ধারণ করে এবং কিভাবে নতুন বিনিয়োগের স্থান ও এলাকা নির্বাচন করে অথবা স্থিত প্রকল্প সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়, তা দেখাবার জন্য Harvard Business Review একটি গবেষণা করেছিল। লগ্নীর অনুকূল পরিবেশ নির্ধারণে তারা হিসেব করে সে দেশের (ক) পুঁজি প্রত্যাবাসন (Repatriation) নীতি, (খ) বৈদেশিক মালিকানার অনুমোদনের সীমা, (গ) বৈষম্য এবং নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক বনাম ঘরোয়া ব্যবসা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, (ঘ) মুদ্রার স্থিতিশীলতা (ঙ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (চ) শুল্কসংরক্ষণ অনুমোদনের ইচ্ছা, (ছ) স্থানীয় পুঁজির প্রাপ্যতা এবং (জ) বিগত পাঁচ বছরের বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার।

প্রথমটির ক্ষেত্রে 'রেটিং' এর অনুপাত থাকে ১২ ঃ ০ ; পুঁজি প্রত্যাবাসনের উপর কোনোরকম বিধি-নিষেধ না থাকলে ১২, আর প্রত্যাবাসনের কোনো সম্ভাবনা না থাকলে ০। আবার যেখানে শতকরা ১০০ ভাগ বৈদেশিক মালিকানা অনুমোদিত সেখানেও রেটিং ১২ এবং সেই অবস্থাকে স্বাগত জানানো হয়, আর

যেখানে বৈদেশিক মালিকানায় অনুমতি নেই, রেটিং সেখানে ০। যেখানে বৈদেশিক ও স্থানীয় ব্যবসা সমদৃষ্টিতে দেখা হয় সেখানেও রেটিং ১২ ; বিদেশীদের উপর সামান্য বিধিনিষেধ আছে অথচ কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে রেটিং ১০ ; যেখানে বিদেশীদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা নেই, কিন্তু সামান্য নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেখানে রেটিং ৮ ; যেখানে বিদেশীদের জন্য বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ দুই-ই রয়েছে সেখানে রেটিং ৬ ; বিদেশীদের জন্য যেখানে কিছু কিছু বিধিনিষেধ এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেখানে ৪ ; যেখানে বিদেশীদের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ রয়েছে সেখানে ২ ; এবং বিদেশীদের যেখানে কোনো লগ্নী করতেই দেওয়া হয় না, সেখানে রেটিং ০। মুদ্রায় স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে যেখানে মুদ্রা অবাধ রূপান্তরযোগ্য সেখানে রেটিং ২০, যেখানে খোলা ও কালো বাজারে মুদ্রার পার্থক্য দশ শতাংশের কম সেখানে রেটিং ১৮ ; পার্থক্যের অনুপাত যেখানে ১০ থেকে ৪০ শতাংশ সেখানে রেটিং ১৪ এবং ৪০ থেকে ১০০ শতাংশের ক্ষেত্রে ৮। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে, স্থিতি-শীলতা দীর্ঘকালীন হলে রেটিং ১২ ; স্থিতিশীল কিন্তু বিশেষ একজনের উপর নির্ভরশীল হলে ১০ ; অন্তর্কলহ আছে কিন্তু সরকারের নিয়ন্ত্রণ অটুট থাকলে ৮ ; অনুসৃত নীতির উপরে বাইরের এবং/অথবা ভিতরের জোরালো চাপ থাকলে ৪ ; ক্ষমতা দখলের (ভিতরের এবং বাইরের) অথবা অন্যান্য আমূল পরি-বর্তনের সম্ভাবনা থাকলে ২ এবং অস্থিরতা, ক্ষমতা দখল অথবা পরিবর্তনের বাস্তব সম্ভাবনা থাকলে রেটিং ০। শুল্ক সংরক্ষণের রেটিং ৮ থেকে ২-এর মধ্যে ওঠা-নামা করে। স্থানীয় পুঁজি পাওয়া যাক আর না যাক, এ ব্যাপারে রেটিং খুব বেশী নয়, ১০ থেকে ০-র মধ্যে। মুদ্রাস্ফীতির মাত্রার ওপর রেটিং ১৪ থেকে ২-এর মধ্যে।[৫]

লক্ষ্য করার বিষয়, এত সব নানা উপাদান বিবেচনা করার পরেও আন্ত-র্দেশীয় কর্পোরেশন এমন সমস্ত দেশে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে যেখানে নানা ধরনের ত্রুটি রয়েছে এবং সেই সব দেশেও পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসে এবং প্রচুর মুনাফা লোটে। সাধারণত দেখা যায়, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ১০ শতাংশ লাভের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে এবং উন্নয়নশীল দেশে এই লক্ষ্যমাত্রা থাকে ১৫ শতাংশ। পরে যদি দেখা যায়, এই নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো সম্ভব হবে না তাহলে প্রকল্প বন্ধ করে সেখান থেকে পাততাড়ি গোটাতেও তারা দ্বিধা করবে না ; অথবা প্রকল্পে যা উৎপাদন করছিল তা বন্ধ করে নতুন সামগ্রী উৎপাদনের দিকে

ঝুঁকবে এবং এই পরীক্ষা কিছুকাল ধরে চলতে থাকবে। যে দেশে বসে তারা এইসব কাজ করবে সে দেশের বিপদ কিন্তু থেকেই যাচ্ছে, কারণ আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ব্যবসা চালিয়ে যাবে কি-না তা সে দেশের উপর নির্ভর করে না।

এই সব বিষয় বিবেচনা করা ছাড়াও, কোনো দেশ ভবিষ্যতে কিভাবে বিকাশ লাভ করবে তা নিয়েও কোনো কোনো আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। এ জন্য তারা নানা দেশের জাতীয় জীবনকে যতদূর সম্ভব অনুধাবন করার জন্য অত্যন্ত মনোযোগে যথেষ্ট গবেষণা করারও চেষ্টা করে। বিশেষ একটি মুদ্রার অতীত আচরণের নজীর, একটি দেশের আমদানী ও রপ্তানীর ধরনধারণ এবং তার সঞ্চিত তহবিলের (reserves) মাত্রা, তারা রীতিমত খুঁটিয়ে বিচার করে।

এক বা একাধিক দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করার জন্য দু পঁ (Du Pont) ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী গবেষকরা প্রতিটি দেশের ছোট ভূস্বামী থেকে প্রাইভেট ব্যাংকার পর্যন্ত পনের থেকে কুড়িটি স্বার্থবাহী গোষ্ঠী চিহ্নিত করবে। সামগ্রিকভাবে সমাজের উপর এইসব গোষ্ঠীর প্রভাব এবং এইসব প্রভাবের সরকারী প্রতিক্রিয়ার মাত্রা প্রভৃতি তারা অনুসন্ধান করে দেখবে। প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন দুই ধরনের প্রভাবই বিবেচনা করে দেখা হয়। শেষ পর্যন্ত যাবতীয় পরিসংখ্যান কম্পিউটারে দেওয়া হয় এবং কম্পিউটারের ফলাফলই নির্ধারণ করবে, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন লগ্নী করার সিদ্ধান্ত নেবে কি নেবে না।[৮]

কখনো কখনো অবশ্য সব হিসেবই মাঠে মারা যায়, রাজনীতি এবং মানবিক আচরণে সব সময়েই এমন কিছু থেকে যায় যা নিয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, ভবিষ্যতে মানুষ কোনু ঘটনায় কিভাবে সাড়া দেবে তা আগে থাকতে অনুমান করা বিশ্বের কোনো কম্পিউটারের সাধ্য নয়।

বিনিয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা ছাড়াও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সংগৃহীত পরিসংখ্যান পুঁজিবাদী দুনিয়ার যে কোনো অংশে একটি সরকারের বিরুদ্ধে আর একটি সরকারকে লাগিয়ে দেওয়ার কাজেও সাহায্য করে থাকে। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো অবশ্য এই অভিযোগ শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়বে। কিন্তু তাতে সত্যের হেরফের ঘটে না। ফরাসী মালিকানাধীন St. Gobain Arnand de Vogue-এর প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষ কোনো দেশের সঙ্গে কাজ করার সময় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো তাদের দেশের সীমানা বহির্ভূত (extra-territorial) চরিত্রকে বেশ

ভাল করেই কাজে লাগাতে পারে। তিনি বলেন, "ইউরোপের সবগুলো দেশ ঘুরে দেখে কোন্ দেশটি তার গৃহীত কর্মসূচী রূপায়ণের সবচেয়ে অনুকূল তা খুঁজে বের করা আন্তর্দেশীয় কোম্পানির কাছে কোনো কঠিন কাজ নয়। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো শুধু দেখবে, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে।"

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে আকর্ষণ করার চেষ্টায় বহু দেশের সরকারই যে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রত, তা তো আকছাড়ই দেখতে পাওয়া যায় ; তারা ওইসব রাঘব বোয়ালদের কাছে টাকার জন্য হাজার রকমের সুযোগ সুবিধে ও ছাড়ের কথা ঘোষণা করে।

এই ধরনের মনোভাব সংশ্লিষ্ট দেশে বিপদই ডেকে আনে। এইরকম প্রতিযোগিতা চলতে থাকলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার মতো কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থাকে না। এতে লাভবান হয় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো। সংশ্লিষ্ট দেশগুলো নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে খাল কেটে কুমীর আনার কাজটাই কেবল করে থাকেন।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারে (international capital market) আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর অবাধ গতিবিধি, যেখানে সস্তা যেখান থেকেই খুশি ও প্রয়োজনমতো অর্থ তারা তুলতে পারে। এবং গ্রাহাম বান্নর্ক উল্লেখ করেছেন, "জাতির পুঁজির উৎসের উপর অভিজ্ঞ কর্পোরেশনগুলির (আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন) দাবী রাষ্ট্রের পরেই এবং আন্তর্জাতিক উৎসের ওপরেও তাদের দাবী ক্রমেই বাড়ছে।"

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর হাতে যে অর্থ মজুত থাকে তা কেবল তাদের লভ্যাংশই নয়, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বাবদও প্রচুর পরিমাণ অর্থ একপাশে সরানো থাকে। এই তহবিল থেকেই তারা তাদের ইচ্ছেমতো নগদ অর্থের বন্যা বইয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এইসব আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর সহায়ক সংস্থা যে-সব দেশে রয়েছে সে সব দেশের স্বার্থের কোনো পরোয়াই তারা করে না।

কিন্তু এমন দেশও তো আছে যার সরকার জাতীয় স্বার্থ নিয়ে সর্বদা মাথা ঘামায় না। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এই রকম ঘটনার সুযোগ নিতে চেষ্টা করে ; প্রয়াশ এই রকম ঘটনা তারা সৃষ্টি করে। গ্রাহাম বান্নকের মতে, "টেকনোক্রাসির অর্থবোধক সাম্রাজ্যবাদের জন্য ভোক্তা ও অংশীদারগণের সমর্থনের চরিত্র নিষ্ক্রীয় : সরকারের সক্রিয়। অভিজ্ঞ কর্পোরেশনগুলি প্রকাশ্যে সরকারের

ক্ষমতাকে ভয় দেখায় না এবং তাদের অগ্রগতির পিছনে এমন অনেক বিষয় আছে যা ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের স্বার্থবাহী, তাদের রাজনৈতিক মতামত যা-ই হোক না কেন।... অর্থনৈতিক মন্ত্রকের আমলাদের ভাষা আর অভিজ্ঞ কর্পোরেশনের আমলাদের ভাষা একই।" তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন, "...দীর্ঘ-মেয়াদীর চেয়ে স্বল্প-মেয়াদী বিচার বিবেচনার সংগেই রাজনৈতিক স্বার্থকে বিশেষ ঘনিষ্ঠ করে দেখা হয়।"

পঁুজিবাদী দেশে রাষ্ট্র নিজেই বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতে পারে, এই ভাবনায় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো আজ আর আদৌ ভীত নয়। ভয় কেটে গেছে, কারণ তারা জানে রাষ্ট্রের সংগে নিজেরা মানিয়ে নিতে পারবে। আর তাছাড়া, আজ উন্নত পঁুজিবাদী দেশগুলোতে রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পের মধ্যেকার পার্থক্য দ্রুত অপসৃত হয়ে যাচ্ছে।

আগাগোড়াই এই রকম একটা অস্বাস্থ্যকর বিকাশের ফলে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কাজকর্মের অনেক সুবিধে হয়ে গেছে। মনের সুখে তারা ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছে, আরো বেশি করে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তি কব্জা করছে, দেশের সরকারের মধ্যে সুস্থ মানসিকতার লোকে তাদের সম্পর্কে কি ভাবছে বা তাদের বিরুদ্ধে কি বলছে তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের এই ধরনের কাজকর্ম যে একটি জাতির পক্ষে কতখানি অপমানকর হতে পারে, তা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কাজকর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গ্রাহাম টার্নার-এর বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করা যাবে। টার্নার, ইংলন্ডের আই বি এম (IBM) এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ভূমিকাকে সাব-পোস্টমাস্টারের ভূমিকা হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, তাঁর উপর যে সব যন্ত্রপাতির দায়িত্ব, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের সংগে পরামর্শ না করে তার একটি নাট-বলটু বদলাবারও ক্ষমতা তার নেই। পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে এই-ভাবেঃ "ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (পড়তে হবে সাব-পোস্টমাস্টার) চারজন, ইডরোপীয় প্রধানের মধ্যে একজনের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন, তিনি আবার রিপোর্ট পাঠালেন ইউরোপে আই-বি এম এর প্রধানকে ; তিনি রিপোর্ট পাঠালেন World Trade Corporation-এর প্রধানকে, তিনি শেষ পর্যন্ত প্রধান বোর্ডের কাছে রিপোর্টটি পাঠালেন। ব্রিটিশ কোম্পানির যে-কোনো পদক্ষেপ প্যারিসের সদর দপ্তরের নানা স্তরেব মধ্য দিযে পরিস্রুত হয়ে তবে নিউ ইয়র্কে World Trade Corporation-এর হাতে পেঁছিবে, যেটি আবার আরমংক-এ অবস্থিত সংস্থাভুক্ত সদরদপ্তরের চেয়ে ৮০ মাইল দূরে।

এবং আরো আছে, "নগদ অর্থ ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ন নজর, প্রতিটি সহায়ক কোম্পানির বাৎসরিক মুনাফার পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীর আগ্রহের মধ্যেও প্রতিফলিত। প্রতি বছর, প্রতিটি আমেরিকান কর্পোরেশন হয় তার হর্তাকর্তাদের ইউরোপে পাঠায়, নয়তো সহায়ক সংস্থাগুলোর চীফ এক্সিকিউটিভ-দের আমেরিকায় ডেকে পাঠায়, এবং একটি আধা-সামরিক কায়দায় পরিকল্পনা ঝাড়াইবাছাই এবং লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার কাজ শুরু হয়।"

এবং এর পরেও আছে, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনে একজন চীফ এক্সিকিউ-টিভের মর্যাদা কতখানি? ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চেয়ারম্যান হেনরী ফোর্ড ফোর্ড কোম্পানির প্রেসিডেন্ট কনুড্‌সেন (Knudsen)-কে বরখাস্ত করলে কোনো কোনো এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিলেও আন্তর্দেশীয় দুনিয়ার ভ্রূকুটি লক্ষ্য করা যায়নি। গ্রাহাম বান্নক বলেন, একটি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের "চীফ এক্সিকিউটিভকেও যে পত্রপাঠ বিদেয় করা যায়, এই ঘটনায় তা-ই প্রতীয়মান।"

## ত্রিপাক্ষিক তত্ত্ব: দর্শন এবং অভিপ্রায়

বিশ্বের সমগ্র পুঁজিবাদী অংশে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কি পরিমাণ শক্তিশালী, ওপরের আলোচনা থেকে আমরা সে সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও কিন্তু তাদের আশা মেটেনি, তারা আরো ক্ষমতা চায়। পুরো গোলার্ধকে তারা চায় কুক্ষিগত করতে। 'ত্রিপাক্ষিক' তত্ত্বে তাদের এই আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত।

"The Trilateral—The International of Capitalism" নামে স্পেন-দেশীয় সাংবাদিক Joaquin Estefania Loreira-র লেখা একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনের এই সদর দপ্তরের বৈশিষ্ট্য, গঠন, এর দর্শন, উপাদান এবং ক্ষমতার কথা এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত, নির্ভরশীলতার সমস্যা। এর দ্বারা 'ত্রিপাক্ষিকতার' দর্শনের মৌল বৈশিষ্ট্য: পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিকতার (Capitalist internationalism) সঙ্গে পাঠক পরিচিত হবেন।

এই আন্তর্জাতিকের সদস্যরা যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে তা হলো, জাতীয় রাষ্ট্রগুলো উনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিকাশের পথ আটকে দিয়েছিল। কৃত্রিম সীমারেখা না থাকলে আন্তর্দেশীয় স্বার্থের বিবর্তনও অবশ্যই সম্ভব হতো, আর কোনো রকম বিধিনিষেধ ছাড়া অবাধ-নীতির (laissez-faire) আদর্শেরও স্থানগত স্বাধীনতা থাকত অবাধে

যা-কিছু করার। এ-ও অনুভূত হয়েছিল যে, এই ধরনের অর্থনৈতিক উদারনীতি একই প্রকারের উদারনৈতিক রাজনীতির সঙ্গে একযোগে চলতে পারে না। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর শাসন করার উপযুক্ত নেই এবং দেখেশুনে মনে হয় এই ব্যবস্থায় নানা রকমের অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের চেষ্টাও চলতে পারে। এটাই ইউরোপের অবস্থা—এই বলে গবেষণা শেষ হয়েছে।

এবং তাহলে? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই দুর্বলতাকে কিভাবে পুষিয়ে তাকে এমন একটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তিতে পরিণত করা যায় যাতে তা একচেটিয়া এবং আন্তর্দেশীয় পর্বের পুঁজিবাদী উৎপাদনের পথের সঙ্গে একযোগে চলার যোগ্য হয়ে ওঠে? গবেষণায় বলা হচ্ছে, তা করার একটিমাত্র পথই আছে: সর্বোচ্চ পরিমাণে সকল রকমের স্বাধীনতা সংকোচন। প্রস্তাবিত ফর্মুলাটি এইরকম: অর্থনীতিক্ষেত্রে অবশ্যই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকবে (চাহিদা ও যোগানের বিধি) এবং ক্রমেই বেশি মাত্রায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কামিতার (authoritarianism) সাহায্যে রাজনীতিক্ষেত্রে গণতন্ত্র খর্ব করতে হবে।

তত্ত্বটির বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান কালে এবং তত্ত্বাদর্শের চূড়ান্ত সর্বাধিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দি ট্রাইল্যাটারাল সিদ্ধান্ত গ্রহণাধিকারী কেন্দ্রের (আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর সদর দপ্তর) পক্ষে মত প্রকাশ করে। এই কেন্দ্র সাধারণত কোন স্বীকৃত কর্তৃত্ব অথবা এক্তিয়ারের অধীন নয় (অর্থাৎ কোন জাতীয় গভর্নমেন্টের কর্তৃত্বের অধীন নয়) এবং নিজেকে একটি সিদ্ধান্ত-গ্রহণের সর্বাধিকারী কেন্দ্রে পরিণত করে ফেলে। অর্থাৎ সেটা হয়ে দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক ফিনান্স ক্যাপিটালের (লগ্নী-পুঁজির) নির্বাহী কমিটি।

এই কমিটি বুদ্ধিজীবীদের নিয়োগ করতে চেষ্টা করে, যাঁরা একচেটিয়া পুঁজির চরিত্রের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হবেন, এবং এঁদের সঙ্গে থাকবেন উঁচু পদে অধিষ্ঠিত টেক্‌নোক্রাটরা; এরপর সবাই মিলে অনুমোদিত সিদ্ধান্তগুলিকে রূপায়িত করার কাজ সহজ করে তুলবেন। এই কমিটি চেষ্টা করে কিভাবে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর জন্ম হচ্ছে তা দেখতে, যারা সাধারণ সামাজিক নিয়ম মেনে নেবেন,—এটি ট্রাইল্যাটেরাল দর্শনের অন্যতম প্রধান বিষয়। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের গোপন অংশগুলোও এর সযত্ন গবেষণার বিষয়, উদ্দেশ্য অভীষ্ট অর্জন। সেমুর লিপসেট এর ভাষায়,

যা "শ্রেণী সংগ্রাম" হিসেবেই থেকে যাবে। কিন্তু লাল পতাকা এই "শ্রেণী সংগ্রাম মতাদর্শ, মে-দিবস ইশ্‌তেহার বাদ দিয়েই চলতে থাকবে...।"

ভিয়েতনামে আমেরিকার পরাজয়ে মার্কিন মান মর্যাদা চূড়ান্ত ঘা খেয়েছে। এ-থেকে একটা শিক্ষা তারা গ্রহণ করেছে। শিক্ষাটি হলো : খোলাখুলি কায়িক শক্তি প্রয়োগ করে প্রকাশ্য সীমানা-বহির্ভূত আধিপত্য বিস্তারের কাজ আর নয়। এখন অনুপ্রবেশের রীতি আরো সূক্ষ্ম হতে হবে। অনুপ্রবেশ করতে হবে এখন ট্রান্সন্যাশনালের মাধ্যমে। অবশ্য এই দুই ধরণের আধিপত্য যে পুরোপুরি বেখাপ্পা তা কিন্তু মনে করা হয় না। বরং একটিকে অপরটির পরিপূরক হয়ে উঠতে হবে। মনে করা হয়, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরে অর্থ-নীতিকে অগ্রাধিকার দেবার সময় এসেছে। ট্রাইল্যাটেরাল এ-ও বিশ্বাস করে, তৃতীয় দুনিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সস্তা শ্রম-সম্পদ লুঠ করে নেবার সাম্রাজ্য-বাদী ও নয়া উপনিবেশবাদী পদ্ধতির বিরুদ্ধে তৃতীয় দুনিবার দেশগুলো যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তারও ইতি টানার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

বর্তমান এই পর্বের সঙ্গে যুগপৎ চলছে আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা : ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক ঘাটতি মেটাতে অনবরত ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটছে, সংকট ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। ইওরোপের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র এবং জাপান আমেরিকার চেয়ে বেশি হারে জাতীয় উৎপাদনের অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছে। বিশ্বের ভারসাম্যও সংকটাপন্ন। শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী 'গেরিলা' যুদ্ধ ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, যার লক্ষ্য আমেরিকার সম্প্রসারণ রোধ করা। শিল্পোন্নত দেশগুলো আর আমেরিকার প্রভুত্বকে স্বীকার করতে চায় না।

রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে যখন একচেটিয়া পুঁজির এবং আন্তর্দেশীয় পুঁজিবাদী স্বার্থের পাণ্ডা মনে করছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় রাষ্ট্রের যুগ শেষ হয়ে গেছে, তার বিশ্বাস, সম্প্রসারণ ও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পথে বাধা ও বিরুদ্ধ শক্তি হলো জাতীয় সীমারেখা।

ঠিক এই বিষয়টিই উত্থাপিত করেছিলেন ডেভিড রকেফেলার। তিনি বলেছিলেন, "অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের সাধারণ স্বার্থ আরো ভালোভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে যদি অবাধ বাজারের শক্তিবর্গ জাতীয় সীমানা-রেখার বাইরে বেরিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।...যে অবরোধ আন্তর্দেশীয় সমিতি-গুলিকে সীমিত করে রেখেছে তা অপসারণের সময় এসেছে, যাতে তারা বিশ্ব অর্থনীতিবিকাশে তাদের কর্তব্যকর্ম সমাধা করতে পারে।"

মনে হতে পারে, প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন তাঁর আমলে অর্থনৈতিক সংরক্ষণতা (Economic protcetionism) আরোপ করার জন্য যা করেছিলেন

এবং পরিপূর্ণ অবাধ আমদানী ও রপ্তানীর পক্ষে "ট্রাইল্যাটেরাল কমিশন" যা প্রচার করছে—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ছিল। আমেরিকা যে পণ্য আমদানী করতো তার একটা বড়ো অংশের উপর নিকসন ১০ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এটা করা হয়েছিল GATT চুক্তি অমান্য করে।

একই সংগে নিকসন জাপান ও ইইসি দেশগুলোর সরকারের কাছে সুপারিশ করলেন তারা যেন মার্কিন রপ্তানী পণ্যের ওপর শুল্কের বোঝা লাঘব করে তাদের বাজারে আমেরিকান পণ্যের প্রসার বাড়াতে সাহায্য করেন। তিনি তাদের এই বলে সতর্কও করে দিলেন যে, এর অন্যথা হলে তিনি ওইসব দেশের বিরুদ্ধে আর্থিক ও বাণিজ্যিক পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। বাস্তবিক, তিনি তা করেওছিলেন, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের নিয়ম কানুন অমান্য করে তিনি ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটালেন এবং আর্থিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা আমেরিকার বাণিজ্যিক ঘাটতি কমিয়ে আনলেন।

GATT চুক্তি অমান্য করে মার্কিন প্রশাসন এখনও ভারতীয় সহ বেশ কিছু দেশের পণ্য আমেরিকার বাজারে প্রবেশের ওপরে বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে।

যুক্তি খুবই সাদাসিধে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সমস্ত বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর কিন্তু আমেরিকার বাজারে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন-গুলোর ঢোকার চেষ্টা ?—নৈব নৈব চ। কাজেই পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিকের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, অন্য সকলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মার্কিন ট্রান্সন্যাশনালের স্বার্থের সম্প্রসারণ।

প্রেসিডেন্ট নিকসন যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। তাদের গোঁসা ভাঙবার উদ্যোগ আবার নিলেন ডেভিড রকেফেলার। তিনি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ পর্ষদ ব্রজেজিনস্কি মিলে গঠন করলেন বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির সর্বোচ্চ একান্ত ক্লাব—'ট্রাইল্যাটেরাল কমিশন।' এই প্রাইভেট ক্লাবটি প্রেসিডেন্ট কার্টারের আমলে যেমন শক্তিশালী ছিল, এখনো তেমনি আছে।

সরকারী দলিলেই ইংগিত রয়েছে যে, ট্রাইল্যাটেরালের প্রধান লক্ষ্য হলো, "পশ্চিম ইওরোপ, জাপান এবং উত্তর আমেরিকার তাবড় তাবড় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বোঝাপড়া" ঘটানো, "যাতে ঐসব সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তিনটি অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার প্রসার হয়।" আসল লক্ষ্য, "একটি বিশ্ব সরকারের ছায়া।"

ট্রাইল্যাটেরালের পছন্দসই ব্যক্তিরা আসেন তিনটি ক্ষেত্র থেকে : আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন আর্থিক ও ব্যবসাবিষয়ক ব্যক্তিবর্গ, অবাধ বাজারের স্বার্থবাহী অর্থনীতিবিদ, এবং তৃতীয়ত যাঁরা সীমারেখাহীন বিশ্ব তত্ত্বের গুণপণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং গণপ্রচার মাধ্যমে যাঁদের কিছু প্রভাবপ্রতিপত্তি রয়েছে ( সাংবাদিক, আইনজীবী প্রভৃতি )।

চতুর্থ একটি বিভাগও আছে। তার জাঁকজমক তেমন না থাকলেও ক্রম-বর্ধমান মনোযোগের কেন্দ্রস্থল। সেটি হলো পীত ট্রেড ইউনিয়নকর্ম (Yellow Trade Unionism)।

ট্রাইল্যাটেরালের কাছে বড় বড় রিপোর্ট এবং কর্মকৌশলের ব্যাখ্যা মজুত থাকে। সদস্যদের এগুলো পড়তে হয় এবং এই অধীত বিদ্যা তারা প্রয়োগ করে, শক্তি, গণতন্ত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, অর্থ ব্যবস্থা, উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা ( North-South dialogue ) এবং অবশিষ্ট পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে সহ-যোগিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

পুঁজিবাদী-দানবের চেহারাটা একটু মেজেঘষে মানবিক করে তোলাই হলো ট্রাইল্যাটেরালের দর্শন। প্রথম কার্টার মন্ত্রিসভার আঠারজন সদস্যই এসেছিলেন এই শক্তিশালী প্রাইভেট ক্লাব থেকে, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাঁদের হাতে, তাঁদের সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রেগন মন্ত্রি-সভাতেও সদস্যসংখ্যার হেরফের ঘটেনি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন, ভাইস প্রেসিডেণ্ট জর্জ বুশ, পররাষ্ট্র সচিব আলেকজান্দার হেগ ও অন্যান্যরা।

অন্যতম দলিলে ট্রাইল্যাটেরাল দুর্নীতির নিন্দা করে বলেছে, "ক্যানসারের মতো এই দুর্নীতিই কর্পোরেশনগুলোর আন্তর্জাতিক ভূমিকাকে যথেষ্ট দুর্বল করেছে, অবাধ বাজারের সপক্ষে যুক্তিগুলোকে অবিশ্বাস্য করে তুলেছে এবং গণতন্ত্রের অপরিহার্য মূল্যকে বিপন্ন করেছে।"

আরো একটি পংক্তি যোগ করে আমরা এই উদ্ধৃতিটি শেষ করতে চাই : অর্থনীতিতে সকল রকমের জাতীয়তাবাদ বন্ধ করাই ট্রাইল্যাটেরালের প্রথম লক্ষ্য। বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির প্রয়োজন, পুঁজির অবাধ সম্প্রসারণের পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যাবতীয় আইনগত অথবা শুল্কের প্রতিবন্ধকতার অবসান। প্রথম পূর্ব-শর্ত এটাই।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, বিশ্বের অন্যান্য ট্রান্সন্যাশনালগুলোর ( পশ্চিম ইওরোপ এবং জাপানের ) অস্তিত্ব ট্রাইল্যাটেরাল স্বীকার করে এবং এমন একটা ভাব করে যেন শোষণ ও সম্প্রসারণের উপায়, কায়দাকানুন ও ব্যবস্থার ক্ষেত্রে

তাদের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করেই চলে। যে মতলবটি এর পেছনে রয়েছে তা হলো অন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষ এড়ানো কিন্তু এই আপাত-সমন্বয় সাধনের পিছনে লুকোনো সত্যিকারের অভিপ্রায়টি হলো সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে মার্কিন প্রভুত্বের প্রসার। (দ্রঃ ট্রেডইউনিয়নগুলির বিশ্ব ফেডারেশনের মুখপত্র "ওয়ার্লড ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট")।

ট্রাইল্যাটেরালের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের প্রকৃত রূপায়ণ ঘটেছে আমেরিকায়। গাস হল্ তাঁর 'ইমপিরিয়ালিজম টুডে' গ্রন্থে ইউনাইটেড স্টেট্‌স এস্টাব্লিসমেন্ট-এর মৌল বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ পেন্টাগণ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল, সি আই এ, এফ বি আই-এর মতো—গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে এইসব নানা 'অদৃশ্য' সরকারী সংস্থাগুলিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মুখ্য সংস্থা হয়ে উঠেছে। Collective body হিসেবে মন্ত্রিসভারও কোনো অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। গণতান্ত্রিক অধিকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আত্মরক্ষার চিরাচরিত প্রক্রিয়াগুলো দ্রুত লুপ্ত হয়ে যাচেছ। অদৃশ্য সরকারই প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়ে যাচেছ।

"এই সংস্থার হাতে যে ক্ষমতা তা সত্যিই দুশ্চিন্তার কারণ। এর কাজকর্ম যদিও লোকচক্ষের অন্তরালেই থাকে, তবু আগ্রাসী যুদ্ধ বাধাবার ক্ষমতা এর আছে। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ( National Security Council ) নেতৃত্বে এটি মন্ত্রিসভার,—যার ভূমিকা দিনকে দিনকে গুরুত্ব হারাচ্ছে,—কর্তৃত্বকে গ্রহণ করতে চায়। প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভা প্রায় একটি আনুষ্ঠানিক সংস্থা হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার এই নেপথ্য-কেন্দ্রের আবির্ভাব, আর্থিক শিল্পগত নানা কেন্দ্র, পেন্টাগণ, সি আই এ এবং এফ বি আই-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সমগ্র গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষেই গুরুতর বিপদের কারণ।

"অদৃশ্য সরকারের আবির্ভাব পুঁজিবাদী একনায়কতন্ত্রের একটি নতুন রূপ, যা এর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী বিকাশপর্বের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এটি রাষ্ট্রীয় সংস্থার ক্ষমতাকে টুকরো টুকরো করে দেবার প্রক্রিয়া, যে রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অবশ্যই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেনেট এবং প্রতিনিধি সভার ( House of Representatives ) সদস্যরা জনসাধারণের মানসিকতাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কিন্তু অদৃশ্য সরকারের উদয় এবং নীতিনির্দেশকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার ফলে নির্বাচকমন্ডলীকে সরকারী সংস্থায় সদস্য নির্বচনের প্রক্রিয়াটি চালিয়েই যেতে হবে, সরকারের মূলনীতি বিষয়ে যে সংস্থার ভূমিকা ক্রমেই জীর্ণজুর হয়ে উঠবে।

"এই ছকে বাঁধা প্রণালীতে, জনসাধারণের কাছে অদৃশ্য নানা সংস্থার মধ্য দিয়ে মনোপলি কর্পোরেশনগুলি বিভিন্ন সরকারী নীতি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে, আর জনসাধারণ যেসব সংস্থার কাছে যেতে পারে তাদের প্রভাব ক্ষীয়মান। রাষ্ট্রের ব্যাপারে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা একচেটিয়া পুঁজিবাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ সাধারণ মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের নীতির মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমেই আরো অসেতুসম্ভব হয়ে উঠছে। এই ঘটনার সাংবিধানিক সংকট তীব্রতর হবার প্রধান কারণ।

"অদৃশ্য সরকারের উদয় পুলিস রাষ্ট্রের ( police state ) দিকে এক কদম এগিয়ে যাওয়া। এর দ্বারা রাষ্ট্রপতির একচ্ছত্র ক্ষমতা বেড়ে যায়। নতুন একনায়কতন্ত্রী ক্ষমতা পরিচিত হচ্ছে যুদ্ধ করার বিশেষ ক্ষমতা হিসেবে। কিন্তু তাদের স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, এবং প্রতিষ্ঠানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কাঠামোটা খাড়া রেখে তারা গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর অপরিহার্য বৈশিষ্টকে বদলে দিচ্ছে।

"একনায়কতন্ত্রী ক্ষমতা এবং অদৃশ্য সরকারি সংস্থাগুলো জন-বিরোধী নীতির হাতিয়ার। এইসব নীতি জনসাধারণের সকল অংশের পক্ষেই ক্ষতিকারক।"

অষ্টম অধ্যায়

# বিশাল কৃষি-জাত পণ্যের কারবার এবং...

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর আধুনিক কাজকারবার নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা সাধারণত শিল্প এবং আর্থিক ক্ষেত্রগুলিকেই কেবল যাচাই করে দেখে থাকি, কৃষিক্ষেত্রে তারা কি করছে না করছে সেদিকে তেমন নজর দেই না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ট্রান্সন্যাশনাল খুবই সক্রিয়।

জিমি কার্টার যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন তখনই বিশ্বের মনোযোগ এ-দিকে আকৃষ্ট হলো। কার্টার আমেরিকার কৃষি-ক্ষমতার প্রতিভূ। ট্রাইল্যাটেরালের সংগেও তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (National Security Adviser) জেড. ব্রজেজিনস্কি রকেফেলারের একান্ত ক্লাব এবং ট্রাইল্যাটেরালের অন্যান্য বড় বড় সংস্থার সদস্য ছিলেন।

আমেরিকার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও মনোপলির বজ্রমুষ্টি। প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন নতুন অগ্রগতি ঘটছে, কৃষি উৎপাদনেও আরো বেশি পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার চালু হচ্ছে ফলে দক্ষিণের কৃষিক্ষেত্র থেকে দলে দলে কৃষিকর্মী চলে আসছেন, কৃষির একচেটিয়াকরণের কাজও দ্রুত এগোচ্ছে। US Statistical Abstracts of 1971-এর হিসেবে ১৯৭০ সালের ৯৭১২০০০ জন নথীভুক্ত কৃষিকর্মীর সর্বনিম্ন সংখ্যা। এই সংখ্যা ১৯২০ সালের এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কম। এই সময়ের মধ্যে কিন্তু খামার পিছু গড় আকার আড়াই গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৯-১৯৬৪ এই পাঁচ বছরের মধ্যে ৪০০০০ ডলার বিক্রীবাটা আছে এইরকম বড় বড় খামার ৪০ শতাংশ বেড়েছে; বার্ষিক বিক্রীর পরিমাণ ৫০ ডলার থেকে ৪৯৯৯ ডলার—এইরকম ছোট ছোট খামার কমে গেছে ২০ শতাংশ; আর মাঝারি আকারের খামার যাদের বিক্রী ২৫০০ থেকে ৪৯৯৯ ডলার তাদের সংখ্যা কমেছে ২৮ শতাংশ। ফেডারাল সরকার কৃষিজাত উৎপাদনের ভিত্তিতে খামারকে মদত দেবার যে কর্মসূচী নিয়েছিল তাতে একচেটিয়া খামারীদেরই পোয়াবারো হয়েছে কারণ ব্যক্তিগতভাবে কৃষিজাত উৎপাদনে তাদেরই সিংহভাগ।

১৯৭০ সালে খামারের আয় স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে সরকার ৫ শত কোটি ডলার ব্যয় করেছিল। এর মধ্যে ছিল খামারের উৎপাদনে, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য (price) নির্ধারণে এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় সবরকম সাহায্য করা। কিন্তু খামার-জাত পণ্য বিক্রী করে যা পাওয়া গেল তার অর্ধেকেরও বেশি চলে গেল বড় বড় খামারীদের হাতে। ছোটরা মর্টগেজ পেমেন্ট করতেই হিমসিম। ( দ্রঃ গাস হল ঃ ইমপিরিয়ালিজম টুডে )

পশ্চিম ইউরোপেও এই একই ঘটনা ঘটছে। পশ্চিম ইউরোপে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা শিল্পের চেয়েও দ্রুততর গতিতে বেড়েছে। কর্মী-পিছু উৎপাদন বেড়েছে বিপুলভাবে। কৃষিক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কল্যাণেও এটা হয়ে থাকতে পারে। ট্রাকটর, হার্ভেস্টিং মেশিন, মিলকিং মেশিন, কম্বাইন প্রভৃতি প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে। খামার উৎপাদনে এত বেশি পরিমাণে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে খামার-কর্মীর সংখ্যা অনেক কমে গেছে; উল্লেখ-যোগ্যভাবে বেড়েছে একর পিছু উৎপাদনের পরিমাণ; ঢালাওভাবে ভালো জাতের বীজের ব্যবহার, ভালো সারের প্রয়োগ এবং আগাছা ও পোকামাকড় মারবার ওষুধ ব্যবহারের ফলেও এটা হয়েছে। দোহনের কাজে যন্ত্রের ব্যবহার, গবাদি পশুর জন্য উৎকৃষ্ট ও সস্তা খাদ্য এবং তাদের আরো ভালোভাবে নিঙড়াবার ব্যবস্থা হওয়ায় দুধের উৎপাদন বেড়েছে। বেশি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য 'ইনপুট' প্রয়োগের ফলে খামারপিছু জমির একরের পরিমাণ বেড়েছে। বড় বড় খামারে ৫০০ থেকে ১০০০ একর জমি রয়েছে। এই ধরনের পুঞ্জীভবন সবচেয়ে বেশি কানাডায়। ( দ্রঃ গ্রাহাম ব্যানক ঃ দ জগন্নাথ )

কৃষিকাজে যন্ত্রপাতি ও 'ইনপুট'-এর প্রয়োগ বেড়ে যাওয়ায় এই ক্ষেত্রে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, কারণ তারাই ওইসব যন্ত্রপাতি ও 'ইনপুটের' প্রস্তুতকারক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই ট্রান্সন্যাশনাল শিল্প ও কৃষি উভয় বিভাগের উপরেই আধিপত্য করে। তদুপরি প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উৎসকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন-গুলি খামার-ক্ষেতের উপরেও নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৯ সালে জাতি সংঘের ২৪ তম সাধারণ অধি-বেশনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা এবং কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রো জোর দিয়ে বলেছিলেন, গত দশকে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো ৪ শতাংশ গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার অর্জন করতেও ব্যর্থ হয়েছে, বিশেষত খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে যে পরিমাণ খাদ্য

তাদের আমদানী করতে হচ্ছে তাতে ব্যালান্স অব পেমেন্ট-এ যথেষ্ট ঘাটতি পড়ছে।

এই কারণেই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ৪৫ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত, ৮০ কোটি মানুষ চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করছে এবং ১·৫ শত কোটি মানুষ কোনো চিকিৎসার সুযোগ পায় না।

খাদ্যশস্য ও সয়াবীনের উৎপাদন এবং বিক্রী (দুটিরই বিক্রেতা কৃষিক্ষেত্রের একচেটিয়াপতিরা) দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এইসব সামগ্রীর আমদানীকারক দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার সম্ভবপর হয়েছে : একই সঙ্গে এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ঐসব একচেটিয়াপতিরা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কাঁচা মাল লুঠ করছে। বহু উন্নয়নশীল দেশের বাজারে গ্যাট হয়ে বসার ব্যাপারে এই রকম পরিস্থিতি মার্কিন একচেটিয়াপতিদের খুবই সাহায্য করে। নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একচেটিয়াপতিরা এইসব দেশের কৃষিক্ষেত্র এবং সাধারণভাবে কৃষির উন্নতির পথে সব রকমের বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

পি এল-৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা থেকে খাদ্যশস্য আমদানীর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ভারতের রয়েছে। আনন্দের কথা আজ আর আমাদের খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় না বরং আমরা কিছু পরিমাণ রপ্তানী করতে সমর্থ।

তাহলেও বিপদ এখনো কাটেনি। কারণ সগোত্রীয় অন্যান্য দেশের মতো ভারতকেও কৃষিক্ষেত্রের 'ইনপুট' এবং কিছু কিছু যন্ত্রপাতির জন্য আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর ওপরেই নির্ভর করতে হয়। কখনো কখনো এটা কত মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে নিচের তথ্য থেকে তা দেখা যাবে।

"ডি এস ভি আর" কীটনাশক ঃ এটি সেই সব শত শত রাসায়নিক উৎপাদনের একটি, আমেরিকায় যার ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু মার্কিন ট্রান্সন্যাশনালগুলো অবাধে তা তৃতীয় দেশগুলোতে বিপুল পরিমাণে রপ্তানী করে চলেছে। "মাদার জোন্স" (ক্যালিফোর্ণিয়া) থেকে একদল সাংবাদিক প্রথম এ নিয়ে হৈ চৈ তুলেছিল।

১৯৭৭ সাল থেকেই ক্যালিফোর্ণিয়ায় ডি এস ভি আর-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। কারণ, এই রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়েছে এমন ফল খেলে তা বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়, এমনকি ক্যানসারও হতে পারে। আমেরিকার অন্যান্য রাজ্যেও কীটনাশকের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত ; কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, জিনিসটি আমেরিকায় ব্যবহার করার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অন্যান্য দেশে রপ্তানী করার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই।

উন্নয়নশীল দেশের কৃষিকর্মীরা ডি এস ভি আর-এর বিপদের কথা না জেনে গাছপালায় ওই কীটনাশক স্প্রে করার সময় নানা রকম ব্যাধির কবলে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের (WHO) মতে এই জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করে বছরে ৫ লক্ষ কৃষিকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ে।

"অলড্রিন" ঃ লাতিন আমেরিকায় Aldrine নামক কীটনাশক প্রয়োগের উপর একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, স্থানীয় জনসাধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য বাঁধা কপির উপর এর প্রয়োগ আমেরিকায় প্রযুক্ত মাত্রার চেয়ে ২০০০ গুণ বেশি পুঞ্জীভূত।

কয়েক বছর আগে এই কীটনাশক ব্যবহার করে ইরাকে ৪০০ জন মারা গেছেন, ৫০০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৯৭৫ সালের গ্রীষ্মকালে ব্রাজিলের গ্রামে ১৫টি শিশু মারা গেছে। বিশ্লেষণে তাদের রক্তে মারাত্মক অলড্রিনের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

"ডি ডিটি" ঃ গুয়াতেমালা এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীদের রক্তে পুঞ্জীভূত ডি ডি টির সর্বনিম্ন মাত্রাও আমেরিকায় অনুমোদনযোগ্য মাত্রার চেয়ে ৩০ গুণ বেশি।

তৎসত্ত্বেও বিপজ্জনক রাসায়নিক উৎপাদন সমানে চলেছে। তদুপরি, কৃষিকাজে এমন অসংখ্য রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা এখনো যথোপযুক্তভাবে পরীক্ষা করেও দেখা হয়নি। মানবদেহের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক, এই তথ্য জানার আগেই কত হাজার টন ডি ডি টি প্রয়োগ করা হয়ে গেছে তার হিসেব নেই। প্রস্তুত করা এবং বিক্রী করার লাইসেন্স নেই, এরকম রাসায়নিক দ্রব্যও ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে কত যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, তার ইয়ত্তা নেই।

"লেপটাফস" ঃ ১৯৭৪ সালে মিশর এই কীটনাশকটি আমদানী করে। এই রাসায়নিক দ্রব্যটি যে কত কৃষকের জীবনহানির কারণ ঘটিয়েছিল কায়রো-র কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশ করেননি। তাঁরা কেবল ঘোষণা করেছিলেন, 'লেপটাফস' খেয়ে হাজার খানেক মোষ মারা পড়েছে।

কীটনাশক রসায়নিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমেরিকা পশ্চিম জার্মানি ও সুইস ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর কাজকর্মকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠনের একজন চিকিৎসক 'মাফিয়া স্টাইল অপারেশন' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'এই আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন শাখা ও অধীনস্থ সংস্থা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে, স্বদেশেই এদের শাস্তি পাওয়া ( যদিও কদাচিৎ খেয়ে

থাকে ) উচিত, কিন্তু সবসময়েই তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসে পিঠ বাঁচায়, নিষিদ্ধ কীটনাশকের নতুন নাম দেয় এবং 'নতুন লেবেল' এ'টে বিক্রী করে।

DOW, SHELL, DU PONT এবং অন্যান্য সুবিশাল রাসায়নিক শিল্পগুলোই সারা বিশ্বে বেশির ভাগ রাসায়নিক দ্রব্যের লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। পেটেন্ট এবং লাইসেন্স ব্যবস্থার সুবাদে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ট্রান্সন্যাশনালগুলোর মধ্যে গলায় গলায় ভাব, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করে এবং বাজারে ছড়িয়ে দিয়ে তারা প্রায় প্রত্যেকেই প্রচুর মুনাফা লুটে থাকে, যার মধ্যে কিছু কিছু মারাত্মক রাসায়নিকও রয়েছে। ( দ্রঃ World Federation of Trade Union Journal "World Trade Union Movement" )

কাঁচামাল রপ্তানীর ক্ষেত্রে সাধারণ যে প্রবণতা রয়েছে তার কাঠামোর মধ্যে, বহু অল্পোন্নত দেশের বিকাশে, ঘরোয়া লগ্নী উশুল করার ব্যাপারে তাদের সম্ভাবনাকে সীমিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ; ফলে, প্রধান প্রধান যে-সব বাজারে দ্রব্যাদি বিক্রী হবে যেখানকার মূল্য-নির্ধারণের উপর এইসব সম্ভাবনা সরাসরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এইসব বাজারে বৃহৎ মনোপলিদেরই আধিপত্য। এই অবস্থায় মূল্য ও বিক্রীর শর্তাবলী নির্ধারণে কাঁচামাল সরবরাহকারীর কোনও প্রভাব খাটাবার সুযোগ নেই, সবকিছুই চলে মনোপলির নির্দেশে। ১৯৭৮ সালে, বিশ্বে যত চা উৎপাদিত হয়েছিল, তার ৭৫ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন প্রধান পাঁচটি মনোপলি। ১৯৬০ সালে একটি উন্নয়নশীল দেশ ২৫ টন কাঁচা রবারের বিনিময়ে ৬টি ট্র্যাকটর আমদানী করতে পেরেছিল ; ঐ একই পরিমাণ রবারের বিনিময়ে ১৯৬৫ সালে সে পেয়েছিল ৩˙৫টি ট্র্যাকটর, আর ১৯৭৫ সালে মাত্র ২টি।

হিসেব করে দেখা গেছে, কাঁচামালের দাম ১০ শতাংশ বাড়ালেই উন্নয়নশীল দেশগুলো যে সম্পত্তির অধিকারী হবে, তা বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের কাছ থেকে পাওয়া সমগ্র অর্থনৈতিক 'সাহায্যের' চেয়ে বেশি।

কাঁচামালের দাম বাড়ানোর সব দাবিই অবশ্য মার্কিন মনোপলিগুলো নস্যাৎ করে দিচ্ছে। কোস্টারিকা, পানামা, হণ্ডুরাস, গুয়াতেমালা, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া এবং অন্যান্য দেশের কলা, লেবু ও অন্যান্য বাগিচাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মার্কিন মনোপলি ইউনাইটেড ব্রান্ডস, ক্যাসল অ্যান্ড কুক এবং দেল মন্ত। যখনই এ-সব দেশের কোনো না কোনো সরকারের নীতি মনঃপুত না হয় তখনই নানা পন্থায় সরকার বদলাবার চেষ্টা করা হয়।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এ-সব দেশের মঙ্গল সাধন করেছে, এই গালগল্প যে কত মিথ্যে তার পরিচয় পাওয়া যাবে মুনাফার বৃদ্ধি এবং একচেটিয়াপতিদের লগ্নীর হারের দিকে তাকালেই। জাতি সংঘের তথ্যে দেখা যাচ্ছে ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লগ্নীকৃত পুঁজি বিদেশে রপ্তানী করা তহবিলের তিনভাগের এক ভাগ।

নয়া উপনিবেশবাদী সম্প্রসারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে নানা আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা। যেমন, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকন্সট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (IBRD)। এই ব্যাংকের কাজকর্মের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি, যেসব দেশে ব্যক্তিগত পুঁজি, সর্বোপরি বিদেশী পুঁজি গড়ে উঠছে সেসব দেশে ঋণ মঞ্জুর করা এবং পুঁজিবাদী বাজারের উপর উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নির্ভরশীল করে রাখার চেষ্টা করা।

১৯৭৫ সালে IBRD উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কাগজে কলমে ২.৬ শত কোটি ডলার ঋণ দিয়েছিল; আসলে দেশগুলো যে ঋণ পেয়েছিল তার প্রকৃত পরিমাণ হলো ০.৭ শত কোটি ডলার; কারণ ১.৯ শত কোটি ডলারই ব্যাংকে ফিরে এসে ছল debt servicing হিসেবে।

IBRD-এর একটি শাখা অ্যাসোসিয়েশন ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (AID) তার তহবিলের ২০ শতাংশই কৃষিক্ষেত্রে লগ্নী করেছে। এর বেশির ভাগটাই যায় কৃষিক্ষেত্রে একচেটিয়াপতিদের মদত যোগাতে। অন্য দিকে, সারা পৃথিবী জুড়ে যে কোটি কোটি ছোট জমির মালিকেরা রয়েছে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে কোনো রকম ঋণ দিতে IBRD অস্বীকার করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে IBRD যে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে তা প্রধানত গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনে পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিকশিত ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করর।

অল্পোন্নত দেশগুলোর সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রতিও IBRD-র নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গির কথা সুপরিজ্ঞাত। IBRD-র অভিমত হলো, "কেবল শিল্পায়নেই উন্নয়নশীল বিশ্বের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। কৃষিক্ষেত্রে উৎসাহদানই জাতীয় পুনর্জাগরণের অভীষ্ট লক্ষ্য পৌঁছনোর সবচেয়ে কার্যকর পথ।"

তদনুযায়ী ব্যাংকও চায় নব্যস্বাধীন দেশগুলোর সুষম অর্থনীতি (balanced economy) গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাকে বানচাল করে দিয়ে কাঁচামাল, প্রথমত, কৃষিজাত উৎপাদনের দিকে তাদের স্বতন্ত্র উদ্যোগকে ঠেলে দিতে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে এর পরিণতি হয় নঞর্থক। এর ফলে বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের অস্থির দৃষ্টিভঙ্গির উপর উন্নয়নশীল দেশগুলোর নির্ভরতা বেড়ে

যায়। বাস্তবে দাঁড়াচ্ছে কৃষিক্ষেত্রের উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপে উৎসাহদান আসলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে লুণ্ঠন করার একটি নতুন কায়দা। ( দ্র. WTUM-এর পত্রিকা WFTU)।

আমেরিকান গ্রন্থকার ফার্দিনান্দ লুন্ডবার্গ তাঁর "The Rich and the Super-Rich" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "কদলী প্রজাতন্ত্র"-রূপে (The banana republics) অভিহিত লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর উপর প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে প্রধানত আমেরিকার 'ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী'। এইসব দেশেই "পপ-কর্নের মতো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কেনাবেচা হয় এবং এখানেই থেকে থেকে উচ্চাভিলাষী বিদ্রোহীরা পূর্ববর্তী উচ্চাভিলাষীদের উৎখাত করে নিজেদের মুনাফার জন্য সরকার চালিয়ে থাকে।"

কৃষিক্ষেত্রে সক্রিয় ট্রান্সন্যাশনাল ও তাদের সহযোগীদের রাজনৈতিক স্বরূপ এটাই। একটি হিসেব অনুযায়ী আজ পৃথিবীতে একশটি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন, কৃষিক্ষেত্রে কাজকর্ম চালাচ্ছে। প্রথমেই রয়েছে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন, তারপর একে একে ব্রিটিশ, ফরাসী, জাপানী, জার্মান, ওলন্দাজ এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশ। সারা বিশ্বে এই ক্ষেত্রের যাবতীয় কাজকর্মের ৫২ শতাংশের প্রতিভূ এরাই। কৃষিক্ষেত্র থেকে ট্রান্সন্যাশনালগুলো বছরে আয় করে ২০ শত কোটি ডলার।

এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ বহু উন্নয়নশীল দেশের নিত্যসংগী হয়ে আছে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত ইকনমিক কমিশন ফর লাতিন আমেরিকার একটি গবেষণা অনুযায়ী, কৃষিজাত উৎপাদন এবং মজুতের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ওই একই; ফলে দুর্ভিক্ষ।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কোনো কোনো অংশে শিশুরা অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে, পাঁচ বছরের কম বয়েসী শিশুদের ৬০ শতাংশ মারা যায় প্রধানত দুর্ভিক্ষে।

কৃষিক্ষেত্রে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো যে "কৃষিজাত পণ্যের কারবার" (agro-business) ফেঁদে বসেছে তাতে কৃষির কাঠামোটাই বদলে গেছে; তারা প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন নতুন কৌশল কাজে লাগাচ্ছে, দেশের এবং বিদেশের বাজার নিজেদের মুঠোয় নিয়ে নিচ্ছে; ছোট ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদন নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের দাপটের কল্যাণে উৎপাদনের পথ থেকে তারা সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। (দ্র. WTUM)

জাতি সংঘের বিশেষজ্ঞদের হিসেবে ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে সারা পৃথিবীতে ১.২ কোটি শিশু না খেতে পেয়ে মারা গেছে। দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ২ শত কোটি মানুষকে এবং আরো ৮০ কোটি মানুষ রয়েছেন যাঁদের নিজস্ব বলতে কিছু নেই, কিন্তু তাঁরা বেঁচে আছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হলে একবিংশ শতাব্দী শুরু হবার আগেই ২০ কোটি মানুষ অনাহারে মারা যাবেন।

এই ধরনের বিপর্যয় অনিবার্য নয়। জাতি সংঘের ২৯তম অধিবেশনে গৃহীত "রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যবিষয়ক সনদ"-এর ২ নং ধারা মেনে চললেই এই বিপর্যয় সহজেই এড়ানো সম্ভব। এই ধারায় বলা হয়েছে, "নিজস্ব সম্পত্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মালিকানা ও ব্যবহার করা ও খরচ করার অধিকারসহ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর অধিকার ও সে অধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করার পূর্ণ ও স্থায়ী সার্বভৌমত্ব প্রতিটি রাষ্ট্রের রয়েছে··· আমন্ত্রাতা দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কোনোক্রমেই হস্তক্ষেপ করবে না।"

বাস্তবে অবশ্য ট্রান্সন্যাশনালগুলোর প্রভাব, ভূমিকা এবং কার্যকলাপ তথা অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাদের সৃষ্ট ক্ষমতা, মালিকানা এবং ক্ষমতা, উন্নয়নশীল দেশগুলোর সুনির্দিষ্ট অধিকার উপভোগের পথে অন্তরায়। জনগণের স্বাধীন বিকাশ সুনিশ্চিত করার একটি শর্ত যে তার নিজস্ব সম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ঘটে না আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর জন্য, কারণ মুখ্যত উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনীতির সমগ্র ক্ষেত্রই ট্রান্সন্যাশনালগুলোর কব্জায়।

কাঁচা মাল রপ্তানীর উপর প্রধানত যে সব দেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল এই ধরনের ঘটনার প্রতিক্রিয়া সে-সব দেশেই সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ উন্নয়নশীল দেশেরই এই দশা। এদের মধ্যে অর্ধেক নির্ভর করে রয়েছে একটি খনিজ সম্পদ রপ্তানীর উপর এবং বাকী অর্ধেক কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানীর উপর। গিনি থেকে রপ্তানী করা বক্সাইট উন্নয়নশীল দেশের সার্বভৌমত্ব খর্বের দৃষ্টান্ত। আন্তর্দেশীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কর্পোরেশনগুলোই আকরিক লোহা, তামা, সীসা, টিন, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, টাংস্টেন, মলিবডেনাম প্রভৃতি ধাতু উত্তোলন ও প্রক্রিয়ণ এবং কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন ও রপ্তানীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে।

সাম্প্রতিককালেও নিজেদের কাঁচামালের প্রাথমিক প্রক্রিয়ণের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভূমিকার কোনো হেরফের ঘটেনি। ১৯৭৩ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলো যত কাঁচামাল রপ্তানী করেছিল তার পরিমাণ ছিল ৮৩ শতাংশ, অর্ধ-সমাপ্ত সামগ্রী রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৬ শতাংশ ( ভারতের পাটজাত সামগ্রী এই পর্যায়ে পড়ে ), এবং তৈরি সামগ্রী রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১ শতাংশ। বলা বাহুল্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজেদের ইচ্ছেয় এমনটি ঘটছে তা মনে করার কোনো কারণ নেই।

শিল্প এবং আর্থিক ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর সমান আধিপত্য। প্রতিটি শাখায় মার্কিন অর্থনীতির বিপুল অগ্রগতির পিছনে ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে না গিয়ে আমেরিকার কৃষিক্ষেত্র ও তার বিকাশের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যাক।

বাইরে থেকে এসে যাঁরা আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন তাঁদের বিপুল অবদানের ফলেই কৃষিক্ষেত্রে ( এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও ) আমেরিকার এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। ১৮৪৬ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে ৫ কোটি দেশান্তরী মানুষ এই মহাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন ( দ্র. কে. এন. কাবরা ঃ "পলিটিক্যাল ইকনমি অব ব্রেন ড্রেন" )। প্রাকৃতিক সম্পদে আমেরিকা সমৃদ্ধ থাকলেও সেই সম্পদকে বিকশিত করার উপযুক্ত জনবল ছিল না। প্রবাসীরা এসে সেই প্রয়োজন মেটালেন। বিশেষ লক্ষ্যণীয়, এঁরাও প্রধানত গ্রামীণ কৃষক বংশোদ্ভূত ছিলেন।

অসকার এবং মেরী এফ. হ্যান্ডলিন তাঁদের "পজিটিভ কন্ট্রিবিউশন বাই ইমাইগ্রান্টস্"—গ্রন্থে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অদক্ষ শ্রমের প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত জরুরী। আমেরিকার নিজস্ব জনসংখ্যা নিঃস্ব না করে, ইনফ্রা-স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জনবল এইভাবে সংগৃহীত হলো। যেখানে দেশজ শ্রমিক বাহিনী মজুত ছিল না সেখানে প্রবাসীরা এসে অভাব পূরণ করলেন। বিনলে টমাস-এর ( "ইকনমিক্স অব ইণ্টারন্যাশনাল মাই-গ্রেশন" ) মতে, আন্তর্মহাদেশীয় "জনসংখ্যা স্থানান্তর, বৃদ্ধির একটি প্রধান শর্ত।"

আমেরিকায় দেশান্তরীদের আগমন চলতেই থাকল। এর কারণ আমরা পরে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখব। প্রক্রিয়াটি কিন্তু থামল না, আর এ থেকে আমেরিকাই লাভবান হলো।

আমেরিকায় এসে যাঁরা বসতি স্থাপন করলেন, তাঁরা বেশির ভাগই এলেন অবশ্য ইওরোপ থেকে। Statistical Abstracts of the US, 1946-51-এর হিসেবে ঃ

১৯৪৬-১৯৫০ সালের মধ্যে যাঁরা আমেরিকায় এসে বসবাস করছেন ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১. | ইওরোপ থেকে | ৫৬৮৬৩৮ |
| ২. | এশিয়া থেকে | ২৮৪১২ |
| ৩. | দক্ষিণ আমেরিকা থেকে | ২৪৫০৯০ |
| ৪. | অন্যান্য দেশ থেকে | ১১৯৪৭ |
| ৫. | সব দেশ থেকে মোট | ৮৬৪০৮৭ |

প্রাকৃতিক আনুকূল্য থেকে আমেরিকা ও তার আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কিভাবে লাভবান হয়েছে, এবার আমরা তা খতিয়ে দেখব। এ বিষয়ে বিশাল পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকা ও বিশাল সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তুলনা করে দেখা যেতে পারে।

ভৌগোলিক দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে শস্য উৎপাদশীল জমির ৬০ ভাগেরও বেশি ৪৯তম সমান্তরালের অনেক উপরে অবস্থিত। অন্যদিকে, এ বিষয়ে আমেরিকার অবস্থা অত্যন্ত অনুকূল। অক্ষাংশ স্মরণ রেখে, আমরা যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের মানচিত্রের উপর আমেরিকার মানচিত্রটি স্থাপন করি, তাহলে দেখতে পাব সোভিয়েত ইউনিয়নের বেশির ভাগ অংশটাই আমেরিকার উত্তরে পড়েছে, এবং কেবল মধ্য এশিয়ার দক্ষিণতম প্রান্তের খানিকটা এবং পামির আমেরিকার উপর পড়েছে। ফলে সূর্যের তেজও কম। অতি দীর্ঘস্থায়ী শীতকাল, দীর্ঘকাল মাটি প্রায় জমে থাকে বা বরফে ঢাকা থাকে, মাসের পর মাস তুষারপাতে অঞ্চলের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে, এক কণা ঘাসও জন্মাতে পারে না।

ফসলের মরশুম সোভিয়েত ইউনিয়নে অত্যন্ত অল্পস্থায়ী। গ্রীষ্মকালে দাবদগ্ধ বাতাস ও খরার আশংকাও রয়েছে এবং শীতের তুষারপাত ফিরে আসার আগে ফসল কাটার জন্য হাতে অপেক্ষাকৃত কম সময় পাওয়া যায়। তার উপর রয়েছে সুদূর বিস্তৃত জমি যার মধ্য দিয়ে পরিবহন ব্যবস্থা সংগঠিত করা দুষ্কর। আলাস্কা ও কানাডার অল্প কিছু অংশ বাদ দিলে সোভিয়েত কৃষি অঞ্চল বিশ্বে সবচেয়ে উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। আমেরিকায় ৭০ ভাগ জমিতে ফসলের মরশুম বছরে ১৭০ দিন, এর মধ্যে কোনো তুষারপাত ঘটে না। এই ধরনের জমি সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে মাত্র ১৫ শতাংশ। তার মানে

আমেরিকায় কৃষিকাজ করার উপযুক্ত দিনের সংখ্যা, ফসল কাটার উপযোগী হাতে পাওয়া সময় দুই-ই বেশি এবং আবহাওয়াও ভালো ফসলের অনুকূল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বাপেক্ষা উত্তরাঞ্চলীয় শস্য, সর্বপেক্ষা উত্তরাঞ্চলীয় চা, সর্বাপেক্ষা উত্তরাঞ্চলীয় আঙুর ইত্যাদি ফলায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফসল ফলানোর অঞ্চল—স্তাভরোপোল, ক্রাসনোদা, য়ুক্রাইন এবং কাজাখস্তানের প্রায় সবটা যে অক্ষাংশে অবস্থিত তা আমেরিকার মেজ ও অন্যান্য শস্য চাষের উপযোগী যথেষ্ট উষ্ণ বলে বিবেচিত হয় না।

এর পরেও রয়েছে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ও খরার প্রশ্ন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল আয়তনের দেশ, যার বেশির ভাগ অঞ্চল সমুদ্র ও জলাশয় থেকে দূরে অবস্থিত। একমাত্র ব্যতিক্রম উত্তর সাগর, সেখানেও চির-স্থায়ী শৈত্য ও বরফ। ওখান থেকে কেবল অত্যন্ত শুকনো আর হিমেল বাতাস বয়ে আসে। আদ্রর্তা যতটুকু থাকে তা আসে তুষারাবৃত অঞ্চলে তুষারপাতের আকারে। প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক থেকে কিছু পরিমাণ বৃষ্টি আসে কিন্তু বিপুল অঞ্চল জুড়ে নির্জলা মরুভূমি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ৪০ শতাংশ কর্ষণযোগ্য জমি এমন অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০০ মিলিমিটারের কম। আমেরিকায় এই ধরনের অঞ্চল মাত্র ১১ শতাংশ এবং এ-জাতীয় এলাকাকে কৃষিকাজের উপযুক্ত বিবেচনা করা হয় না। আমেরিকায় ৫০ শতাংশ চাষের জমি যেখানে অবস্থিত সেখানে বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭০০ মি.মি.। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমগ্র চাষের জমির মধ্যে অনুরূপ অঞ্চল মাত্র দশ শতাংশ কিন্তু সে দেশে ৩০ কোটি হেকটর মরুভূমি রয়েছে যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ১০০-১৫০ মি.মি. কি তার চেয়েও কম।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নে জমি অঢেল আছে বটে তবে তার অল্পই কৃষিকাজের উপযোগী। চাষ করা হয় সমগ্র অঞ্চলের ১০ শতাংশ, ২২.৫ কোটি হেকটর জমিতে।

মাথা পিছু চাষের জমির পরিমাণ কানাডায় ২.০৫ হেকটর; অস্ট্রেলিয়ায় ১.৫২ হেকটর; আর্জেণ্টিনায় ১.০০ হেকটর এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ০.৯ হেকটর। ( নয়া দিল্লীর সাপ্তাহিক 'নিউ এজ'-এ প্রকাশিত মাসুদ আলি খান-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )

এটাও বাস্তব সত্য যে, প্রধানত আমেরিকা নির্ভর ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরে-শনগুলো আমেরিকা ছাড়াও কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেণ্টিনা এবং পুঁজিবাদী

দুনিয়ার অন্যান্য দেশের কৃষিজাত উৎপাদন প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। হামেশাই তারা খাদ্যশস্য সহ কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য রাজনৈতিক স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করে। পি এল-৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী ভারতে পাঠানো খাদ্য থেকে যে অর্থ (ভারতীয় মুদ্রায়) মজুত হয়েছিল মার্কিন দূতাবাস কিভাবে তার অপব্যবহার করছে তার বিরুদ্ধে ভারতের সংসদে ও পত্রপত্রিকায় ক'বছর আগে যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল এ প্রসঙ্গে অনেকেরই তা মনে পড়বে।

আসলে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কলকাঠি নেড়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে খাদ্য আমদানীর জন্য আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর উপর অল্পোন্নত দেশগুলোর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। OECD-র সমীক্ষা অনুযায়ী অল্পোন্নত দেশগুলোর খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ ১৯৫৯-১৯৫৯ সালের ১.২ কোটি টন থেকে বেড়ে ১৯৭২ সালে দাঁড়িয়েছে ৩.৬ কোটি টন-এ। জোয়ান এডেলম্যান স্পেরো তাঁর "The Politics of International Eeonomic Relations" গ্রন্থে বলেছেন, অল্পোন্নত দেশগুলোর "অল্প-উন্নতির একটি প্রধান লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খাদ্যে ঘাটতি এবং পুষ্টির অভাব তথা খাদ্যে নির্ভরশীলতা।" এবং ট্রান্সন্যাশনালগুলো "খাদ্যে নির্ভরতা থেকে প্রচুর সুবিধে আদায় করে নিচ্ছে।"

শস্য আমদানী বাবদ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ব্যয় কিভাবে বেড়েছে তা লক্ষ্য করা যাক: ১৯৭১ সালে ৩.৭ শত কোটি ডলার, ১৯৭২ সালে ৩.৮ শত কোটি ডলার, ১৯৭৩ সালে ৭.৪ শত কোটি ডলার এবং ১৯৭৪ সালে ১২.৪ শত কোটি ডলার (পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

এর ফলে অল্পোন্নত দেশগুলোর সামনে নানান জটিল সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা, ব্যালান্স অব পেমেন্টের সমস্যা এবং আরো হাজারো সমস্যা। আমেরিকার তথাকথিত "সাহায্য" (aid) সমস্যার ভার লাঘব করার বদলে বরং বাড়িয়ে দিচ্ছে। জোয়ান এডেলম্যান স্পেরো বলছেন, "বাস্তবিক আমেরিকার খাদ্য সাহায্য কর্মসূচী—শান্তির জন্য খাদ্য পি এল-৪৮০—সাহায্য কর্মসূচী হিসেবে গৌণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এর মুখ্য কাজ ছিল মূল্য-সহায়ক কর্মসূচীর (price support programme) ফলে সৃষ্ট মার্কিন উদ্বৃত্ত (শস্য) পাচার করা। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের মধ্যেই এই ধরনের সাহায্য আরো মহার্ঘ হয়ে গেল, রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে গেল এবং তার ফলে পাওয়াও গেল কম। "এবং এ ছাড়াও··· অল্পোন্নত দেশগুলোও খাদ্যকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা দেখতে পেল।"

শিল্প ও আর্থিক ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও যতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জিত হয়েছে ট্রান্সন্যাশনালগুলো তা নিয়ে খুশি ও তৃপ্ত নয়। তাদের চাই আরো আরো।

১৯৮১ সালের ২৬ এপ্রিল অটোয়া থেকে পাঠানো UNI-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো তৃতীয় দুনিয়ায় বেশ বড় আকারে বীজের ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে। পরিবেশ বিষয়ক পত্রপত্রিকায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটি সবুজ বিপ্লবের দ্বিতীয় এবং বিপজ্জনক পর্যায়।

উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় সরবরাহকারীরা বিশেষ বিশেষ দুর্লভ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে এবং পশ্চিমের বীজ কোম্পানীগুলোর কাছে পাঠায়, সেখানে উদ্ভিদ গবেষণাকেন্দ্র এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোতে নতুন ধরণের উদ্ভিদ তৈরী করা হয়। এই সব নতুন জাতের উদ্ভিদের পেটেন্ট নিয়ে বাণিজ্যিক উদ্ভিদ প্রজননকারী এবং বীজের সরবরাহকারীরা, অন্য কেউ তা ব্যবহার করলে তার জন্য রয়্যালটি দাবী করে।

এখন কেনিয়া উষ্ণমন্ডলীয় লেগুম (legume) বীজ কিনে থাকে। এর উন্নতি ঘটিয়েছে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু বীজটি কেনিয়ার দেশজ সম্পদ। মূলে জিনিসটি কেনিয়া থেকে পাবার জন্য অস্ট্রেলিয়া কেনিয়াকে কোনো দাম দিয়েছে এমন কোনো তথ্য নেই।

আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বীজ বিক্রেতা বিশাল একটি ইংগ-ডাচ তৈলব্যবসায়ী এবং আমেরিকার মেজ ও সংকর সরঘুম বীজের বাজারের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করছে কেবল ৪টি ট্রান্সন্যাশনাল।

জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (FAO) জানাচ্ছে বিশ্বের পেটেন্ট নেওয়া কলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ একটি কোম্পানীর দখলে।

আর একটি গুরুতর ঘটনা হলো, অনেক বড় বড় কীটনাশক প্রস্তুতকারক সংস্থাও বীজের ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে। এইসব কোম্পানী এমন সব জাতের উদ্ভিদ তৈরি করবে যেগুলো কোনো বিশেষ ধরনের রাসায়নিক প্রয়োগ করলে ফুলে ফলে ভরে উঠবে। কাজেই কৃষকরা তখন আর কেবল বীজ কিনে ক্ষান্ত থাকবেন না, ভালো ফলনের আশায় কীটনাশকও কিনবেন।

ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে টমেটো ব্রীডাররা এমন এক জাতের টমেটোর বংশ বৃদ্ধি করছেন যেগুলো এক বিশেষ রাসায়নিক প্রয়োগ করলে তবে পাকবে।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর মতো পশ্চিমী সরকারগুলোও তৃতীয় দুনিয়া থেকে উৎপাদন নিয়ে জীন ব্যাঙ্ক (gene bank) গড়ে তুলছে।

অচিরেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো দেখবে তাদেরই উদ্ধার করা দেশজ গমের নানা রকমফের একমাত্র আমেরিকায় পাওয়া যাচ্ছে। কারণ বীজ সংগ্রহ ও মজুত করে রাখার সুযোগ-সুবিধে উন্নয়নশীল দেশগুলোর খুবই সীমিত। বীজ সংরক্ষণ করতে যে বিপুল অর্থ ও তার বিশেষজ্ঞসুলভ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা তাদের নেই।

বিগত কয়েক বছর ধরে জাতি সংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচী পূর্ব আফ্রিকা, হিমালয় ও আন্ডিয়ান অঞ্চলে নানা জাতের বীজ সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে এই ধরনের সংগ্রহ যাতে বিনা বাধায় চলতে পারে তার জন্য আন্তর্জাতিক বীজ ব্যাংকে সংগৃহীত বীজ জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। এ পর্যন্ত অবশ্য সংগৃহীত বীজ শিল্পোন্নত দেশের জাতীয় ব্যাংকগুলোতে জমা রাখা হয়েছে। এই ব্যাংকগুলো আসলে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে।

UNI-এর এই প্রতিবেদনে পুরো কাহিনীর অংশ মাত্র প্রকাশিত। উন্নয়নশীল দেশের সংবাদসংস্থাগুলো ট্রান্সন্যাশনালের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারলে এ ধরনের প্রতিবেদন ভবিষ্যতে আরো অনেক আসবে।

আজও উন্নয়নশীল দেশের সংবাদের মূল উৎস আমেরিকার UPI ও AP; ব্রিটেনের রয়টার এবং ফ্রান্সের AEP প্রভৃতি সংবাদসংস্থাগুলি। তেলের কারবারে যেমন সাত 'ভগ্নী', তথ্য সরবরাহেও তেমনি চার 'ভগ্নী'। উন্নয়নশীল দেশের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এবং বেতারে প্রচারিত সংবাদের ৮০ ভাগই ওই চারটি সংস্থা থেকে আসছে।

পুঁজিবাদী দেশে সংবাদ সরবরাহ করতে যেসব যন্ত্রপাতি লাগে তার ৫০ ভাগই উৎপাদন করে কয়েকটি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ফিলিপ্স্ (হল্যান্ড), সিমেন্স (পশ্চিম জার্মানি); এইটি টেলিফাংকেন (পঃ জার্মানি); আই বি এম, জি ই সি, আই সি সি, ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক, ওয়েস্টিং হাউস (আমেরিকা)। তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও এক ধরনের উপনিবেশবাদ কাজ করছে, আর এর স্রষ্টা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন।

তথ্য প্রচারে এই ধরনের উপনিবেশবাদ কি অসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে তা দেখানোর জন্য এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উধৃতিটি সংযোজন করার লোভ সংবরণ করা কঠিন।

—১৯৮১ সালের এপ্রিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার নয়াদিল্লী সফরে এলে বৃটিশ 'ডেলি মেল' পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা একটি গল্প ছাড়লেন যে, তিনি নাকি নয়া দিল্লীর সর্বত্র ইউনিফর্ম পরা সোভিয়েত সামরিক অফিসারদের দেখতে পেয়েছেন।—'প্যাসিফিক নিউজ সার্ভিসে'র নয়া বামপন্থী জনৈক মার্কিনী ফ্র্যাঙ্ক ভিভিয়ানো কিছুদিন আগে ভারতে এসেছিলেন। 'এনকোয়ারি' পত্রিকায় ভিভিয়ানো লিখেছেন, মোগলসরাই-এর কাছে ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি দেখলেন হাইওয়ে বেয়ে রাশিয়ান ট্রাকের কনভয় চলেছে।

নবম অধ্যায়

## জাতির সার্বভৌমত্ব গুরুতর বিপদের সম্মুখীন

আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলো মুখ্যত যে-ভাবে কাজ করে তাতে প্রতিটি দেশের উৎপাদিকা শক্তি আরো বেশি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে এবং সমন্বিত অর্থনৈতিক ভিত্তির বিকাশের প্রতিটি পথে বাধার সৃষ্টি হয়। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো সাম্রাজ্যবাদের নতুন চেহারা। তারা অবিকলভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে চলেছে। সেই সংগে এগুলো নয়া উপনিবেশবাদের দুর্গ এবং তা প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিরুদ্ধে উদ্যত।

গোড়ার দিকে এটা ছিল উন্নততর দেশ থেকে অল্পোন্নত দেশে কেবল পণ্য রপ্তানী। উন্নত দেশগুলোতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভব হলো, তারা আবার গড়ে তুললো একচেটিয়া পুঁজিপতি সংগঠন, যেমন কার্টেল, সিন্ডিকেট এবং ট্রাস্ট। কার্টেলগুলো বিচিত্র ধরনের নিরাপত্তামূলক শুল্কতালিকা তৈরি করলো যাতে রপ্তানীর জন্য নির্বাচিত পণ্য সামগ্রীর নিরাপত্তা রক্ষিত হয়। ঐ সময় অল্পোন্নত দেশগুলোতে হ্রাস-করা দামে এইসব পণ্যই রপ্তানী করা হতো। লেনিন যেমন বলেছেন, "দেশের ভিতরে কার্টেল তার পণ্য চড়া একচেটিয়া দামে বিক্রী করে কিন্তু বিদেশে প্রতিযোগীকে হঠানোর জন্য অনেক কম দামে বিক্রী করে।" প্রতিযোগী অন্য কোনো দেশের অন্য কোনো কার্টেলও হতে পারে আবার যে অনুন্নত দেশে কার্টেল তার পণ্য রপ্তানী করে সে দেশের স্থানীয় ব্যবসায়ীও হতে পারে। ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটেনের পণ্য রপ্তানীর এই নীতি ভারতীয় ব্যবসায়ী সংস্থাগুলোকে কিভাবে পথে বসিয়েছিল ভারত খুব হাড়ে হাড়েই তা জানে।

লেনিন বলেছেন। উপনিবেশিক নীতির মধ্য দিয়েই মংগোলির জন্ম। ঔপনিবেশিক নীতির অসংখ্য লক্ষ্যের সংগে লগ্নী পুঁজি (ফিনান্স ক্যাপিটাল) যোগ করেছে কাঁচামালের উৎস সন্ধানের সংগ্রাম, পুঁজি রপ্তানির সংগ্রাম এবং প্রভাবাধীন এলাকা সম্প্রসারণের অর্থাৎ মুনাফাজনক লেন-দেনের কনসেসনের, মনোপলি মুনাফার এলাকা সম্প্রসারণের সংগ্রাম। যাকে সাধারণভাবে বলা যায়

অর্থনৈতিক এলাকা সম্প্রসারণের সংগ্রাম ( লেনিন : সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চস্তর ) প্রক্রিয়াটির নিজস্ব যুক্তিসম্মত পথ রয়েছে : পণ্য রপ্তানী থেকে পুঁজি রপ্তানী, সরাসরি উৎপাদন ক্রিয়া রপ্তানী। একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো বিকাশলাভ করেছে। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তারের লড়াই এই একই প্রক্রিয়ার ধারাবাহী। কথনো কথনো সরাসরি আগ্রাসনের জন্য সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করা হয়, কথনো বা আগ্রাসনের কাজটা হয় গোপনে এবং তার সংগে যুক্ত হয় অর্থনৈতিক আধিপত্যের সূক্ষ্মতর রূপ। (দ্র. ট্রাইল্যাটেরালের দর্শন )

সব সময়েই মূল লক্ষ্যস্থল থাকে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ। এর কারণ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের ( সাম্রাজ্যবাদ ) পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং অল্পোন্নত দেশের স্বদেশী বুর্জোয়াজির আবির্ভাব, যদিও তারা এখনো কম বিপজ্জনক। দ্বিতীয়ত, এই অল্পোন্নত দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, অতএব ট্রান্সন্যাশনালগুলোর কাঁচামালের উৎস। তৃতীয়ত, অল্পোন্নত দেশগুলো পুরোনো ঔপনিবেশিক শাসন থেকে বেরিয়ে আসার পরেও এখনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বাস্তব অর্থ হলো ট্রান্সন্যাশনাল কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি। চতুর্থত, স্বল্প অগ্রগতির ফলে এইসব দেশে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশি আর তাই এদের অল্প-মজুরির ( সস্তা শ্রমের ) এলাকা বলে গণ্য করা হয়। সর্বশেষ কারণ হলো এইসব অল্পোন্নত দেশগুলো পুরোনো উপনিবেশ এবং আধাউপনিবেশ বলে এখনো ট্রান্সন্যাশনালগুলোর চিরাচরিত মৃগয়াভূমিই থেকে গেছে।

লেনিন বলেছেন, অর্থনৈতিক সত্তার দিক থেকে মনোপলিই সাম্রাজ্যবাদ। আধুনিক পৃথিবীতে মনোপলি রয়ে গেছে এবং নিজেকে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনে পরিণত করেছে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদ এখনো রয়ে গেছে। তবে পুরোনো আমলের সেই প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদের রূপে নয়, নতুন আকারে। আর এর ফলেই নয়া-উপনিবেশবাদ শব্দটির উদ্ভব।

অল্প-মজুরি, এলাকায় নতুন নতুন কারখানা খোলা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর সাধারণ নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। Citroen-এর ( ফরাসী ট্রান্সন্যাশনাল ) উপাদানের একটা বড় অংশ স্পেনে তৈরি হয়, তারপর তা ফ্রান্সে রপ্তানী করা হয়। আমেরিকা এবং কানাডার ট্রেড ইউনিয়নগুলো কিছু কিছু "পলাতক" সংস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করছে যে এরা মেক্সিকো অথবা ব্রাজিলের সস্তা শ্রমের এলাকায় গিয়ে ঘাঁটি গড়েছে।

একই সঙ্গে পুঁজি রপ্তানীকারক দেশগুলোতে কর্মক্ষমদের বেকার রেখে দেওয়া রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে, বিপুল শ্রম এইভাবে মজুত করে রেখে দিলে মজুরির ওপর চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

তারা কখনো কখনো স্বল্পকালের জন্য বন্ধ রেখে দেয়, উদ্দেশ্য অন্যত্র উচ্চতর মাত্রায় মুনাফা সন্ধান। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচারবিবেচনা করে তার ভিত্তিতে হাজার হাজার মাইল দূরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে, কাজেই দীর্ঘ-মেয়াদী কাজের সম্ভাবনা কি তার হিসেবনিকেশ করা সব সময়েই খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে জেনারেল মোটরস্ একচেটিয়াভাবে হল্ডেন গাড়ি নির্মাণ ও রপ্তানী করতো। রাতারাতি সে একদিন ঠিক করলো এখান থেকে হল্ডেন গাড়ি আর সে জাপানে রপ্তানী করবে না, করবে তার ক্যালি-ফোর্নিয়ার কারখানা থেকে। এর ফলে অস্ট্রেলিয়ার হল্ডেন প্রকল্পে অনেক শ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়ে গেল।

আমেরিকা থেকে জন ম্যানিং ওয়র্লড ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টকে লিখেছেন, "এই লেখার জন্য ৩০০০০০ অটো-কর্মী এবং ৭৫০০০ ইস্পাত-কর্মী কর্মচ্যুত; ২০ জুন ( ১৯৮০ ) থেকে ফোর্ড মাহ্ওয়া, এন, জে, প্রকল্প চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, চাকরি গেছে ৪০০০ জনের, মে মাসে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চিকাগোর উইসকনসিন স্টিল, চাকরি গেছে আরো ৪০০০ জনের, এবং এর উপর যাদের রুজিরোজগার নির্ভর করতো তাঁরা বিপর্যস্ত হলেন।"

কাজেই অল্পোন্নত দেশগুলোতে নিজেদের নয়া উপনিবেশবাদী নীতি অনুসরণ করা ছাড়াও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো নিজেদের দেশের শ্রমিক-দের ভবিষ্যৎও নষ্ট করছে।

কোম্পানির নিজের দেশে ট্রান্সন্যাশনালগুলো কিন্তু সবচেয়ে দক্ষ কর্মী, বিশেষজ্ঞ গবেষক ইত্যাদির সমাবেশ ঘটিয়ে থাকে। Roytheon যখন Cossor-এর সঙ্গে মিশে গেল তখন যাবতীয় গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এর ফলে, অধস্তন সংস্থাগুলো যে সব কর্মী নিয়োগ করেছিল তাঁদের চিরতরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হলো, সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে কিছুপরিমাণ দক্ষতা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল এবং দেশটির সামনে দক্ষ কর্মী খুঁজে পাবার বিষয়টিও সীমিত ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়লো। এতে প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত হন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতিরা। তাঁদের প্রমোশনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় অথবা গবেষণায়

কাজ থেকে বঞ্চিত হন। (দ্রঃ 'ট্রেড ইউনিয়নস এগেনস্ট মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিজ।)

এভাবেই 'মগজ ধাওয়া করা' (brain chase) এবং 'মগজ চালানের' (brain drain) রাস্তা তৈরি হয়। ব্যক্তিবিশেষ এবং দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। অন্য একটি অধ্যায়ে এ-নিয়ে আমরা চিন্তায়িত আলোচনা করবো।

উন্নয়নশীল দেশে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের আধিপত্যের সবচেয়ে গুরুতর দিক ওইসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠন। এর ফলেই শেষ পর্যন্ত ওইসব উন্নয়নশীল দেশের সর্বনাশ ঘটে। কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠনের এই পরিস্থিতির উত্তরাধিকার লাভ করেছে পুরোনো ঔপনিবেশিকতার সূত্রে। কোনো কোনো দেশ নতুন শিল্প স্থাপনে ও পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী কিন্তু দেখে নানা দিক থেকে তাদের হাত পা বাঁধা। নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণের কল্যাণেই এটা ঘটেছে।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের বিশেষ চারিত্র্যলক্ষণের জন্যই তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং সংঘাত বাধে যে-দেশে বসে তারা ব্যবসা করে সে দেশের সঙ্গে। ট্রান্সন্যাশনালের কাজকর্মের জাল সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ; এতে রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি না হয়ে পারে না। কোম্পানির আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও প্রেক্ষাপটে যে নীতি বৈধ, ট্রান্সন্যাশনাল সেই সব নীতিই অনুসরণ করবে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যেসব দেশে বসে তারা ব্যবসা করছে সেসব দেশের স্বার্থ ও প্রেক্ষাপটে ওই নীতি সহায়ক নয়। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর অধস্তন—যে সব দেশে বসে ব্যবসা চালাচ্ছে সেসব দেশের নীতির সঙ্গে ট্রান্সন্যাশনালের নীতির দ্বন্দ্বসংঘাত প্রায়শই দেখা যায়। এবং এ যাবৎ জাতি সংঘ কর্তৃক সামান্য কিছু সমীক্ষা এবং General Agreement on Trade and Tariff ইত্যাদিতে কিছু কিছু আলোচনা ব্যতীত ট্রান্সন্যাশনাল-গুলোর উপর কোনো আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়নি। অধিকারের এলাকা ইত্যাদি প্রশ্নও অমীমাংসীত রয়ে গেছে। কখনো কখনো আমন্ত্রাতা দেশ ও তাদের সরকারগুলোও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কাজকর্মের উপর ন্যূনতম আইনগত নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করতেও অক্ষম।

জাতি সংঘের ("মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনস্ ইন ওয়ার্লড ডেভেলপ-মেন্ট") মতে ১৯৬০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মার্কিন মালিকানাধীন প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ৩২·৮ শত কোটি ডলার থেকে বেড়ে ৮৬ শত কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই একই কালপর্বে পশ্চিম জার্মানির বিনিয়োগ ৭৫·৮১ কোটি ডলার থেকে

বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭˙৩ শত কোটি ডলারে ; ব্রিটেনের ১২˙০ শত কোটি ডলার থেকে ২৪˙০ শত কোটি ডলারে ; জাপানের ২৮˙৯০ কোটি ডলার থেকে ৪˙৫ শত কোটি ডলারে। ১৯৭০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক উৎপাদনের মূল্য (value) প্রায় ৩৩০ শত কোটি ডলারে পৌঁছেছে ; এই পরিমাণ মোট বৈধ রপ্তানীর মূল্যের চেয়ে ৩১০ শত কোটি ডলার বেশি।

আমরা আগেই দেখেছি আন্তঃ-পুঁজিবাদী দ্বন্দ্বের ফলে একটি উন্নত দেশ থেকে অপর একটি উন্নত দেশে পুঁজি রপ্তানী হয়ে থাকে। এইভাবে আমেরিকার পুঁজি ইউরোপে, কোনো ইউরোপীয় পুঁজি আমেরিকায় রপ্তানী হয় এবং একটি ইউরোপীয় দেশ অপর একটি ইউরোপীয় দেশে পুঁজি রপ্তানী করে, জাপান করে কয়েকটি উন্নত দেশে।

কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে রপ্তানী করা পুঁজির ক্রিয়াকলাপের ধরন ভিন্ন ভিন্ন। জাতি সংঘের মতে সমগ্র বৈদেশিক লগ্নীর প্রায় ৭০ শতাংশ যুক্ত রাজ্য এবং মার্কিন ট্রান্সন্যাশনালগুলোর দখলে কিন্তু মোট নির্মাণ করা সামগ্রীর উৎপাদন ও রপ্তানীতে তাদের অংশ যথাক্রমে ১৩ ও ২০ শতাংশ। অন্যদিকে, বেলজিয়ামে বৈদেশিক লগ্নীর অর্ধেকই মার্কিনী। বেলজিয়ামে বিদেশী সংস্থাগুলোর ভাগ—মোট জাতীয় উৎপাদনে ২৫ শতাংশ, সমগ্র বিক্রীতে ৩৩ শতাংশ, কর্মসংস্থানে ১৮ শতাংশ এবং রপ্তানীতে ৩০ শতাংশ। পশ্চিম জার্মানি ও ফ্রান্সে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব খুব বেশি নয়, ইতালি এবং জাপানে আরো কম।

জাতি সংঘের আর একটি হিসেব অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের মধ্যে সমস্ত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক লগ্নীর দুই-তৃতীয়াংশই করা হয়েছিল উন্নত দেশগুলোতে। এর মধ্যে নির্মাণে বিনিয়োগ করা হয়েছিল ৪৭˙৩ শতাংশ, পেট্রোলিয়ামে ২৩˙৬ শতাংশ, বিবিধ শিল্পে ২৩˙৯ শতাংশ এবং খনি ও গলন শিল্পে ৫˙২ শতাংশ।

এই সব দেশের মধ্যে কানাডাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বৈদেশিক লগ্নী আশ্রয় করেছিল। ১৯৬৭ সালের মধ্যে কানাডার নির্মাণ শিল্পের ৫২ শতাংশেরই মালিক ছিল বিদেশীরা, তার মধ্যে আমেরিকার ভাগ ছিল সবচেয়ে বেশি ৪৪ শতাংশ।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বাগে আনা বেশ কিছু পশ্চিমী দেশের পক্ষেও গুরুতর সমস্যা। অল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে সমস্যা যে আরো জটিল তা সহজেই অনুমেয়। উন্নত দেশের চেয়ে অল্পোন্নত দেশে ট্রান্সন্যাশনালের তাণ্ডব আরো অনেক বেশি।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সমর্থকরা যা-ই বলুন না কেন, আন্তর্জাতিক দক্ষতা যে-সব দেশে সক্রিয় সেখানকার দক্ষতা যে তারা খর্ব করেছে এবং জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির পথও রুদ্ধ করেছে, এই সত্য থেকেই যায়। কোনো নিয়ম কানুন অথবা নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ট্রান্সন্যাশনালগুলো তাদের উৎপাদন সীমিত করে, কৃত্রিমভাবে চড়া দাম রক্ষা করে, একচেটিয়া লাভ আদায় করে এবং দক্ষতা হ্রাস করে। নতুন পুঁজির ব্যবস্থা না করে স্থানীয় পুঁজি আত্মস্থ করেও ট্রান্সন্যাশনাল জাতীয় অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে; অনুপযোগী প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে, স্বদেশের বদলে বিদেশী ম্যানেজার নিয়োগ করেও তারা জাতীয় অগ্রগতিতে বাধা দেয়। এমন অনেক প্রযুক্তিবিদ্যা আছে যেগুলো ট্রান্সন্যাশনালের কাছেই পাওয়া যায় কিন্তু তার জন্যও আমন্ত্রাতা দেশকে চড়া দাম দিতে হয়; প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর ট্রান্সন্যাশনালের মনোপলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা ব্যবহারের জন্য তারা মনোপলি রেণ্ট আদায় করে থাকে। এছাড়া প্রযুক্তিবিদ্যাগত নির্ভরশীলতার আশংকা তো সব সময়েই থেকে যাচ্ছে। এই নির্ভরতা ঘরোয়া গবেষণা ও অগ্রগতির পথে অন্তরায়। এইভাবে আমন্ত্রাতা দেশকে সবসময়েই বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তিবিদ্যার মুখ চেয়ে থাকতে হয়। পরিচালনার দক্ষতা (managerial skill) বিষয়েও এই একই অবস্থা। এই দক্ষতা থেকে আমন্ত্রাতা দেশ কদাচিৎ উপকৃত হয়ে থাকে, কারণ আন্তর্দেশীয় অধস্তন সংস্থার পরিচালকরা সচরাচর আমন্ত্রাতা দেশ থেকে আসেন না এবং নিজেদের পরিচালন দক্ষতার বিকাশ ঘটাবার সুযোগ থেকেও ওইসব দেশ বঞ্চিত। (দ্র. UNCTAD সমীক্ষা: 'কনফ্লিক্ট অ্যান্ড কম্প্রোমাইজ')

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের এই পরিচালন দক্ষতা বিষয়ে অবশ্য অন্য একটি মতও রয়েছে। "Giant Business : Threat to Democracy গ্রন্থে T.K. Quinn লিখেছেন, "বাণিজ্য ও শিল্পের বহু প্রেসিডেন্টের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদিখানা চালাবারও মুরোদ নেই।"

ইদানিং সারা বিশ্বেই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কার্যকলাপ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। অন্যান্য গবেষণার মতো এক্ষেত্রেও ট্রান্সন্যাশনালের কার্যকলাপের প্রশ্নে একের সঙ্গে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের প্রভেদ ঘটেছে। কিন্তু ভিন্নতা সত্ত্বেও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ সকলেই করেছেন। অভিযোগটি হলো, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের অধস্তন সংস্থাগুলো যে-সব দেশে ব্যবসা করছে, ট্রান্সন্যাশনাল এবং তাদের স্বদেশী সরকারের কোনো সিদ্ধান্তই কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার সেসব

দেশের থাকে না। ন্যাট গোল্ডফিঙ্গার, রেমন্ড ভেরনম-এর মতো খ্যাতনামা লেখক, স্বতন্ত্র বুদ্ধিজীবী মহল এবং বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতি যাঁদের সমর্থন রয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমন্ত্রাতা দেশের স্বার্থ এবং আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের স্বার্থ সর্বদাই পরস্পরবিরোধী। বাস্তবেও দেখা যায়, যে-দেশে বৈদেশিক লগ্নী যত বেশি সে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি তত কম এবং এর বিপরীত ক্রমটাও সত্য।

বেশ কয়েকটি আমন্ত্রাতা দেশে নোংবা রাজনীতি আমদানী করার ব্যাপারে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের ভূমিকা নিয়ে জ্যাক এন. বেরমান তাঁর National Interests and Multinational Enterprise গ্রন্থে সুন্দর আলোচনা করেছেন। নানা উপায়ে ওইসব দেশে ট্রান্সন্যাশনাল রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সরকার যদি মনঃপুত না হয় তাহলে ট্রান্সন্যাশনাল সেই সরকারকে সরিয়ে মনোমত সরকার গদীতে বসায়। আর্থিক সহ নানা বেআইনী উপায়ে তারা ওইসব দেশের নির্বাচনেও নাক গলায়। শ্রীলংকা ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস-এর প্রেসিডেন্ট এম. জি. মেনডিস বলেছেন, জাতি সংঘ কমিশনের প্রতিবেদন ছাড়াও বহু গবেষণাতেই দেখা যাচ্ছে যে সংস্থাগুলি যেসব দেশে কার্যকলাপ চালাচ্ছে সে-সব দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছে। সার্বভৌম রাষ্ট্রের ঘরোয়া ও বৈদেশিক নীতিতেও তারা হস্তক্ষেপ করে।

এম. জি. মেণ্ডিস আরো বলেছেন যে, জাতি সংঘ কমিশন ট্রান্সন্যাশনালের ক্ষতিকারক প্রভাবের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে এবং ট্রান্সন্যাশনালের নারকীয় আচরণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী দলমত গঠনে সাহায্য করেছে।

শ্রীলংকায় বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে এম. জি. মেণ্ডিস বলেছেন, "আমার দেশ থেকেই একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে বাটা, নেসলে, সিলোন টোবাকো কোং--বিশ্বব্যাপী তামাক-জোটের একটি শাখা—এবং অন্যান্য ট্রান্সন্যাশনালগুলো, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে কলকাঠি নেড়ে শ্রীলংকার যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করতে চেষ্টা করেছে।" কারণ, তিনি বলেন, "সরকার ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বেশ কটি ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা, বাগিচা জাতীয়করণ এবং এই জাতীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।"

তিনি আরো বলেন, "তারা ( আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ) যে বিগত সরকারকে পরাজিত করার জন্য নির্বাচনী প্রচারে অজস্র অর্থব্যয় করেছিল তা

সুবিদিত। এবং এখন সেই ফয়দা লুটছে। আজ শ্রীলংকায় ট্রান্সন্যাশনালের পোয়াবারো।"

জোআন এডেলমান স্পেরো-র মতে, 'বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো (Multinational Corporations) জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে, অর্থাৎ জনসাধারণের রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির রূপ দিতে পারে। এইসব কাজ সংস্থাটি নিজে নিজে, স্বদেশী সরকারের প্ররোচনায় অথবা স্বদেশী সরকারের সমর্থন নিয়ে করতে পারে।"

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর কাজকর্মের কুফল সবচেয়ে বেশি ভোগ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো। এসব দেশ থেকেই তারা সবচেয়ে বেশি মুনাফা লোটে। 'ওয়ার্লড ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট' প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ষাটের দশকের শুরুতে ট্রান্সন্যাশনালের মুনাফার পরিমাণ উন্নত দেশগুলোতে ছিল ১০.২%, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ছিল ১৭.৯%; সত্তর দশকের গোড়ায় ছিল যথাক্রমে ১০.৫%, এবং ২১.০%, আর সত্তর দশকের শেষে তা বেড়ে দাঁড়ালো যথাক্রমে ১১.৯% এবং ২৫.২%।

এতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ জাতি সংঘের যাবতীয় ঘোষণা সত্ত্বেও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোর বহু স্বাধীন সিদ্ধান্তই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো বানচাল করে দিয়েছে, কারণ বহু উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থনীতির সমগ্র ক্ষেত্রই তাদের কব্জায়। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপারে তাদের নীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ধারিত করে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এবং সেই নীতির লক্ষ্য কর্পোরেশন ও তার দেশের স্বার্থসিদ্ধি। এইরকম ট্রান্সন্যাশনাল নীতি কখনোই উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খেতে পারে না।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের বিনিয়োগের নীতিও উন্নয়নশীল দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের পাশাপাশি দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। সম্প্রতি পশ্চিম বার্লিন থেকে "The Governments of the developing countries and investments abroad" নামে একটি বই বেরিয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, "উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলিকে অবশ্যই চিরতরে দীর্ঘকালের জন্য একটি সংস্থার ব্যক্তিগত মালিকানা সুনিশ্চিত করতে হবে। অর্থ ও আর্থিক, কর ও মূল্যনীতি সম্পর্কেও সরকারগুলিকে অবশ্যই সাধারণ আইনগত প্রকৃতির

নিশ্চয়তা দিতে হবে, যাতে বিনিয়োগকারী অন্তত ন্যূনতম নিশ্চয়তা নিয়ে ব্যবসা করতে সমর্থ হয়।"

সব কটি তরুণ উন্নয়নশীল দেশেরই নিজস্ব উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। নিজেদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগতির কথা মনে রেখে তারা অবশ্যই এইসব পরিকল্পনা রূপায়িত করতে চাইবে। উন্নয়নশীল দেশের এইসব পরিকল্পনা অগ্রাধিকার ভিত্তিক লগ্নীর উপর নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন, যাতে কোন্ ক্ষেত্রে কতটা সরকারী সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে তা লগ্নীকারী খতিয়ে দেখতে পারে।

বেশীর ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই ব্যালান্স অব পেমেন্ট-এ সাধারণত ঘাটতি থাকে। কাজেই সরকারকে অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে ; তদুপরি, প্রয়োজন হলে, বিদেশী লগ্নীকারীকে তাঁর পুঁজি প্রত্যাহারের শর্তাবলী ও পথও অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দিতে হবে। এইসব লগ্নীকারীর যদি বিদেশ থেকে কাঁচামাল অথবা অর্ধ-সমাপ্ত সামগ্রী আনার প্রয়োজন হয় তাহলে তারা যাতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা পেতে পারে তারও নিশ্চয়তা দিতে হবে। অথবা রপ্তানী সরবরাহ শাখার (export supply branch) মতো তারাও ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ দাবী করবে। তদুপরি, এইসব কাঁচামাল অথবা অর্ধ-সমাপ্ত সামগ্রীর দীর্ঘমেয়াদী বাঁধা পাইকারী দরও ঠিক করে দিতে হবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, পুঁজি বিনিয়োগের নিয়ম কানুনের সঙ্গে সঙ্গেই উন্নয়নশীল দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের সূত্রপাত। বিষয়টি, উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কর্মকৌশলের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। এরপর তার যাবতীয় কাজকর্মেই দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চলতে থাকবে। কোন উন্নয়নশীল দেশের কোন কাঁচামাল তোলা অথবা প্রক্রিয়ণ করা হবে এবং আদৌ হবে কি না অথবা প্রক্রিয়ণ শিল্পের কোন্ শাখা খোলা হবে এ-সবই ঠিক করবে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন। ( দ্রঃ হান্স কানুনাপিন ঃ 'দ ওয়ার্লড ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট' )

জোয়ান এডেলমান স্পেরো দেখিয়েছেন তৃতীয় দুনিয়ার সমগ্র বৈদেশিক ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ৬৩ শতাংশই ১৬টি উন্নয়নশীল দেশের অধিকারে। দেশগুলো হলো ঃ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, নাইজেরিয়া, লিবিয়া, ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জামাইকা, পানামা, ত্রিনিদাদ, টোবাগো, ইরান, সৌদি আরব, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া। লেখক মনে করেন, বিদেশী লগ্নীর যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) একটা বড় অংশ যে এখনো কৃষি ও সেবা-র (Service) ক্ষেত্র থেকে আসে, এ-কথা অনস্বীকার্য। কাজেই এইসব দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের দান খুব বেশি নয়। কিন্তু মোট স্থানীয় লগ্নীর পরিমাণ, স্থানীয় উৎপাদন এবং বিক্রয়ে—বিশেষত ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে—বিদেশী লগ্নীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ( দ্রঃ রেমন্ড ভের্নন ঃ 'সভারেন্টি অ্যাট বে ঃ দ মাল্টিন্যাশনাল স্প্রেড অব ইউ এস এন্টারপ্রাইজেস্' )

উন্নয়নশীল দেশের প্রধান প্রধান শিল্পে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের কাঁচামাল যে সব সময়েই ট্রান্সন্যাশনালের নিয়ন্ত্রণে সে কাহিনী পুরনো, এসব কাঁচা মালই অগ্রসর দেশের শিল্পবিকাশের ভিত্তি। পরবর্তীকালে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন উন্নয়নশীল দেশের নির্মাণ ক্ষেত্রেও গেড়ে বসলো। এইসব দেশের পেট্রোলিয়াম, তামা, অ্যালু-মিনিয়াম, কেমিক্যাল, পরিবহন, খাদ্যদ্রব্য এবং যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশনালের লগ্নী আরো পুঞ্জীভূত হলো। এই আধিপত্যের ফলে ঐসব সামগ্রীর সরবরাহ এবং মূল্য প্রায় পুরোপুরিই নিয়ন্ত্রণ করে ট্র্যাসন্যাশনাল। গঠনটা যেহেতু নির্দিষ্ট অল্প সংখ্যক ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত তাই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের হাতেও অগাধ ক্ষমতা।

এর ফলে ট্রান্সন্যাশনালগুলো উন্নয়নশীল দেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থায় থাকে—যে সিদ্ধান্ত উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের মাত্রায়, উন্নয়নের নীতির দিক নির্দেশে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করে। আর ট্রান্সন্যাশনাল কখনোই স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় না। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, উন্নয়নশীল দেশের বিকাশ কোন্ পথে হবে তার কলকাঠি প্রধানত নাড়া হবে নিউ ইয়র্ক, ডেট্রয়েট অথবা লন্ডনের পর্ষদ কক্ষ থেকে।

প্রায় হুকুমদারী চালাবার মতো অগাধ ক্ষমতা হাতে থাকায় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে প্রায়শ দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে। বলা বাহুল্য এই ধরনের হস্তক্ষেপ ট্রান্সন্যাশনালের স্বার্থ পূরণের জন্য, উন্নয়নশীল দেশের মঙ্গলের জন্য নয়। আইনানুগ এবং বেআইনী দুভাবেই ট্রান্সন্যাশনাল ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে, এসব কাজের মধ্যে রয়েছে জনসংযোগ, প্রচারে চাঁদা দেওয়া, ঘুষ ইত্যাদি। স্মরণ করা যেতে পারে একটি মার্কিন ট্রান্সন্যাশনালের ঘুষের কেচ্ছা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় জাপানে যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ হয়েছিল তার ফলে সরকারের পতন ঘটে।

যে কোনো দেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সময় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন তাদের বিশাল সঙ্গতিকে কাজে লাগাতে পারে। বিপুল আর্থিক সংগতির সঙ্গে আ-বিশ্ব কাঠামো যুক্ত হওয়ায় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন সত্যি সত্যিই অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এবং তাই, জোয়ান এডেলমান স্পেরো যেমন বলেছেন, "রাজনীতিতে বহুজাতিক সংস্থা-গুলোর অংশগ্রহণ জাতীয় সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জ করার গূঢ়ার্থ এবং কখনো কখনো বাস্তব রূপের অর্থবাহী।"

আমরা আগেই দেখেছি এইসব ট্রান্সন্যাশনালগুলো তাদের নিজেদের দেশেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে থাকে। এরা চাপ দিয়ে তাদের সরকারকে দিয়ে যে কোনো কাজ করিয়ে নিতে পারে, বাধ্য করতে পারে বিশেষ কোনো বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে। দেশীয় সরকারের এইসব কাজ ও নীতি, যেসব দেশে ট্রান্সন্যাশনাল ব্যবসারত সে-সব দেশের সরকারকেও প্রভাবিত করে। আমন্ত্রাতা সরকারের সমর্থনের দৌলতে ট্রান্সন্যাশনালগুলো, তাদের ও উন্নয়নশীল দেশের সরকারের মধ্যেকার গুরুতর ভারসাম্যহীনতাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে। এর বাস্তব ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোই সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমরা এ-ও দেখেছি, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো আমন্ত্রাতা দেশে তেমন বেশি পরিমাণ পুঁজি আনে না, বরং তারা তাদের চাহিদামত অর্থ স্থানীয়ভাবেই সংগ্রহ করে নেয়। স্থানীয় সংগতির এ আর এক ধরনের শোষণ, ফলে আঞ্চলিক সংস্থা ও উদ্যোক্তাদের কর্মোদ্যোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে। স্থানীয়-ভাবে পাওয়া অর্থ ট্রান্সন্যাশনাল জাতীয় মালিকানাধীন সংস্থা পুনর্গ্রহণের কাজেও ব্যবহার করে।

ব্রাজিল ও মেক্সিকো সম্পর্কে জোয়ান এডেলমান স্পেরো নিম্নলিখিত তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। ৪৩ শতাংশ মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন মেক্সিকোতে প্রবেশ করেছিল স্থিত সংস্থা অধিগ্রহণ করে এবং এইসব সংস্থার ৮১ শতাংশেরই আগে মালিক ছিলেন মেক্সিকানরা। আর ব্রাজিলে সেখানকার স্থানীয় সংস্থা অধিগ্রহণ করে ৩৩ শতাংশ মার্কিন ট্রান্সন্যাশনাল কাজ শুরু করেছিল। ষাট দশকের শেষে এবং সত্তর দশকের গোড়ায় অধিগ্রহণসূত্রে ৫০ শতাংশ নতুন ট্রান্স-ন্যাশনাল ব্রাজিলে প্রবেশ করে, এর মধ্যে ৬৩ শতাংশেরই মালিক আগে ছিল ব্রাজিলিয়ানরা।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন নিয়ে যেসব বাস্তব সমীক্ষা হয়েছে তার

প্রতিটিতেই বলা হয়েছে, এরা তৃতীয় দুনিয়ার দেশে বিকৃত এবং অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটায়। কখনো কখনো ট্রান্সন্যাশনাল উন্নত বেষ্টনী অথবা কর্ণার তৈরী করে, বৃহত্তর অর্থনৈতিক বিকাশে কখনোই যার কোনো ভূমিকা থাকে না। এসব জায়গায় এমন ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করে যা স্থানীয় এলাকার পক্ষে যথাযথ নয় এবং খুব অল্পসংখ্যক স্থানীয় লোককেই চাকুরিতে নিয়োগ করে ; এরা বাইরে থেকে কর্পোরেশন নির্ধারিত অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে সরবরাহ সংগ্রহ করে, কখনোই তা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত হয় না ; তারা 'ট্রান্সফার প্রাইস' ব্যবহার করে, কর ফাঁকি দেবার জন্য প্রযুক্তিবিদ্যাগত চুক্তির শর্ত নির্দেশ করে এবং আয় সর্বদাই ট্রান্সন্যাশনালের স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়।

এই সীমিত বেষ্টনী প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক বিকাশে বাধা দেয়। স্থানীয় অর্থনীতির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েই এই বেষ্টনী (enclave) অর্থনীতি বিকাশ লাভ করে। তারা স্থানীয় পুঁজি দখল করে, দেশ থেকে পুঁজি সরিয়ে দেয় ; স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ধ্বংস করে, তারা যথাযথ নয় এমন চাহিদা সৃষ্টি করে, ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বাঞ্ছিত উৎপাদন পথভ্রষ্ট হয়।

উন্নত দেশের চেয়ে উন্নয়নশীল দেশ থেকেই যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন উচ্চতর হারে মুনাফা লুটে থাকে তা সুবিদিত। তদুপরি তেল, খনি এবং গলনশিল্পে ট্রান্সন্যাশনাল লগ্নীর পুঞ্জীভবন উন্নত দেশগুলোরই প্রয়োজন মেটায়। অন্যদিকে এই প্রক্রিয়া উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির পরনির্ভর চরিত্রকেই প্রকট করে। তাছাড়া আরো নানা উপায়েও ট্রান্সন্যাশনাল প্রদর্শিত হিসেবের বাইরে লাভ করে। এর মধ্যে রয়েছে, রয়্যালটি প্রদান, অন্তর্বর্তী উৎপাদনে ট্রান্সফার প্রাইসিং, লাইসেন্স ফি, রপ্তানী ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে চুক্তির নিয়ন্ত্রক ধারা ইত্যাদি।

এছাড়াও শর্তাধীন ঋণ, turn key প্রকল্প, যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদির ফলেও বৈদেশিক লগ্নীর খরচ বেড়ে যায়; একই সঙ্গে এই ধরনের পদ্ধতি বহু খরচ গোপন অথবা একেবারে অস্পষ্ট রেখে দেয়। তারপর, উন্নয়নশীল দেশে যে-কোনো লগ্নী করার সময় ট্রান্সন্যাশনাল সর্বদাই উন্নয়নের কৌশল সম্পর্কে 'উপদেশ' দিতে চাইবে। এই 'উপদেশ' শর্তের রজ্জু ছাড়া আর কিছু নয়। এটাও উন্নয়নশীল দেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ।

সত্যি কথা বলতে কি, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যা দিচ্ছে, নিচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি। Multinational Companies and the Third World গ্রন্থে লুই টার্নার বলেছেন, "পরিস্থিতি এখন

এমনই শোচনীয় যে সত্তর দশকের মধ্যেই…তৃতীয় দুনিয়ার এক বিরাট অংশ" সাহায্য হিসেবে যা পেয়েছে "তার চেয়ে বেশি উন্নত দেশগুলোতে ফিরিয়ে দেবে" (বাস্তবিক তা দিয়েছেও)। ১৯৬৫-৬৭ সালে লাতিন আমেরিকায় দেওয়া সামগ্রিক সাহায্যের ৮৭ শতাংশই লেগেছিল ঋণ পরিশোধে, আফ্রিকায় এর পরিমাণ ছিল ৭৩ শতাংশ, পূর্ব এশিয়ায় ৫২ শতাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে ৪০ শতাংশ। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে এমন সময় গেছে যখন লাতিন আমেরিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা অধ্যুষিত ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে থেকে মোট ২.৫ শত কোটি ডলারের সম্পদ বেরিয়ে গেছে।

উন্নয়নশীল দেশে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের ঘটনাকে কে. এন. কাবরা "প্রযুক্তিবিদ্যাগত উপনিবেশবাদ" বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পুঁজি রপ্তানীর ফলে জোর করে এবং অত্যধিক চড়া দামে বেশির ভাগ অনুপযুক্ত প্রযুক্তি-বিদ্যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পাঠানো সম্ভব হয়েছে, এসব প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নত দেশের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে উদ্ভূত। প্রধানত ট্রান্সন্যাশনালের এজেন্সি এই কাজ করে থাকে। ট্রান্সন্যাশনাল যত বেশি করে ঢুকে পড়ছে ততই গণ্ডগোল বাড়ছে। তারা মজুরি ও মাইনের কাঠামো, ভোগের ধরন, ব্যবসার কায়দাকানুন, রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি আনয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে এমন সব কাজ করে যা জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সংগতপূর্ণ তো নয়ই বরং তার পরিপন্থী।

অর্থনৈতিক দিক থেকে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো উন্নয়নশীল দেশ-গুলোকে কিভাবে শোষণ করছে জাতিসংঘের পরিসংখ্যানে তার পরিচয় উদ্ঘাটিত। এই হিসেব অনুযায়ী, সত্তর দশকে উন্নয়নশীল দেশে ট্রান্সন্যাশনাল লগ্নীর পরিমাণ, ঐসব দেশ থেকে ট্রান্সন্যাশনালের স্বদেশে পাঠানো সম্পদের মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ।

এইরকম শোষণের কল্যাণেই বেশির ভাগ আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের স্বদেশ আমেরিকা এত সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পেরেছে। বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশের বাস আমেরিকায়। কিন্তু এই দেশটি বিশ্বে এখনো যে সম্পদ রয়েছে তার ৭১ শতাংশ ভোগ করে।

এতেও তৃপ্তি নেই, ট্রান্সন্যাশনাল আরো চায়। আর তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে আরো বেশি করে মাথা গলানো। আইনানুগ এবং বেআইনী দুভাবেই তারা রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। এ কাজের ফলশ্রুতি জাতির সার্বভৌমত্ব খোলাখুলি অমান্য করায় প্রতিফলিত। গোয়েন্দাগিরির কাজ আড়াল করার জন্য ট্রান্সন্যাশনাল সক্রিয়, তার প্রমাণ আছে।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে মার্কিন সেনেটের শুনানী থেকে জোয়ান এডেলমান স্পেরো কিছু কিছু নজীর সংগ্রহ করেছেন।

এই নজীর অনুযায়ী, "আমন্ত্রাতা দেশের রাজনীতিতে জঘন্যতম বহুজাতিক হস্তক্ষেপের অন্যতম দৃষ্টান্ত এবং যা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন কর্তৃক বহুবিধ রাজনৈতিক বিপদাশঙ্কা সৃষ্টির জাজ্বল্যমান নজীর তা হলো ১৯৭০-এর গোড়ায় চিলিতে আন্তর্জাতিক টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কোম্পানির (ITT) হস্তক্ষেপ।" সালভাদোর আলেন্দে যাতে চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে না পারেন তার জন্য ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ITT প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। তারপর ITT চাইল তাকে গদীচ্যুত করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে কাজ করলো। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ITT আলেন্দে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও গোপনে নানা বেআইনী কাজ করতেও পেছপা হয়নি।

চিলিতে ITT-র প্রধান বিনিয়োগ Chiltelco, একটি লাভজনক টেলিফোন কোম্পানি, যার মূল্য ১৫'৩ কোটি ডলার। চিলিতে আগেকার বিভিন্ন সরকারের সংগে ITT-র সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। সে দেশে তার ব্যবসাও ভালো চলতো। ১৯৭০ সালে চিলির প্রেসিডেন্ট ছিলেন এদুয়াদো ফ্রেই। ঘটনা প্রবাহে মনে হলো তিনি প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত নাও হতে পারেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সালভাদোর আলেন্দে বিদেশী কোম্পানি জাতীয়করণের কথা তুলেছেন, হয়তো নির্বাচনে তিনিই জিতে যাবেন। অতএব ITT (Chiltelco) আসরে নেমে পড়লো। আলেন্দে যাতে নির্বাচিত হতে না পারেন তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে।

রক্ষণশীল প্রার্থী জর্জ ই. আলেসান্দ্রিকে সমর্থন জানালো ITT। ITT-র সংগে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ITT ঠিক করলো আলেসান্দ্রির অর্থ যোগাবে। সিআইএ-র প্রাক্তন ডিরেক্টর জন ম্যাককোন ITT'র বোর্ড অব ডাইরেকটর্স-এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। ITT-র প্রেসিডেন্ট হ্যারল্ড গ্রীন-এর সংগে পশ্চিম গোলার্ধে সিআইএ-র গোপন কাজকর্মের ভারপ্রাপ্ত উইলিয়াম ভি. ব্রো-এর এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিলেন ম্যাককোন। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসের বৈঠকে গ্রীন আলেসান্দ্রির নির্বাচনী তহবিলের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব দিলেন ; অর্থ নিয়ন্ত্রণ ও খরচাপাতি করবে সিআইএ।

আলেন্দে-বিরোধী রক্ষণশীল সংবাদপত্রের জন্যও ITT কড়ি যোগালো। এত কাঠখড় পুড়িয়েও কিন্তু আলেসান্দ্রির পক্ষে নির্বাচনী হাওয়া ঘোরানো

গেল না। আলেন্দে নির্বাচিত হলেন ৩৬.৩ শতাংশ গণভোট পেয়ে। আলেসান্দ্রি পেলেন ৩৪. শতাংশ ভোট। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির অপর প্রার্থী রাদোমিরো তোমিক ভোট পেলেন ২৭.৮ শতাংশ।

চিলির সংবিধান অনুযায়ী যদি কোনো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ গণভোট না পান তাহলে প্রেসিডেন্ট পদের মীমাংসা হবে কংগ্রেসের ভোটে। এই ভোট হয় গণভোট গৃহীত হবার ৭ সপ্তাহ পরে। কাজেই ITT এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো কংগ্রেসের ভোটপর্বের উপর, যাতে আলেন্দের বিপক্ষে, আলেসান্দ্রির পক্ষে এই নির্বাচনকে ঘোরানো যায়। আলেন্দেকে ঠেকানোর জন্য প্রেসিডেন্ট গ্রীন এবং ITT-র বোর্ড অব ডাইরেক্টরস ১০ লক্ষ ডলার পর্যন্ত ব্যয় করা ঠিক করলেন।

চিলিতে ITT-র দু'জন এজেন্ট বব বেরেলেজ এবং হল হেনড্রিক্স নিউ ইয়র্কের সদর দপ্তরে যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে, আলে-সান্দ্রিকে আর্থিক ও অন্যান্য সমর্থন ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে আলেন্দের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে রেডিও, টেলিভিশন ও আলেন্দে-বিরোধী রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলোকে যেন সরাসরি সাহায্য করা হয়। আরো প্রস্তাব করা হয়েছে, আলেন্দে-বিরোধী প্রচারকার্যে জড়িত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের পত্নী ও শিশুদের বাসস্থানের জন্য family relocation centre-ও যেন গড়ে তোলা হয়। আলেন্দের বিরুদ্ধে ইওরোপ এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে প্রচার চালানোরও প্রস্তাব করা হয়েছিল। এইসব সুপারিশ কোম্পানির নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

আলেন্দেকে ঠেকানোর একটি পরিকল্পনা সমর্থনের জন্য ম্যাককোন তৎ-কালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার এবং সিআইএ ডাইরেকটর রিচার্ড হেলমস্-কে ১০ লক্ষ ডলার দিতে চেয়েছিলেন। কিসিঞ্জারের দপ্তরের ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মীদেরও ঐ একই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

এই সময় একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটলো। চিলিতে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে আলেন্দেকে ঠেকানোর একটি পরিকল্পনা সমর্থনের জন্য সি আই এ ব্রো-র মাধ্যমে ITT-র শরণাপন্ন হলো। বিদেশী ব্যাংক ও কর্পোরেশনগুলোর সহযোগিতায় সি আই এ চাইলো অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে যাতে চিলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ঘনিয়ে আসে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলো ছিল : ঋণদান স্থগিত এবং জাহাজে দেরী করে মাল তোলা। আশা করা হলো, এই

জাতীয় বিকল্প হলো সরকারী মালিকানাধীন সংস্থা। অন্যদিকে, ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পের ক্ষেত্রই হলো সে দেশে ট্রান্সন্যাশনাল অনুপ্রবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ। ভারতের প্রেক্ষাপটে বিশেষ দিকটি নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা এটি পরীক্ষা করবো।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন যে অল্পোন্নত দেশে শিল্প বিকাশে আদৌ আগ্রহী নয়, সারা বিশ্বেই তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। ট্রান্সন্যাশনালের যত উৎসাহ উন্নয়নশীল দেশের খনিশিল্পে—এটা ইতিহাসের সত্য। এর কারণ নিজেদের শিল্পের প্রসার এবং অস্ত্র উৎপাদনের জন্য ট্রান্সন্যাশনালের প্রয়োজন প্রাকৃতিক সম্পদ।

Chase Manhattan Bank-এর হিসেবে উন্নয়নশীল দেশে সরাসরি মার্কিন বিনিয়োগের ৫৮ শতাংশই দখল করে আছে তেল নিষ্কাশন ও খনিশিল্পের অন্যান্য শাখা এবং আকরিক ধাতুগলন শিল্প। অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশ সম্পর্কেও এ-কথা সত্য। আর খনিশিল্পে বিদেশী লগ্নীর প্রায় অর্ধেকই তেল নিষ্কাশনে।

এই ব্যাংক যে সব তথ্য পরিসংখ্যান সরবরাহ করেছে তাতে এ-ও প্রমাণিত যে, উন্নয়নশীল দেশের কাঁচা মাল নিয়ে ট্রান্সন্যাশনালের কাজকর্মের বৈশিষ্ট্যই হলো, কয়েকটি রাঘববোয়াল মনোপলির হাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা মালের উৎপাদন পুঞ্জীভূত হওয়া। তামা উৎপাদনে আধিপত্য করছে ৮টি সাম্রাজ্যবাদী মনোপলি। এই সেদিনও ৭টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি (তথাকথিত সাত ভগ্নী) আধিপত্য করে গেছে।

উন্নয়নশীল দেশে ট্রান্সন্যাশনালের কাজের ধরনটাই লুঠতরাজের; ফলে তাদের নির্মম শোষণে ঐ সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষিতপ্রায়। কায়দাটা নয়া উপনিবেশবাদী; আর উন্নয়নশীল দেশের সার্বভৌমত্ব সর্বদাই বিপন্ন। আর, উন্নয়শীল দেশ থেকে ট্রান্সন্যাশনাল যে দামে কাঁচা মাল কেনে এবং যে দামে নির্মিত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি উন্নয়নশীল দেশে বিক্রী করে—এই দুয়ের মধ্যে সব সময়েই বিরাট ফারাক থেকে যায়। "Supermnopolies—the New Weapon of Imperialism" গ্রন্থে রিচার্ড ওভিনিকভ যে হিসেব দিয়েছেন সেই অনুযায়ী ১৯৫১ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলো এই ভাবে প্রায় ৩০ শত কোটি ডলার ক্ষতিস্বীকার করেছে।

ওভিনিকভের দেওয়া তথ্যে আরো জানা যাচ্ছে, পুঁজিবাদের বিকাশের প্রথম ঐতিহাসিক কালপর্বে পুঁজিবাদী দেশ ও তাদের উপনিবেশগুলির আয়ের

ব্যবধানের অনুপাত পৌঁছেছিল ২ : ১-এ। পরের একশ' বছরে (১৯৫০ সালের মধ্যে) এই অনুপাত দাঁড়ায় ১০ : ১ ; এবং ১৯৬৫ সালে ১৫ : ১-এ। যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে এই শতাব্দীর শেষে ব্যবধানের অনুপাত দাঁড়াবে ৩০ : ১।

আজ সবলেই জানেন, নানা দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে ট্রান্সন্যাশনাল নাক গলায়, জাতির সার্বভৌমত্ব তাদের কাছে আদৌ মাননীয় নয়। ১৯৭২ সালের ৪ ডিসেম্বর জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদের ২৭তম অধিবেশনে চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আলেন্দে একথাই বলেছিলেন। তিনি মার্কিন ট্রান্স-ন্যাশনাল, বিশেষ করে ITT ও Konnecott Copper-এর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করে বলেছিলেন, এরা তাঁর দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে সরাসরি নাক গলাচ্ছে, চিলির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আক্রমণ সংগঠিত করছে এবং গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে।

আলেন্দে বলেছিলেন, "১৯৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই বাইরের বিপুল চাপ আমরা অনুভব করেছিলাম, যার লক্ষ্য ছিল জনগণের স্বাধীন ইচ্ছায় নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতায় আসতে না দেওয়া এবং এখন চাইছে তাকে হেয় করতে। বাইরের দুনিয়া থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করছে, অর্থনীতির শ্বাসরোধ করছে এবং আমাদের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য তামার ব্যবসা পঙ্গু করছে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক সাহায্যলাভেও আমাদের বঞ্চিত করছে। এর অর্থ, স্বদেশের বুনিয়াদী সম্পদে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য একটি পুরো জাতিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে পূর্বনির্ধারিত ভাবে হস্তক্ষেপ করার নমুনা।"

নগদ অর্থের ব্যাপারেও উন্নয়নশীল দেশগুলো ভুগছে, যদিও পুরোনো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক (ঔপনিবেশিক) আধিপত্যের দিন আর নেই। এই বিপুল অর্থপাচার সম্পর্কে "বিট্রিশ ইন্টারইকনমিকস্ অর্গানাইজেশন" জানাচ্ছে, কেবল ১৯৭৫—৭৬ সালেই তৃতীয় দুনিয়ায় প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট থেকে আমেরিকা যে মুনাফা লুটে নিয়ে গেছে তার পরিমাণ ১৩৭০ কোটি ডলার, ওই সময় যে অর্থ ভিতরে এসেছে তার পরিমাণ ৫৪০ কোটি ডলার ; এর অর্থ মাত্র ১ বছরে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে মার্কিন ট্রান্সন্যাশনালের নীট লাভ হয়েছে ৮৩০ কোটি ডলার।

বি আই ও জানাচ্ছে, যে পরিমাণ পুঁজি আসছে তার চেয়ে অনেক বেশি পুঁজি আন্তর্দেশীয় অধস্তন সংস্থাগুলো দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফলে

দশম অধ্যায়

# কারিগরী কৃৎ-কৌশল এবং কিছু আজগুবী তত্ত্ব

যাঁরা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ও তাদের ক্রিয়াকলাপের পক্ষে ওকালতি করেন, তাঁদের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে এই যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো আর কিছু না করুক, অধস্তন সংস্থাগুলোকে নতুন এবং আধুনিক কারিগরী কৃৎ-কৌশল দিয়ে এবং সেই কৃৎ-কৌশল প্রয়োগের কলাকৌশল শিখিয়ে সাহায্য করে। অধস্তন সংস্থা যে দেশে প্রতিষ্ঠিত, সেই দেশটিও তদ্দ্বারা লাভবান হয়। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের উকিলরা আরও বলেন যে, আজকের অবস্থায় যে কোন অনুন্নত দেশের পক্ষেই শিল্পায়ণের কাজ এক জটিল সমস্যা। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কারিগরী কৃৎ কৌশল দিয়ে অনুন্নত দেশগুলোকে সেই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে।

কথাটা শুনতে ভালই, কিন্তু অনুন্নত দেশে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন-গুলোর ক্রিয়াকলাপের ফলাফল উল্টোটাই প্রমাণ করে।

সেই প্রশ্ন বিস্তারিত আলোচনার আগে কারিগরী কৃৎকৌশল জিনিষটা আসলে কি তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। কৃৎকৌশলের বিচার করতে হবে সামাজিক উৎপাদনের পটভূমিকায়। "প্রকৃতি আত্মসাৎ" বলে যে কথাটা মার্কস বলেছিলেন, সেটা হল একটা প্রক্রিয়া ঃ শ্রম প্রক্রিয়া ; এই প্রক্রিয়ায় মানুষ পণ্য উৎপাদন করে এবং সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এগোনোর ফলে যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করে, তাতে তার নিজের ক্ষমতার ও দক্ষতারও পরিবর্তন ঘটে। কারিগরী কৃৎকৌশল হল নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ। শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সেই জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। বিজ্ঞান স্বয়ং একটি সামাজিক কর্মকান্ড। তার মস্ত প্রমাণ হচ্ছে এই যে আদিকালে কারিগরী কৃৎকৌশলই ছিল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্মদাতা। কে. এন. কাবরা সমগ্র প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ "সামাজিক শ্রম প্রক্রিয়া, নিয়মাবদ্ধ-ভাবে জ্ঞানের আবির্ভাব, বাস্তব চাহিদা পূরণের জন্য সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতিতে তার প্রয়োগ, নতুন অন্তর্দৃষ্টির এবং কৌশলের উদ্ভব এবং সেই চক্রের ক্রমাবর্তন।"

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে কারিগরী কৃৎকৌশল হচ্ছে ; পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি এবং উৎপাদনী শক্তিসমূহের সর্বাধিক সুবিধানুগ ব্যবহারের চক্রাবৃত্তি সংযুক্ত কারিগরী পদ্ধতির উদ্ভূত ফল। ইউনেস্কোর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে কারিগরী কৃৎকৌশল বলতে বোঝাতো প্রচুর মেসিনপত্র, সাজসরঞ্জাম এবং শিল্প কারখানা কিন্তু এখন সেই সংজ্ঞা অচল। এখন কৃৎকৌশল আর কঠিন পণ্য নয়, নরম পণ্য। সেটা সুসংবদ্ধ সংগঠন এবং নিয়মাবদ্ধ কর্মপদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে মেসিনপত্রের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। মোটেই তা নয়। আসলে কৃৎকৌশলে আগের চেয়ে এখন মানুষের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। মানুষ ও মেসিনের যোগফলই কারিগরী কৃৎকৌশল তবে এতে মানুষের অংশ ক্রমবর্ধমান।"

অন্য কথায় বলা যায়, কারিগরী কৃৎকৌশল হচ্ছে সুপরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি। আধুনিক শিল্পের সংগে কারিগরী কৃৎকৌশল অংগাংগীভাবে সংযুক্ত। মার্কস বলেছেন, "কোন প্রক্রিয়ার চলতি আকারটাকে আধুনিক শিল্প কখনও চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না। সুতরাং সেই শিল্পের কারিগরী ভিত্তিই বৈপ্লবিক এবং পূর্বেকার উৎপাদন পদ্ধতি মূলত রক্ষণশীল" ( ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড )। মার্কস আরও বলেছেন, "আধুনিক শিল্প···বিজ্ঞানকে শ্রমশক্তি থেকে পৃথক এক উৎপাদনী শক্তিতে পরিণত করেছে এবং সেটাকে পুঁজিবাদের সেবায় নিয়োজিত করেছে।" ( ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড )

মার্কস বলেছেন, "আমাদের সমস্ত আবিষ্কার ও অগ্রগতির ফল হয়েছে এই যে আমরা বৈষয়িক শক্তিতে বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সঞ্চার করেছি এবং মানুষের জীবনকে স্ববিরোধিতার মধ্য দিয়ে বৈষয়িক শক্তিতে পরিণত করেছি।" এই উক্তি আমাদের আধুনিক কারিগরী কৃৎকৌশল অনুধাবনের সুযোগ করে দিয়েছে। কারিগরী কৃৎকৌশল হচ্ছে গায়ের জোরের পরিবর্তে মগজের জোরের প্রকাশ।

কিন্তু "বিজ্ঞানকে পুঁজির সেবায় নিয়োজিত" করার ফলে একটা অন্তর্বি-রোধ সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই বিরোধ এবং অপর দিকে দুঃখ-দারিদ্র্য ও হতাশা। আমাদের কালে উৎপাদনী শক্তির সংগে সামাজিক সম্পর্কের বিরোধ একটি সুস্পষ্ট বাস্তব ঘটনা এবং তার প্রভাব সর্বব্যাপী। সেটা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।" ( কার্লমার্কস ও এফ এংগেলস্ নির্বাচিত রচনাবলী ঃ ১ম খণ্ড )

মূলত কারিগরী কৃৎকৌশলগুচ্ছ সামাজিক চাহিদা পূরণের উন্নততর

বিজ্ঞান। কিন্তু মনোপলি পুঁজির আমলে কারিগরী কৃৎকৌশলের উপরও একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কৃৎকৌশল পেটেন্ট ও লাইসেন্সের এক্তিয়ারভুক্ত। পেটেন্ট কিন্তু কারিগরী কৌশল নয়। পেটেন্ট হচ্ছে কৃৎকৌশল ব্যবহারের বিধিসম্মত অনুমতি। অন্য কথায় বলা যায়, পেটেন্ট ব্যবস্থা হচ্ছে জ্ঞানের উপর মালিকানা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি পদ্ধতি মাত্র।

১৯৭৬ সালে পৃথিবীতে ৩০ লক্ষ পেটেন্ট চালু ছিল। এখন সেই সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। এর মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার অর্থাৎ মোট সংখ্যার মাত্র ১ শতাংশের মালিক উন্নয়নশীল দেশের মানুষ। পেটেন্টের উপর মনোপলির একচেটিয়া কর্তৃত্ব যে কি প্রচন্ড, উপরোক্ত ঘটনাই তার প্রমাণ। কারিগরী কৃৎকৌশল ও পেটেন্টের উপর পুঁজিবাদী বিশ্বের আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন-গুলোর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সভায় (W H.A.) গত ৬ই মে (১৯৮১) ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পেটেন্ট ব্যবস্থার একটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "আমি যে উন্নততর বিশ্বের কথা কল্পনা করি সেখানে ঔষধের নতুন নতুন আবিষ্কার পেটেন্টের অধিকার মুক্ত এবং সেখানে জীবন-মৃত্যুর উপর থেকে কোনো মুনাফা তোলার প্রয়াস নেই।"

ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে পণ্য বিক্রয়ের যে রীতি কার্টেলগুলো গড়ে তুলেছে, শ্রীমতী গান্ধী তারও নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, ঔষধ কোম্পানী-গুলো বিজ্ঞাপন দিয়ে 'আমাদের অভ্যাসের দাসে পরিণত করে। সেই অভ্যাস অর্থনৈতিক বিচারে অপচয় এবং পুরোপুরি শারীরিক সুস্থতার পরিপন্থী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, অনেক সময় দেখা যায় যে বিপজ্জনক নতুন কোন ঔষধ দুর্বল দেশের মানুষের উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে অথচ ঔষধটি যে দেশে তৈরী হয়েছে, সেই দেশে তার প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

প্রসঙ্গক্রমে প্রধানমন্ত্রী বর্ণিত "অভ্যাসের দাস"-এর একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশানালের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৮১ সালের ২১শে মে জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বেবিফুড ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপের জন্য একটি বিধি পেশ করে। আমেরিকা, চীন এবং বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়। প্রস্তাবিত বিধির পক্ষে ভোট দেয় ৯৩টি দেশ। জাপান সহ ৯টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে।

উপরোক্ত বিধি সম্পর্কে আমেরিকার বক্তব্য হচ্ছে, এই বিধিনিষেধ স্বেচ্ছা-মূলক (বেবিফুডের পক্ষে বিজ্ঞাপন দেওয়া ও প্রচার কার্য চালানো) হলেও

এটা বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ব্যবসাবাণিজ্য চালাবার অধিকার জ্ঞাপক মার্কিণ আইনের পরিপন্থী। যে সব আন্তর্দেশীয় কোম্পানী বেবিফুড তৈরী করে, তাদের বক্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্র সংঘের কোন এজেন্সীর ( W.H.O ) পক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা উচিত নয়।

ইউ-পি-আই'র রিপোর্টে প্রকাশ, মাতৃ দুগ্ধের বিকল্প হিসাবে বেবিফুডের কারবারে বার্ষিক আমদানী ২০০ কোটি ডলারের উপর। তার অর্ধেকটাই পাওয়া যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে।

বেবিফুডের ব্যাপক প্রচারকার্যে বিভ্রান্ত হয়ে লোকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যে মাতৃ দুগ্ধের চেয়ে বেবিফুডই শিশুর পক্ষে বেশী উপযোগী। কিন্তু এই বেবিফুড খেয়েই প্রতি বছর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় ১০ লক্ষাধিক শিশুর মৃত্যু হয়। ( আগেকার অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে )।

এবারে আসুন বিপজ্জনক ঔষধ এবং তার পেটেন্ট প্রসঙ্গে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, আমেরিকায় যে ঔষধের ব্যবহার নিষিদ্ধ, সেই সব ঔষধ অবাধে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় পাঠানো হয়। সেখানে বিবেকের কোন দংশন নেই। এই সব ঔষধ আবার রপ্তানি করা হয় আমেরিকার সরকারী মাধ্যমে। ঔষধের উপর লেখা থাকে "আমেরিকার শুভেচ্ছার ও সভ্যকরণ মিশনের দান।"

১৯৮১ সালের ১৮ই মে জাপান থেকে প্রেরিত এসোসিয়েটেড প্রেসের এক রিপোর্টে প্রকাশ, মিস কিকো ইয়ামাগুচি নাম্নী এক তরুণী ( ৩৫ ) দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা করে কারণ আন্তর্দেশীয় একটি কোম্পানীর "কুইনোফর্ম" ঔষধ খেয়ে সে প্রায় অন্ধ এবং সম্পূর্ণ অথর্ব হয়ে গেছে।

সংবাদে প্রকাশ, এই কুইনোফর্ম ঔষধটির ব্যবহার আমেরিকায় এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে নিষিদ্ধ কিন্তু এটি আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শতাধিক দেশে বিক্রী হয়।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কারিগরী কৃৎকৌশল হস্তান্তরের ব্যাপারটা খুবই ব্যয়বহুল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা প্রকৃতপক্ষে কোন কারিগরী কৃৎকৌশলই হস্তান্তর করে না। আর যদি বা তারা কোন কারিগরী কৃৎকৌশল হস্তান্তর করে, তাহলে দেখা যায় যে সেই কারিগরী কৃৎকৌশল হয় ইতিমধ্যেই অচল হয়ে গেছে, না হয় গ্রাহক দেশের উপযোগী নয়।

কারিগরী কৃৎকৌশলের হস্তান্তর ঘটে সাধারণত কলকারখানা, মেসিনপত্র

এবং সাজসরঞ্জাম বিক্রয়ের মাধ্যমে, এবং কারখানার নক্সা, মেসিনপত্রের ব্লু-প্রিন্ট এবং অন্যান্য দলিলপত্র হস্তান্তরের মাধ্যমে। সেই সঙ্গে আছে পেটেন্ট ও লাইসেন্স বিক্রয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, হস্তান্তরিত কৃৎকৌশল সকলের কাছেই সুপরিচিত। হস্তান্তরের একটা বিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে turnkey project ( কারখানাটি আগাগোড়া পুরোটাই করে দেওয়া ) তৈরী করে দেওয়া।

তবে লক্ষ্য করা গেছে যে কারিগরী কৃৎকৌশলের তত্ত্বগত জ্ঞানটি অনেক ক্ষেত্রেই প্রাপকের কাছে গোপন রাখা হয়। তাই সেই কৃৎকৌশলের স্থানীয়করণ যেমন অসম্ভব, বিকাশ সাধনও তেমনি অসম্ভব। সেই কারণে গ্রাহক দেশকে সব সময়ই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর উপর নির্ভর করতে হয়, আর আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো দিনের পর দিন তাদের রক্ত শোষণ করে। কৃৎকৌশলের প্রকৃত হস্তান্তর কখনও হয় না বললেই চলে।

কাজেই একথা বললে মোটেই অন্যায় হবে না যে "কারিগরী কৃৎকৌশলের বাজারে যে অন্তর্জাতিক লেন-দেন হয়, তা কৃৎকৌশলের পশ্চাৎপদ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী।" ( কে এন-কাবরা )। এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ-আনুচাকিন তিমোফিয়েভ তাঁর "সাহায্য না নয়া উপনিবেশবাদ" গ্রন্থে লিখেছেন, "শিল্পোন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের বিগত দিনের কারিগরী কৃৎকৌশলের ভাগ দিতে প্রস্তুত, তার বেশী কিছু নয়। বর্তমান যুগের, বিশেষ করে, ভবিষ্যতের কারিগরী কৃৎকৌশলের উপর তারা তাদের একচেটিয়া মালিকানা অক্ষুন্ন রাখতে চায়।"

এই উদ্ভট অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও কৃৎকৌশলগত তথ্যাবলীর জন্য ক্রমেই আরও বেশী করে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। রাষ্ট্র সংঘের এক হিসাব অনুযায়ী, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদিতে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাতে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর অংশ শতকরা ৯৮ ভাগ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশ শতকরা মাত্র ২ ভাগ। ১৯৭২ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে পেটেন্ট ব্যবহার করেছিল তার ৯২·১ শতাংশই ছিল বিদেশী এবং তার মধ্যে ৪০·৪ শতাংশের মালিক ছিল আমেরিকা, ১১·৫ শতাংশের মালিক ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী, ৯·৬ শতাংশের মালিক সুইজারল্যান্ড, ৮·. শতাংশের মালিক বৃটেন এবং ৭·৩ শতাংশের মালিক ফ্রান্স।

কারিগরী কৃৎকৌশলের বাজারে মনোপলিগুলোর এক চেটিয়া প্রভুত্বের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর শোষণের মাত্রা ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আংটাডের (UNCTAD) হিসাব অনুযায়ী, ১৯৬৮ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলো কারিগরী কৃৎকৌশলের জন্য সরাসরি প্রায় দেড়শ কোটি ডলারের মত মূল্য ধরে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এটা বার্ষিক ২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০ সালে কারিগরী কৃৎকৌশলের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে কারিগরী কৃৎকৌশলের মূল্য ধরে দিয়েছেন ৯০০ কোটি ডলার।

ভাগ্যের পরিহাস এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, যে সব উন্নয়নশীল দেশ এই সব কারিগরী কৃৎকৌশল কিনতে বাধ্য হয়েছে, তাদের পক্ষে এই কৃৎকৌশল যথোপযোগী নয়। উন্নয়নশীল দেশের মগজওয়ালা ছেলেরা দলে দলে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোয়, বিশেষ করে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। কাজেই কোন্ কারিগরী কৃৎকৌশল যে তাদের দেশের পক্ষে উপযোগী, সেটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার লোকেরও অভাব ঘটেছে। ঠিক কোন্ জিনিসটা যে ক্রেতার দরকার, সেটাও সে অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে না।

সাধারণ মানুষ কারিগরী কৃৎকৌশল সম্বন্ধে যে তেমন ওয়াকেবহাল নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। যেমন ধরুন, শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান সম্বন্ধে কলকাতার বেশীর ভাগ মানুষই নিশ্চয়ই কিছু জানেন না, যেমন এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে মোটর গাড়ি সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। সুতরাং কারিগরী কৃৎকৌশল সম্বন্ধে যে যা বলে, সাধারণ নাগরিক সেটা অবিশ্বাস করেন না। উপরন্তু আধুনিক কারিগরী কৃৎকৌশল খুবই জটিল ব্যাপার। যে কোন মানুষের পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভবও নয়।

সাধারণ মানুষের ধারণা, এযুগের নতুন নতুন কারিগরী কৃৎকৌশল এত বিস্ময়কর যে সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। কারিগরী কৃৎকৌশল বিস্ময়কর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উৎপাদনের কায়দাকানুন এবং পণ্যান্তরও বিকাশ ঘটেছে সেই ভাবে। কারিগরী কৃৎকৌশলের বিকাশের সঙ্গে সমান তালে বিকাশ ঘটেছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার। এই বিকাশের প্রেরণা যুগিয়েছে মানব সমাজের চাহিদা।

জিউক্স, সয়ারর্স এবং স্টিলার মান লিখিত "আবিষ্কারের উৎস" (The Sources of Innovation) গ্রন্থটি কারিগরী কৃৎকৌশল আবিষ্কার সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলেই বিশেষজ্ঞ মহলে সমাদৃত। তাতে গ্রন্থকাররা বলেছেন, "যে যাই বলুক, এখনও পর্যন্ত এমন কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে বর্তমান কারিগরী অগ্রগতির হার আগের চেয়ে অনেক দ্রুতগতি

অথবা বর্তমান শতাব্দীর আবিষ্কার উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কারের চেয়ে বিস্ময়কর।"

লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেবার চেষ্টায় যে এ যুগে কারিগরী কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে যে সব নতুন নতুন আবিষ্কার করা হচ্ছে, তেমনটা এর আগে কখনও হয়নি। এই বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয় এই যে বিশ্বের শিল্পে অগ্রসর দেশগুলো গবেষণার জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে, এত অর্থ এই কাজে আগে কখনও ব্যয় হয় নি। এ ক্ষেত্রে প্রধানত আমেরিকার দৃষ্টান্তই তুলে ধরা হয়। তবে উপরোক্ত গ্রন্থকারেরা পাল্টা যুক্তি উত্থাপন করে বলেছেন যে আমেরিকায় গবেষণা ও বিকাশ সাধনের (R and D) জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়, তার দুই তৃতীয়াংশই সরকারী তহবিল থেকে এবং তার প্রায় তিন চতুর্থাংশই ব্যয় হয় পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ অভিযান এবং ফৌজী অস্ত্রশস্ত্রের গবেষণায়। শিল্প সংস্থাগুলো গবেষণার জন্য নিজেদের তহবিল থেকে যে অর্থ ব্যয় করে, তার ১৮ ভাগের ১৭ ভাগই ব্যয় হয় বিমান, ক্ষেপনাস্ত্র এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গবেষণায়। বাকী ১ শতাংশ ব্যয় হয় অন্যান্য গবেষণার জন্য।

ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বের। সমাজের মঙ্গলের জন্য আধুনিক কারিগরী কৃৎকৌশলের ব্যবহার একেবারেই ন্যায্য। যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে মানব সমাজকে ধ্বংস করার কাজেই প্রধানত এই কৃৎকৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। বৃটিশ, ফরাসী ও জার্মান আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর আচরণের সঙ্গে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর আচরণের কোন পার্থক্য নেই

উপরন্তু গবেষণা ও বিকাশ সাধনের জন্য বর্দ্ধিত অর্থব্যয় তার সাফল্যের প্রমাণ নয়। গ্রাহাম বান্নক বলেছেন, "কেউ একটা ভাল লাইব্রেরীর মালিক হলেই জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি হয় না। কারও বাড়িতে একটা বারবেল দেখেই তাকে সুস্থ মানুষ ভেবে নেবার কোন কারণ থাকতে পারে না, তেমনি গবেষণার কাজে অনেক অর্থ ব্যয় হচ্ছে দেখে ধরে নেওয়া যায় না যে কারিগরী কৃৎকৌশলের অগ্রগতি হচ্ছে।" নিউকস্, সয়ারস্ এবং স্টিলারম্যান বলেছেন যে পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার ঘটেছে শিক্ষাব্রতী বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণার ফলে এবং সেই গবেষণা মোটামুটি সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যেই সম্পন্ন করা হয়।

এংগাস ম্যাডিসন তাঁর "পশ্চিমের অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধি" (Economic Growth in the West) গ্রন্থে বলেছেন যে আমেরিকায় ১৮৭১-১৯১৩ কালপর্বে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ২.২ শতাংশ, ১৯১৩-১৯৫০ কালপর্বে ১.৭ শতাংশ এবং ১৯৫০-১৯৬০ কালপর্বে ১.৬ শতাংশ। গবেষণা এবং

বিকাশ সাধনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু উৎপাদন যে বৃদ্ধি পায়নি, এটা তারই প্রমান।

নিউকস্, সয়ার্স এবং স্টিলারম্যান বিংশ শতাব্দীর গোড়াকার ৭০টি আবিষ্কার পরীক্ষা করে বলেছেন যে তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী আবিষ্কারের জনক হচ্ছে এমন সব ব্যক্তি যারা অপর কারও সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই গবেষণা করে নতুন আবিষ্কার সাধন করেছে। এই সব আবিষ্কারে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কোন দান নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের আবিষ্কারগুলো পরীক্ষা করেও উপরোক্ত গ্রন্থকারেরা দেখতে পেয়েছেন যে এ ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। "আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মোট আবিষ্কারের মাত্র এক চতুর্থাংশের উৎস হচ্ছে যৌথ কর্পোরেশনের গবেষণাগারগুলো।"

গুণী ব্যক্তিরা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সাহায্য না নিয়ে সম্প্রতিকালে যে সব যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন, তার কয়েকটি উক্ত গ্রন্থকারেরা উল্লেখ করেছেন। যথা ককেরেল—হোভারক্রাফ্ট, মোলটন-বাইসাইকেল ; ওয়াঙ্কেল-রোটারী ইঞ্জিন, শেফার্ড ও ক্লার্ক ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা—রিউসাস-হেমোলাইটিক (rhesus-haemolytic) ব্যাধির চিকিৎসা ; জুসে, এইটি মচলি এবং ভন নিউম্যান—কম্পিউটরের উৎকর্ষ সাধন ; পার্টি ও ম্যাকিনটোশ, হিগোনেট ও ময়রাউড—ফটো টাইপ সেটিং।

অন্যান্য দৃষ্টান্তও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। যেমন ফুয়েল সেল (জ্বালানী কক্ষ)। মার্কারী ড্রাই সেল ও ম্যাগনেটিক টেপ প্রভৃতি। লোকের ধারণা এই আবিষ্কারেয় জন্মদাতা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো। কিন্তু না, মোটেই তা নয়। কিন্তু তা হলে কি হবে, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এই সব আবিষ্কারের একচেটিয়া মালিক বনে গেছে এবং এর সমস্ত মুনাফা লুটছে তারাই। ইস্পাত, এল্যুমিনিয়াম, বিমান, তৈল এবং অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ব্যতিক্রম বোধ হয় রসায়নিক শিল্পের কয়েকটি শাখা।

নতুন আবিষ্কারে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর অবদান একেবারেই নগণ্য। এই অক্ষমতা তারা ঢেকে রাখে জনসংযোগে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে। এই জনসংযোগের একটি কাজ হচ্ছে তাদের গবেষণা ও বিকাশ সাধণের কৃতিত্ব সম্পর্কে কল্পিত কাহিনী প্রচারের দ্বারা বাজার গরম করা। মিথ্যা প্রচার কার্যের দ্বারাই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মর্যাদা বাড়ানো হয়ে থাকে। জনসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যে সব সুন্দর সুন্দর প্রচার পুস্তিকা বাজারে ছাড়ে সে গুলি পাঠ করলেই দেখা যায় যে তাদের তথাকথিত

গবেষণার অনেক আগ্রহ উদ্দীপক কাহিনী তাতে লিপিবদ্ধ করা থাকলেও গবেষণার ফলাফল অপ্রকাশিতই রাখা হয়েছে। গ্রাহাম ব্যান্নক বলছেন, "কখনও কখনও দেখা যায় আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর গবেষণাগারগুলো সুপুরী গুঁড়োবার বিরাট বিরাট হাতুড়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। গবেষণাকেন্দ্রের পরিধি বাড়াবার জন্য অনেক সময় গবেষণা বহির্ভূত কাজও তাদের হাতে অর্পণ করা হয়।

কলকারখানায় এমন অনেক সব পণ্য উৎপন্ন হয় নানা দিক দিয়েই বেশ সূক্ষ্ম এবং জটিল। সে সম্বন্ধে সাধারণ ক্রেতার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। তারই সুযোগ নিয়ে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর জনসংযোগ বিভাগ গবেষণাগারের চিত্তাকর্ষক সব ছবি এঁকে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ফোর্ডের গবেষণা বিভাগের প্রাক্তন নির্বাহী এবং পরে জেরোক্স কোম্পানীর গবেষণা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ডাঃ জ্যাক গোল্ডম্যান বলেছেন যে এই প্রচার পদ্ধতি আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি বলেছেন, "মার্কিন কোম্পানীগুলো দেখেছে যে, জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার পক্ষে তাদের সংগঠনে গবেষণ বিভাগ সংযোজন করা খুবই প্রয়োজনীয়। গবেষণাগারের মাধ্যমে তারা ব্যাবস্থাপনার কাজে অনেক ভাল ভাল লোক জোগাড় করতে পেরেছে। ( টাইম্‌স্‌-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার )।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো অপরের গুরুত্বপূর্ণ সব আবিষ্কার কিভাবে কুক্ষিগত করল গ্রাহাম ব্যানক তাঁর "দি জাগারনাটস" গ্রন্থে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। যেমন ধরুন ইলেক্‌ট্রোফোটোগ্রাফির মৌলিক আবিষ্কার চেণ্টার কার্লসনের অবদান। তিনি স্বাধীনভাবে গবেষণা করেই এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কালক্রমে সেটা বিকাশ ঘটতে ঘটতে জেরোক্স ও জেরোগ্রাফীতে পরিণত হয়। অবশেষে এটা জেরোক্স কর্পোরেশনের সম্পত্তি হয়ে যায়। 'ফর্চুন' পত্রিকা ১৯৬১ সালে বৃহদাকার ৫০০ আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে জেরেক্সের নাম ছিল না কিন্তু ১৯৬৪ সালে এই কোম্পানীভুক্ত তালিকায় ২২৭তম স্থান অধিকার এবং ১৯৬৮ সালে ১০১ম স্থানে উঠে আসে।

ডু-পণ্টের নাইলন আবিষ্কার নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা। প্রকল্পটা একসময় পুরোপুরিই বাতিল হতে চলেছিল কিন্তু ভিন্ন কারণ বশত পরে সেটা পুনরায় সক্রিয় হয়। ট্রান্সিস্টরও আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল বল গবেষণাগারের সরকারী অর্থে পরিচালিত এক গবেষণা প্রকল্পে। যৌথ কর্পোরেশনের মূলে অনেক সময়ই আছে ব্যক্তি বিশেষের ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা প্রসূত

পর্যাপ্ত। কর্পোরেশন সেটা ক্রয় করে এবং তার উপর কাজ চালিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করে। বৃহদাকার কর্পোরেশনগুলো এইভাবে অপরের আবিষ্কারের ধন কিনে নিয়ে তার মালিক হয়ে বসে।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটারও এই ভাবে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের উপর মূল গবেষণার কাজটা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং মার্কিন গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা সংস্থা। ১৯৫১ সালে রেমিংটন র‍্যাণ্ড সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটর বিক্রয়ের জন্য বাজারে ছাড়ে তবে মৌলিক গবেষণার কাজটা করেন দুজন বড় বড় বিজ্ঞানী এবং মেসিনটি (ইউনিভার্স ১) বাগিয়ে নেয় রেমিংটন ১৯৫০ সালে।

এবার আসুন আই-বি-এম'র ক্ষেত্রে। এই কোম্পানীর সাফল্যটা পুরোপুরি বাণিজ্যিক, কারিগরী কৃৎকৌশলগত নয়। আই-বি-এম গবেষণার জন্য গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যে বিরাট পরিমাণ অর্থ আদায় করে, তা ১৯৫০-এ ছিল তার ব্যয়ের ৬০ শতাংশ। মৌলিক কারিগরী ধ্যান ধারণা যখন কার্যকর বলে প্রতিপন্ন হল, তখনই আই-বি-এম নড়ে বসল। আই-বি-এম স্রেফ তার মাল আর সার্ভিস বিক্রয় করে এত বড়টা হয়েছে কারিগরী আবিষ্কার করে হয়নি।

অনেক সময়ই দেখা গেছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের আবিষ্কার কোন সুপরিকল্পিত গবেষণার ফল নয়, আকস্মিক ঘটনামাত্র। নাইলন ছাড়াও ডিস্ক মেমারী ইউনিট তার আর একটি দৃষ্টান্ত।

আই-বি-এম'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান টি-জে-ওয়াটসন (ইনি প্রেসিডেন্ট কার্টারের আমলে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁরা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর সঙ্গে গভর্নমেন্ট অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা) বলেছেন, "আজকের দিনের কম্পিউটারের অন্তরের অন্তস্থল হচ্ছে ডিস্ক মেমারী ইউনিট। কিন্তু এটা কোন সুপরিকল্পিত গবেষণার ফল নয়। আমাদের গবেষণাগারে একটা ফাউ প্রকল্পে এর বিকাশ ঘটে। অর্থাভাবের জন্য বারংবার সেই প্রকল্প বাতিলের হুমকি দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ; মুষ্টিমেয় লোক সেই হুমকী উপেক্ষা করে। তারা নিয়ম কানুন শিকেয় তুলে রাখে এবং নিজেদের ধ্যান ধারণা রূপায়িত করবার জন্য নিজেদের চাকরী খোয়াবার ঝুঁকি নেয়।"

কিন্তু আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো সম্প্রসারিত হতে চায়। তারা নিজেদের বহুমুখী করে তোলে এবং কখনও কখনও নিজেদের এলাকার বাইরে গিয়েই ভিন্নধর্মী কাজে নেমে পড়ে। আই. বি. এম. এবং জেরোক্সই এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রকাশনার ক্ষেত্রে বহু গ্রন্থের স্বত্ব ক্রয় করে

জেরোক্স কোম্পানী আমেরিকার মস্ত বড় প্রকাশকে পরিণত হয়েছে। পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনায় তারাই এখন আমেরিকায় বৃহত্তম। আই. বি. এম-ও সায়েন্স রিসার্চ এসোসিয়েটস নামে একটি কর্পোরেশন হস্তগত করে আধুনিক শিক্ষার সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করছে। জেরোক্স রোগ নির্ণয়ের সাজ সরঞ্জামের কারবারেও নেমেছে। আই. বি. এমও শীঘ্রই তাকে অনুসরণ করবে। আই. বি. এম. ফোটো কপিইং মেসিন তৈরী করছে, জেরোক্স নামছে কম্পিউটরের কারবারে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেউই দাবি করতে পারেনা যে কারিগরী কৃৎকৌশল আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাদের কোন অবদান আছে।

তাহলে নতুন কোন আবিষ্কার আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কুক্ষিগত হয় কি করে? তিনটি উপায়ে সেটা হয়ে থাকে: (১) তারা আবিষ্কারের স্বত্ব কিনে নেয় অথবা তারা ছোট কোম্পানী অথবা ফলপ্রসূ ধ্যান ধারণাওয়ালা মানুষগুলোকে কিনে নেয়; (২) তারা ছোট গবেষণা কোম্পানী, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা গবেষণা সংস্থাগুলোকে গবেষণার কন্ট্রাক্ট দেয় (এরা কেউ মুনাফার জন্য গবেষণা করে না); (৩) তারা ছোট নতুন উদ্যোগ বিভাগ খুলে বুদ্ধিজীবীর স্বাধীন প্রয়াসে উৎসাহ দেয়।

গ্রাহাম ব্যান্নক বলেছেন যে ১৯৬৯ সালে মার্কিন গভর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোকে গবেষণার জন্য ২৫০ কোটি ডলারের কন্ট্রাক্ট দেন, ৭০ কোটি ডলার দেন বাটেলে, ষ্ট্যানফোর্ড এবং কর্ণেল এরোনটিকালকে। এছাড়া মুনাফা ভোগী শিল্প গবেষণা সংস্থাগুলোকেও প্রচুর টাকার কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। ম্যাসচুসেট ইনষ্টিটিউট অভ টেকনলজির (M.I.T.) অধ্যাপক রবার্টস্ বলেছেন যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো যে নতুন উদ্যোগ বিভাগ খুলেছে, তারা নতুন আবিষ্কারের ব্যাপারে খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তিনি ২৮টি গবেষণার ফলাফল পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তার মধ্যে ১৬টি একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। বাকী কটির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে তাদের সাফল্যের পেছনে রয়েছে বুদ্ধি বৃত্তির প্রেরণা, আর্থিক লাভের প্রেরণা নয়।

মোট কথা, পৃথিবীতে কারিগরী কৃৎকৌশলের অগ্রগতিতে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর অবদান একেবারেই নগণ্য। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর সাহায্য ছাড়াই নিত্য নতুন আবিষ্কার ঘটছে কিন্তু আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো সেই সব আবিষ্কার কিনে নিয়ে একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম করে। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর বিকাশ ও পরিবৃদ্ধির আর এক পরিণাম হচ্ছে জ্ঞানের উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা।

গ্রাহাম ব্যান্নক আগে একটি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের নির্বাহী ছিলেন। সেই কারণে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সব কিছুই তার জানা। তিনি বলেছেন, "তথ্যের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, পাকাপোক্ত কর্পোরেশনগুলোর কোন নতুন আবিষ্কারের আগ্রহও নেই ক্ষমতাও নেই।" প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, দীর্ঘকাল ধরে সমগ্র শিল্পের ক্ষেত্রে যে সব নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে, তার উৎস হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র। কম্পিউটর, পারমাণবিক শক্তি, এরোস্পেস, ভূপৃষ্ঠের যানবাহন এবং অগ্রসর শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব আবিষ্কার হয়েছে তা সরকারী অর্থে পরিচালিত গবেষণার ফল। মৌলিক ও ফলিত বিজ্ঞান ক্ষেত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। এই সব গবেষণার সরকারী ব্যয় ক্রমবর্ধমান। আর মনে রাখা দরকার যে সরকারী অর্থটা আসে জনগণের পকেট থেকেই।

আর একটি বিষয় নিয়েও এখানে আলোচনা হতে পারে। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী কোন বিমূর্ত প্রপঞ্চ নয়। এগুলো হচ্ছে আধুনিক মনোপোলি পুঁজির জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। তারা কারবার করে আর মুনাফা কামায়—সর্বাধিক হারের মুনাফা। বেশ কিছু লোক তাদের মালিক। সেই লোকগুলো কে? তারা কি সাধারণ নাগরিক থেকে স্বতন্ত্র? তারা কি অণু, পরমাণু, অথবা আধা পরমাণু কণা কি তা আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে? তারা কি বলবিদ্যার তত্ত্ব আপনাকে বোঝাতে পারবে?

টাকার পাহাড়ের চূড়ায় অধিষ্ঠিত এই লোকগুলো খুবই ক্ষমতাবান—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোথায় কিভাবে টাকা খাটাতে হয়, কি করে টাকার হিসাব রাখতে হয়, কখন কোন আইনের সাহায্য নিতে হয়, পণ্য উৎপাদনী ব্যয় কি-ভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়, তার মোটামুটি জ্ঞান এদের আছে। কর, পণ্যমূল্য, রাজনৈতিক আলোচনা, মাল বিক্রয়, সাধারণ সংগঠন নির্মাণ, মুনাফাবাজী ইত্যাদি বিষয়েও তারা মোটামুটি ওয়াকেবহাল। কিন্তু লোকগুলো হয়ত সঠিক-ভাবে জানেনা, কোন্ কারখানা থেকে তাদের সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি হচ্ছে। এরা রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ। পরমাণুর কাঠামো সম্বন্ধে এদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকতে পারে কিন্তু কর কাঠামোর আগাগোড়া এদের নখদর্পণে। অথচ যে কোন আবিষ্কারের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ এদের উপরই নির্ভরশীল। এই হচ্ছে আন্তর্জাতিক মনোপলির—আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর আসল চেহারা।

টি-কে-কুইন এদের সম্বন্ধে বলেছেন, "ছোটখাট মুদিখানা চালাবার

যোগ্যতাও এদের নেই অথচ এরা বিশ্বব্যাপী শিল্প-আর্থিক সাম্রাজ্য পরিচালনা করছে।"

অপরের দক্ষতা ও প্রতিভার সহায়তায় তারা এই কাজ করে, কিন্তু তাদের উপরও এরা পুরোপুরি প্রভুত্ব চালায়।

এই প্রপঞ্চের সঙ্গে আর একটি ঘটনাও যুক্ত। তার নাম হচ্ছে মগজ পাচার। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

একাদশ অধ্যায়

## মগজ পাচারের প্রপঞ্চ

১৯৮১ সালের ৬ই মে তারিখে জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সভায় (W.H.A.) ভাষণ দেবার সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন যে উন্নয়নশীল দেশের ট্রেনিংপ্রাপ্ত যুবকেরা দলে দলে দেশত্যাগ করে উন্নত দেশে যাচ্ছে। তার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই ক্ষতি কিভাবে পূরণ করা যায়, তা বিশ্বের সকল জাতির ভেবে দেখা উচিত। তিনি বলেন "উন্নয়নশীল দেশগুলো 'মগজ' সরবরাহ ক'রে ধনী দেশগুলোকে যে সাহায্য করছে, তাকে কারিগরী সাহায্যই বলা হয়।"

ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় বহু অর্থ ব্যয় করে মেধাবী তরুণ-তরুণীদের ট্রেনিং দেওয়া হয়, কারণ দেশের মধ্যেই তাদের প্রচণ্ড চাহিদা রয়েছে। কিন্তু ধনী দেশগুলো মোটা মাইনে এবং কাজের নানা সুযোগ সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের দেশত্যাগে উস্কানী দেয়।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার ধনী দেশগুলোর সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে বাধ্যবাধকতার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তাতে মগজ পাচারের প্রসংগ উল্লেখ করে ইন্দিরা গান্ধী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এই মগজ পাচার প্রপঞ্চও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন-গুলোর কাজ কারবারের অনিবার্য পরিণাম।

ফার্ডিনান্ড লুন্ডবার্গ তাঁর "ধনী ও অতিধনী" (Rich and the Super Rich) গ্রন্থে বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে মার্কিন কৃতিত্ব সাধারণত এত নিম্নস্তরের যে দুরূহ শিল্প সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে বিদেশ থেকে ক্রমেই আরও বেশী বেশী করে অতি উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন মানুষ আমদানী না করলে তার চলবে না। প্রায়ই এমন সব দেশ থেকে এই সব লোককে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসা হচ্ছে, যেখানে তাদের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। মোটা মাইনে এবং পেশাগত সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে আমেরিকা আজ বিশ্বের সমস্ত সেরা সেরা মগজয়ালা লোককে সেই দেশে টেনে নিয়ে গেছে। ঠিক এইভাবেই সে বিশ্বের সমস্ত কাঁচামাল সম্পদের উপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে মগজ পাচার প্রপঞ্চ।

আগেই বলেছি, আমেরিকার বিকাশের মূলে আছে প্রধানত বহিরাগত মানুষের শ্রম—কায়িক ও মানসিক। সারা দুনিয়ার মানুষ আমেরিকায় গিয়ে মগজ দিয়ে এবং গায়ে গতরে খেটে তার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এক সময় শুধু অদক্ষ শ্রমিকই সেই দেশে যেতো। এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে। "এখনকার বহিরাগতদের মধ্যে অতি উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অনেক বেশী।" ( এফ-লুণ্ডবার্গ )

ইউনেসকোর ( UNESCO ) রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৯ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ৪৩ হাজার বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার অন্য দেশ থেকে আমেরিকায় চলে যায়। এর মধ্যে অনেকেই গিয়েছিল কম উন্নত দেশ থেকে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে একমাত্র আর্জেণ্টিনা থেকেই ১১২০০ লোক আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল। তার অর্ধেকই কারিগর এবং পেশাজীবী মানুষ, ১৫ শতাংশ উচ্চস্তরের প্রশাসক এবং ৩৮ শতংশ সুদক্ষ শ্রমিক। ১৯৬৪-৬৫ সালে আমেরিকার হাসপাতালগুলোয় ইণ্টানশীপের কর্মে নির্যুক্ত ডাক্তারের ১৮ শতাংশ এবং রেসিডেন্সীর কর্মে নিযুক্ত ডাক্তারের ২৬ শতাংশই ছিল ভিন দেশী গ্রাজুয়েট ( সর্বসমেত মোট ১১০০০ ) এবং বিদেশী ইণ্টার্ণির মধ্যে ৮০ শতাংশ ও বিদেশী রেসিডেণ্টদের মধ্যে ৭০ শতাংশই ছিল উন্নয়নশীল দেশের লোক।

আমেরিকায় এশীয় দেশগুলো থেকে মগজ আমদানী হয় সব চেয়ে বেশী। এশিয়ার যে সব ছাত্র আমেরিকায় পড়াশোনা করতে আসে, তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশই আর দেশে ফিরে যায় না।

আধা-উন্নত দেশের সুদক্ষ শ্রমিক আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মাধ্যমে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে চালান যায়। বৃটিশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীতে মগজ চালান আসে প্রধানত কমনওয়েলথ দেশগুলো থেকে। কিন্তু মগজ আমদানীর সর্বাধিক সুবিধা ভোগ করে মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো। এমন কি বৃটেনের ভাল ভাল মাথাওয়ালা লোকগুলোকেও তারা টেনে নেয়। নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টে প্রকাশ, প্রতি বছর বৃটেনের মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ ফিজিসিয়ান এবং এক তৃতীয়াংশ সার্জন ভিন দেশে চলে যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই নিবিড় ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ।

মার্কিন শ্রম দপ্তর একবার জানিয়েছিল যে, ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, কৃৎকৌশল-বিদ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ, প্রশাসক, ফিজিসিয়ান, শিক্ষক এবং এই ধরণের উঁচুস্তরের পেশায় ৩০ লক্ষাধিক চাকরী মোটামুটি স্থায়ীভাবেই খালি পড়ে থাকে। স্থানীয় লোক দিয়ে এই পদ পূরণ করা যায় না। তার কারণ, "অংশতঃ শিক্ষাগত

দূরদৃষ্টির অভাব ও কৃপণতা এবং অংশতঃ স্থানীয় অর্ধশিক্ষিত সমাজনায়ক ও রাজনীতিবিদদের মূর্খামী। তারা যে সামাজিক লক্ষ্য স্থির করে, তার স্তর খুব নীচু।" (এফ-লুন্ডবার্গ)

গ্রন্থকার পল এ-বারান এবং পল এম সুইজি তাদের "মনোপলি ক্যাপিটাল" গ্রন্থে বলেছেন যে আমেরিকায় দু'টি স্কুল ব্যবস্থা চালু আছে। তার মধ্যে যেটা ভাল সেটার কাজ হচ্ছে প্রাইভেট মুনাফার স্বার্থে সমাজ পরিচালনার উপযোগী মানুষ তৈরী করা। সেই ভাল ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রাইভেট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট স্কুল এবং উন্নততর শহরতলীর পাবলিক প্রাথমিক ও উচ্চ-বিদ্যালয়। বাদবাকী সব খারাপ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

এটাও উল্লেখযোগ্য যে মোটর চলাচলের উপযোগী আরও বেশী এবং আরও ভাল সড়ক তৈরীর জন্য যখন শত শত কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছে, তখন স্কুলের জন্য সরকারী অর্থব্যায় প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। মোটর চলাচলের সড়ক তৈরী করা হয় এমন একটি শিল্পের স্বার্থে, যার মুনাফা খুব বেশী এবং জাতীয় অর্থনীতির প্রায় ৩০ শতাংশ অর্থ আসে সেইখান থেকেই।

বারান ও সুইজি বলেছেন যে আনুকুল্য প্রাপ্ত মোটর গাড়ী সমাহার সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিবেশ দূষিতকরণ, শহরে অতিরিক্ত ভীড়, ট্রাফিক জাম, কোলাহল বিভ্রান্তি সৃষ্টি ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মোটর গাড়ী সামাজিক ভাবে ধ্বংসাত্মক। মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা অত্যাধিক। প্রতি বছর ৫০ হাজার লোক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়। মোটর গাড়ী চালু হবার পর থেকে এপর্যন্ত মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে ১৫ লক্ষ লোক। এর পর আর একটা সামাজিক কুফল হচ্ছে, মোটর গাড়ী দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত রেলপথকে খেলো করে দিচ্ছে।

ফিলিপ এইচ-কুম্বস তার "দি ওয়ার্লড্ এডুকেশানাল ক্রাইসিস" (বিশ্ব-ব্যাপী শিক্ষা সংকট) গ্রন্থে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল কলেজে ছাত্রভর্তির প্রবণতার একটা বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ইউনেসকোর (UNESCO) ইয়ার বুক (১৯৬৫) থেকে এবং এর ভিত্তি বৎসর ধরা হয়েছে ঃ ১৯৫০—১০০।

**ছাত্র ভর্তির হিসাব**

| | প্রাথমিক শিক্ষা | মাধ্যমিক শিক্ষা | উচ্চতর শিক্ষা |
|---|---|---|---|
| | ১৯৬০-৬৩ | ১৯৬০-৬৩ | ১৯৬০-৬৩ |
| ইউরোপ | ১১৪-১১[illegible] | ১৬০-১৮৬ | ১৬১-২১১ |
| উত্তর-আমেরিকা | ১৪২-১৫৩ | ১৬১-১৯২ | ১৫৭-১৯৭ |

| আফ্রিকা | ২২০-২৭০ | ২৭১-৩৬৪ | ২৬৭-৩৪৫ |
|---|---|---|---|
| লাতিন আমেরিকা | ১৭৫-২০৩ | ২২৭-৩২৫ | ২০৩-২৬২ |
| দক্ষিণ-এশিয়া | ১৭৫-২০৪ | ২১৩-২৬৭ | ২৪০-২৭০ |

গ্রন্থকার আরও বলেছেন যে আমেরিকায় ১৯৫৭-৫৮ সালে পঞ্চম মানে ভর্তি হওয়া ১০০০ ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩৭৮ জন ছাত্র সর্বপ্রথম কলেজে প্রবেশ করে।

আমেরিকার তুলনায় ভারতের মত যথেষ্ট অনুন্নত দেশেও বিরাট এবং মোটামুটি সুদক্ষ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। চীনা জাতীয় গণকংগ্রেসের বিগত অধিবেশনে (১৯৮০) ডেঙ জিয়াও পিঙ স্বীকার করেন যে শিক্ষা খাতে ভারত চীনের চেয়ে অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং বিজ্ঞান ও কারিগরী কৃৎকৌশলে ভারত যে চীনের চেয়ে উন্নত, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। বেজিংও সরকারীভাবে সেটা স্বীকার করে। ভারতের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চতর শিক্ষা এবং উচ্চতর কারিগরী দক্ষতা অর্জন করে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র নানা পেশায় নিযুক্ত হবার জন্য বেরিয়ে আসে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির শ্লথগতি এবং শিল্পায়নের মন্থরতার ফলে তাদের সকলকে দেশের মধ্যে কাজ দেওয়া সম্ভব হয় না।

অপর দিকে আমেরিকায় কর্মদক্ষ লোকের চাহিদা অফুরন্ত অথচ সেদেশে কর্মদক্ষ লোকের খুবই অভাব।

আমেরিকার জন-শক্তি পরিকল্পনার তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে সে দেশে বেশ কয়েকটি বৃত্তির স্থান পরিবর্তন ঘটছে। ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৃতি বিজ্ঞানী, সার্ভিস কর্মী, কারিগরী কৃৎকৌশলী এবং কেরাণীর চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০ সালে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের চাকুরীতে নিযুক্ত লোকের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫·৩, ৩০ এবং ৬৪·৭ শতাংশ। ১৯ ০ সালে সেই অনুপাত দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩·৫, ২৮·৫ এবং ৬৮·১ শতাংশ। তৃতীয় স্তরে চাকরির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ধোপদোরস্ত পোষাক পরা (কেরাণী জাতীয়) চাকুরেদের সংখ্যা বাড়ছে চাহিদাও বাড়ছে। জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে এবং উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন লোকের চাহিদাও বাড়ছে।

উচ্চগুণ সম্পন্ন জনশক্তির চাহিদা আসছে প্রধানত দুটি সূত্র থেকে। একটা হল মার্কিন গভর্ণমেন্ট এবং দ্বিতীয়টা হল মার্কিন আন্তর্দেশীয় কোম্পানী সমূহ। সামরিক, মহাকাশ, বিমান বিষয়ক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য মার্কিন গভর্ণমেন্ট প্রচুর লোক নিয়োগ করছে। ফলে মার্কিন গভর্ণমেন্টই হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্কিন অর্থনীতিতে সব চেয়ে বড়

চাকরীদাতা। ১৯৬৮ সালে মার্কিন গভর্ণমেন্টের কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ। এই সরকারী চাকুরিয়াদের মধ্যে বিজ্ঞানী, কারিগরী কৃৎকৌশলী এবং অন্যান্য উঁচুদরের পেশাজীবীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

আমেরিকায় উচ্চগুণসম্পন্ন জনশক্তির অভাব দেখা দেওয়ায় সেখানকার গভর্ণমেন্ট এবং আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো বিভিন্ন দেশের সবচেয়ে গুণী মানুষদের লোভ দেখিয়ে আমেরিকায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সারা দুনিয়ার জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের এইভাবে মার্কিন মুলুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ফলে আমেরিকা যে কি বিরাট মুনাফা লুঠছে আংকট্যাডের (UNCTAD) নীচের হিসাব থেকেই তা অনুধাবন করা যাবে।

১৯৭০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে চলে আসা দক্ষতাসম্পন্ন লোকদের কাছ থেকে যে মুনাফা আমেরিকা তুলেছে, নীচে তার তালিকাটা দেওয়া হচ্ছে:

| | প্রতিটি বহিরাগতের কাছ থেকে মাথাপিছু আয় (গ্রস) | মাথাপিছু ক্ষতি (আয়ের) | মাথাপিছু নীট আয় | বহিরাগতের সংখ্যা | নীট লাভ (মোট) |
|---|---|---|---|---|---|
| সমাজবিজ্ঞানী | ২৫৩ | ২৩ | ২৩০ | ৪৭১ | ১০৮৩৩০ |
| প্রকৃতি বিজ্ঞানী | ২৫৮ | ২৩ | ২৩৫ | ২১৫৬ | ৫০৬১৯০ |
| ইঞ্জিনিয়ার | ২৯৭ | ৪৪ | ২৫৩ | ৬৪০০ | ১৬১৯২০০ |
| চিকিৎসক | ৬৯০ | ৪৪ | ৬৪৬ | ২২১১ | ১৪২৮৩০৬ |

আংকট্যাডের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে "মগজ পাচারের ফলে আয় হস্তান্তরিত হল অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে কারিগরী কৃৎকৌশলের যে পাল্টা হস্তান্তর ঘটছে, তাতে একমাত্র ১৯৭০ সালেই আমেরিকা ৩·৭ বিলিয়ন ডলার লাভ তুলে নিয়েছে।" আংকট্যাড রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, "একই বছর আমেরিকার অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স (O.D.A) উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দিয়েছিল ৩·১ বিলিয়ান ডলার। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে মগজ আমদানী করে যে মুনাফা আমেরিকা সংগ্রহ করেছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রদত্ত তার সাহায্যের পরিমাণ সেই তুলনায় অনেক কম।

আংকট্যাডের সেক্রেটারিয়েট বলেছেন, "সেটা (মগজ আমদানীর মুনাফা) ছিল আমেরিকার মোট জাতীয় পণ্যের ০·৩ শতাংশের সমান, গবেষণা ও বিকাশের জন্য আমেরিকার মোট ব্যয়ের ১৪ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষা খাতে বর্তমান ব্যয়ের ৩৯ শতাংশ। একমাত্র ১৯৭০ সালেই উন্নয়নশীল দেশগুলো আমেরিকার নীট আয়ের যে অংশ সরবরাহ করেছিল তা যুদ্ধোত্তর কালে (১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩

সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ) মার্শাল প্ল্যান অনুযায়ী ইউরোপ উদ্ধারের জন্য প্রদত্ত মোট ব্যয়ের প্রায় এক অষ্টমাংশ।”

আলোচ্য বছরে অন্যান্য উন্নয়নশীল এলাকার চেয়ে এশিয়ার অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশী। ১৯৭০ সালে আমেরিকার নীট আয়ে কর্মদক্ষ বহিরাগতদের অবদানের পরিমাণ কি ছিল তা নিচের তালিকা থেকেই বোঝা যাবে মিলিয়ন ( ১০ লক্ষ ) ডলারের হিসাবে।

| অঞ্চল | সমাজবিজ্ঞানী | প্রকৃতি বিজ্ঞানী | ইঞ্জিনিয়ার | ডাক্তার | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
| এশিয়া | ৮৬ | ৩৮৮ | ১০৩৫ | ১০৯২ | ২৯০১ |
| আফ্রিকা | ১১ | ৭৬ | ১৬৬ | ১২১ | ৩৭৪ |
| লাতিন আমেরিকা | [illegible]২ | ৪২ | ১১৮ | ২১৪ | ৩৮৭ |
| উন্নয়নশীল অন্যান্য অঞ্চল | ১০[illegible] | ৫০৬ | ১৬২০ | ১৪৩০ | ৩৬৬০ |

আমেরিকার নীট আয়ে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ভারতেরই অবদান ছিল ৮৭ কোটি ৪৫ লক্ষ ডলার।

আংকট্যাডের আর এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে ৫৩ হাজারের অধিক অতি প্রতিভাবান ব্যক্তিকে মার্কিন অর্থনীতি এবং মার্কিন অন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর সেবায় নিয়োগ করা হয়েছে।

মার্কিন উচ্চশিক্ষা বিষয়ক কার্নেগী কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪১-৫০ সালে আমেরিকায় প্রকৃতি বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে যত গ্রাজুয়েট ছিল, তার ১·৩ শতাংশই বহিরাগত। ১৯৫৭-৫৮ সালে একই ক্ষেত্রে বহিরাগতের হার দাঁড়ায় ৭·৩ শতাংশ, ১৯৬৭-৬৮ সালে ৯·৬ শতাংশ এবং ১৯৬৮-১৯৬৯ সালেও ৯·৬ শতাংশ। তেমনি ১৯৫০ সালে আমেরিকায় যত মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটকে প্রথম লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল তার ৫·১ শতাংশ ছিল বহিরাগত। ১৯৬৮ সালে সেখানে বহিরাগতের হার বৃদ্ধি পেয়ে ২২·৪ শতাংশে পৌঁছায়।

ওকলাহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেলী এম-ওয়েস্ট হিসাব কষে বলেছেন যে আমেরিকায় বহিরাগত ডাক্তারদের স্থলে নিজস্ব ডাক্তার নিয়োগ করতে হলে ( বছরে গড়ে ১২০০ ) কমপক্ষে আরও ১২ টি নতুন মেডিক্যাল স্কুল খুলতে

হবে। তিনি আরও বলেছেন যে বহিরাগত ডাক্তারদের কাছ থেকে আমেরিকা প্রতি বছর যে "বৈদেশিক সাহায্য" লাভ করে তার মূল্য বিদেশে প্রদত্ত মার্কিন মেডিক্যাল সাহায্যের ( সরকারী ও বে-সরকারী ) চেয়ে অনেক বেশী।

ব্যাপারটা খুবই সরল। আমেরিকা তার প্রয়োজনানুগ সুদক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য অর্থ ব্যয় করবে না। তার বদলে অন্য দেশের উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি ভাগিয়ে আনবে এবং সেটা আনবে প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে। তার ফলে সংশ্লিষ্ট উন্নয়নশীল দেশগুলো যে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাতে আমেরিকার কোন মাথাব্যথা নেই।

বৃটিশ লর্ড সভায় ভাষণ দেবার সময় লর্ড বাউডেন বিষয়টি অতি চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে আমেরিকা যাতে চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারে, তার জন্য ভারতের ক্ষেত খামার অনাবাদী পড়ে থাকবে।" ( দি ব্রেন ড্রেন, ডব্লউ আডাম্‌স সম্পাদিত )

এর আর একটা দিকও আছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় আমেরিকার মত দেশ অথবা আন্তর্দেশীয় কোম্পানী অনেক সময় সহযোগিতামূলক গবেষণা প্রকল্প চালু করে। তাতে উন্নয়নশীল দেশ থেকে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বহির্গমন বন্ধ থাকে বলে মনে হয় কিন্তু আসলে ঘটনাটা মোটেই সেরকম নয়। প্রকৃতপক্ষে উন্নত দেশগুলোর কাজে লাগবে এমন জিনিষই শুধু গবেষণা করতে দেওয়া হয়। সেই গবেষণায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোন লাভ নেই। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় উন্নত দেশগুলো এই সূত্রে গবেষণার কাজটা খুব অল্প ব্যয়ে সেরে নিতে পারে। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলো কম-ব্যয়ের এলাকাভুক্ত।

উপরন্তু, উন্নয়নশীল দেশের এই ধরনের অনেক গবেষণা প্রকল্পই তাদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। কারণ তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করা হয় এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দূষিত করা হয়। অনেক সময় গবেষণার ফল সরাসরি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষতি সাধন করে।

ভারতে পঞ্চম লোকসভার পাবলিক একাউন্টস্‌ কমিটি তাঁদের "ভারতে গবেষণা প্রকল্পে বৈদেশিক অংশ গ্রহণ অথবা সহযোগিতা" বিষয়ক রিপোর্টে বলেন, "বিদেশী সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতায় ভারতে কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলছে। কমিটি তার কয়েকটি পরীক্ষা করে আগ্রহ উদ্দীপক ঘটনার সন্ধান পেয়েছেন। কমিটি দেখতে পান যে জেনেটিক কণ্ট্রোল অফ মস্কিইটোজ ইউনিট প্রজেক্ট ( মশার বংশগত নিয়ন্ত্রণ ), বোম্বাই ন্যাচারাল হিস্ট্রী

সোসাইটিতে মাইগ্রেটরী বার্ড ( নানা দেশ পরিক্রমণকারী পক্ষী ) ও আর্বোভিরাস (বৃক্ষবাসী বীজাণু) সম্বন্ধে গবেষণা, যোধপুরে শহরে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য অতি নিম্নমাত্রায় স্প্রের পরীক্ষা, পন্থনগরে মাইক্রোবায়াল জীবানুনাশক প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ ও নারাঙ্গাওয়ালে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পরিচালিত গবেষণা প্রকল্পগুলো সবই যে একটা নির্দিষ্ট ধরণের তাতে কোন সন্দেহই নেই। এসবই বিদেশী গভর্ণমেন্টের কাজ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সামরিক বিভাগের কাজ (যেমন ধরুন বোম্বাই ন্যাচারাল হিষ্ট্রি সোসাইটীর সঙ্গে আমেরিকার ফৌজী ইন্সটিটিউট অফ প্যাথলজির মাইগ্রেটরী এ্যানিম্যাল প্যাথলজিকাল সার্ভের (MAPS) সহযোগিতা )। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দিয়ে এঁরা মৌলিক গবেষণার কাজ করিয়ে নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশের জনসেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এদেশে গবেষণার কাজ করিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখা গেছে, ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে সামরিক এজেন্সীর সক্রিয় যোগাযোগ বিদ্যমান। সন্দেহ নেই যে এর মধ্যে অনেকগুলো কার্যক্রম ( গবেষণার ) "বিকাশ মূলক" এবং "মৌলিক গবেষণা" হিসাবে চিহ্নিত। তবে এই প্রকল্পগুলো সবই জীব পরিবেশগত, জীবানুগত এবং মহামারী ব্যাধিগত। এগুলো আমাদের দেশের এবং পড়শীদেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে পারে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রকল্প ভারতের পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীয় কি-না, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই সমস্ত গবেষণালব্ধ প্রাথমিক তথ্য রাসায়নিক, জৈব-রাসায়নিক, উদ্ভিদ বিনাশক এবং নাশকতা বিরোধী যুদ্ধবিগ্রহে আগ্রহশীল ভিনদেশী গভর্ণমেন্টের খুব কাজে আসতে পারে কিন্তু এদেশের কোন মঙ্গল করবে না।"

কিছুকাল আগে কলকাতার কিছু বিজ্ঞানকর্মী এই মর্মে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে বিদেশী এজেন্সীর অর্থে পরিচালিত এই সব গবেষণা প্রকল্প এদেশের মানুষ ও পরিবেশকে নতুন নতুন মারণাস্ত্র পরীক্ষার গিনি-পিগে পরিণত করছে।

নয়া দিল্লীর "ন্যাশানাল হেরাল্ড" পত্রিকায় "জনৈক বিজ্ঞানকর্মী"র লেখা একটি প্রবন্ধ ( "বিজ্ঞান ও নয়া-সাম্রাজ্যবাদ" ) প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা হয় "বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা একটা আকর্ষণীয় ধারণা অবশ্য অংশ গ্রহণকারীরা যদি একই পথের পথিক হয় এবং যদি সকলের মান সমতুল হয়। নইলে সম্পর্কটা দাঁড়ায় দাতা-গ্রহীতার মত। গ্রহীতার নিজের পছন্দ বলতে কিছু থাকে না। দাতা-দেশের সামাজিক লক্ষ্য আর গ্রহীতা-দেশের সামাজিক লক্ষ্যের

মধ্যে মিল সামান্যই। দাতা-দেশ জ্ঞান বুদ্ধি ও কারিগরী কুৎকৌশলকে স্বদেশের সামাজিক উন্নয়নের ( তা সে স্বাস্থ্যই হোক, কৃষিই হোক আর শিল্পই হোক ) কাজে লাগাতে চায়। এই ধরণের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গ্রহীতা-দেশের কি লাভ হবে, সেটা বিচার করে দেখবার দায়িত্ব সেই দেশের বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীদের। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় এই বুদ্ধিজীবীদের মগজ এমন ভাবে ধোলাই হয়ে গেছে যে তারা দাতা-দেশের সামাজিক লক্ষ্যকেই নিজেদের দেশের লক্ষ্য বলে চিন্তা করে। বিশেষ করে ভারতবর্ষে এই ঘটনা নিয়তই ঘটে থাকে, কারণ, এদেশে বিজ্ঞানের ব্যাপারে লোকের ভাবনা চিন্তা একেবারেই প্রাথমিক স্তরের।"

প্রবন্ধে আরও লেখা হয়, "আগামী বছরগুলোয় যখন এই সব গবেষণা ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে তখন USDA ( কৃষি বিভাগ )র বিশেষজ্ঞরা মনে মনে এই আনন্দ নিয়ে ফিরবেন যে তারা মার্কিন ঔষধ শিল্পের জন্য বিরাট বাজারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। কারণ এই সব গবেষণার ফলে যে সব রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হবে তার একচেটিয়া মালিক হবে মার্কিন ঔষধ কোম্পানীগুলো আর ঐ সব রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রী হবে ভারতে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটছে বৈজ্ঞানিক আমলাতন্ত্রের যোগসাজসে এবং সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে দুঃখের ঘটনা। ( ন্যাশানাল হেরাল্ড, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ )

বোম্বাইয়ের "ইকনমিক এন্ড পলিটিকাল উইকলি' ১৯৭ সালের ৮ই অক্টোবর লিখেছিল, "সকল ক্ষেত্রেই গবেষণার লক্ষ্য ছিল জৈব-রাসায়নিক যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের উৎকর্ষ বিধান এবং বিশুদ্ধ গবেষণার নামে ভারতের মঙ্গল করার অজুহাতেই এই গবেষণার কাজ চালানো হয়েছে।"

কে-এন-কাবরা তার Political Economy of Brain Drain গ্রন্থে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, "এই সব গবেষণার ফলাফল আধা-উন্নত দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে টপসিক্রেট ( একান্ত গোপনীয় ) কিন্তু পেন্টাগণের তাকে সেগুলো সর্বদাই গড়াগড়ি খায়"।

উন্নয়নশীল দেশে গবেষণা জাতীয় কাজের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় পার্লামেন্টের পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি বিদেশের কয়েকটি "জনসেবামূলক" সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত কয়েকটি গবেষণার উল্লেখ করে বলেন যে এই ধরণের বেশীর ভাগ "জনসেবামূলক" সংস্থার সদর দপ্তর আমেরিকায়। মার্কিন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর দ্বারা তৈরী এইসব ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন "জনসেবামূলক" সংস্থা নামেই পরিচিত।

মার্কিন "ফাউণ্ডেশন ডাইরেক্টরী" এবং অন্যান্য প্রকাশিত দলিলের সহায়তায় এই প্রপঞ্চের অন্যান্য দিক বিবেচনা করার আগে ফাউণ্ডেশন এবং ট্রাস্ট সম্পর্কে ফার্ডিন্যান্ড লুণ্ডবার্গের মন্তব্য বিবেচনা কর দেখা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে ("The Rich and the Super-Rich") প্রায় সকল মার্কিন ফাউণ্ডেশনেরই আবির্ভাব ঘটেছে আয়কর এবং সম্পত্তিকর আইন চালু হবার পর। "ফাউণ্ডেশনগুলোর আয়কর তো নেইই, ক্যাপিট্যাল গেইন্স্ ট্যাক্সও (পুঁজির মূল্যবৃদ্ধির উপর কর) নেই।"

কর রেহাইয়ের এই কৌশল (ট্রাস্ট ও ফাউণ্ডেশন) জন-সংযোগ ব্যবস্থাও কাজে লাগিয়ে থাকে। তারা ওটা দেখিয়ে প্রচার করে ফাউণ্ডেশনের মালিকরা মস্ত দানবীর। লুণ্ডবার্গ তাঁর "আমেরিকার ৬০টি পরিবার" গ্রন্থে বলেছেন যে এই সব "দানবীররা" বেশীর ভাগই তাদের জীবনকালে তাদের মানব প্রেমের কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেনি। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ দাগী গুণ্ডাদের হাতে মেসিনগান সাজিয়ে কলকারখানা চালিয়েছে।

ট্রাস্ট এবং ফাউণ্ডেশনের তৃতীয় দিক হচ্ছে যৌথ-নিয়ন্ত্রণ (corporate control)। ট্যাক্স আইনের বেড়াজালে পড়ে যে কোন মালিক কোম্পানীর উপর তার নিয়ন্ত্রণ হারালেও হারাতে পারে কিন্তু ট্রাস্ট ও ফাউণ্ডেশন যদি কোম্পানীর মালিক হয়, তাহলে সে ভয় থাকেনা। ট্রাস্ট ও ফাউণ্ডেশনের কর্তা বংশানুক্রমে কোম্পানীর মালিকানা বজায় রাখতে পারেন এবং তার জন্য কোন ট্যাক্স তাকে দিতে হয় না।

চতুর্থ দিক হচ্ছে, ফাউণ্ডেশনের মারফৎ তার কর্তাদের ক্ষমতা বেশ দৃঢ়ভাবেই ছড়িয়ে পড়ে সংস্কৃতি, শিক্ষা (প্রচার), বিজ্ঞান, কলা ও সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে। তাঁদের অনুমোদিত প্রকল্পে তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা নেন কিন্তু যে সব প্রকল্প তাঁদের পছন্দসই নয়, সেই সব প্রকল্পে কখনও করুণাবর্ষণ করেন না। "অর্থ গ্রহীতার ধ্যান ধারণা দাতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই"। (এফ-লুণ্ডবার্গ)

লুণ্ডবার্গ বলেছেন, "কাগজপত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে ট্রাস্ট আর ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে যৌথ কোম্পানীর মালিকরাই গবেষণাকার্য এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে লোক বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে। ফাউণ্ডেশনগুলো পদার্থ বিজ্ঞানের গোঁড়া সমর্থক। কারণ সেক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল যৌথ কোম্পানীতে বহু মুনাফাজনক কাজে প্রয়োগ করা যায়। সযত্ন বিশ্লেষণে এটাই দেখা গেছে যে অন্যান্য সামাজিক শৃঙ্খলায় তারা

পাণ্ডিত্যের বাহ্যাড়ম্বর বজায় রাখবার জন্য তাদের প্রভাব বিস্তার করে। সংস্থাগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে অন্যান্য সামাজিক শৃংখলাগুলো কার্যত শূন্যগর্ভ, অথবা আত্মপ্রচারমূলক।

অল্প কথায় বলা যায় যে, "ফাউন্ডেশনের মধ্য দিয়ে যাত্রা সুরু করে তারা এক ডলারে অনেক বেশী রাস্তা এগিয়ে যেতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাদের বহু ডলারের সাশ্রয় হয়।"

১৯৬৪ সালে রাসেল সেজ ফাউন্ডেশন একটি "ফাউন্ডেশন ডাইরেক্টরী" প্রকাশ করে। সেই কেতাবে দেখা যাচ্ছে যে ফাউন্ডেশনের সংখ্যা ১৫০০০। তার সেই সংখ্যা প্রতি বছরই বেড়ে চলছে। ১৯৬৭ সালে ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী সেন্টার (নিউইয়র্ক) ৬৮০৩টি ফাউন্ডেশনের একটি তালিকা দিয়ে বলে যে তাদের সম্পত্তির মোট পরিমাণ ২০ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন=১০০ কোটি) ডলার।

ফাউন্ডেশন ডাইরেক্টরীর হিসাব অনুযায়ী ১৩টি ফাউন্ডেশনকে নেতৃস্থানীয় বলে বর্ণনা করা যায়। সেগুলো হচ্ছেঃ ফোর্ড ফাউন্ডেশন (৩৩২ কোটি ডলার), রকেফেলার ফাউন্ডেশন (৮৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার), ডিউক এনডাউ-মেন্ট (৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার), জন এ হার্টফোর্ড ফাউন্ডেশন (৩৬ কোটি ডলার), ডাব্লউ-কে-কেলগ ফাউন্ডেশন (৩১ কোটি ডলার), কার্ণেগি কর্পোরেশন (২৬ কোটি ডলার), আলফ্রেড পি স্লোয়ান ফাউন্ডেশন (২২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার), মাড ফাউন্ডেশন (১৮ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার), রকেফেলার ব্রাদার্স ফান্ড (১৫ কোটি ২০ লক্ষ ডলার), লিলি এনডাউমেন্ট ইনকো (১৫ কোটি ১০ লক্ষ ডলার), পিউ মেমোরিয়াল ফান্ড (১৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার)। ডানফোর্থ ফাউন্ডেশন (১২ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার), কমনওয়েলথ ফান্ড (১২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার)।

রাইট প্যাটম্যান মার্কিন ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনগুলোর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিস্তারিত তদন্ত করেছিলেন। রকেফেলার ফাউন্ডেশন সম্বন্ধে তাঁর কিছু বক্তব্য নীচে দেওয়া হচ্ছেঃ—

"১৯৬০ সালের শেষাশেষি রকেফেলার নিয়ন্ত্রিত ৭টি ফাউন্ডেশন ছিল নিউ জার্সির স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর ৭৮৯১৫৬৭টি শেয়ারের মালিক। তখন তার বাজার দর ছিল ৩২-৯৪৮১১০ ডলার। একই সময়ে এই একই ৭টি ফাউন্ডেশন সোকোনী মবিল অয়েল কোম্পানীর ২৩৬১০২৭০ ডলার মূল্যের শেয়ারেরও মালিক ছিল। দুটি রকেফেলার ফাউন্ডেশন কন্টিনেন্টাল অয়েলের ৩০৬০১৩ শেয়ারেরও মালিক ছিল। তখন তার বাজার দর ১৭০৬০২২৪ ডলার

( এর মধ্যে খোদ রকেফেলার ফাউণ্ডেশন ছিল ১৬৭২৫০০০ ডলার মূল্যের ৩০০০০০ শেয়ারের মালিক )। চারটি রকেফেলার ফাউণ্ডেশন ছিল ইণ্ডিয়ানার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর ৫৯৭৩৬৯৯১ ডলার মূল্যের ১৬৭২৫০০০ শেয়ারের মালিক। খোদ রকেফেলার ফাউণ্ডেশন ইউনিয়ন ট্যাঙ্ক কার কোম্পানীর ৩১০০০০০ ডলার মূল্যের ১০০০০০ শেয়ারের মালিক ছিল।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ( নিউ জার্সি ) যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী-গুলোর মালিকানায় ভাগ বসাতে চাইত, তাহলে সে প্রতিযোগিতা বাতিলের দিকেই ঝুঁকত এবং মনোপলির দিকেই অগ্রসর হত"। সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ তার বিরুদ্ধে তদন্ত সুরু করতেন।

"কিন্তু সেটা এড়াবার কৌশল অবলম্বন করে ( রকেফেলার ফাউণ্ডেশনের মালিকানা দেখিয়ে ) কার্যত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়ামই ( নিউ জার্সি ) কণ্টিনেন্টাল অয়েল, ওহিও অয়েল, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ( ইণ্ডিয়ানা ) ইত্যাদির প্রচুর শেয়ারের মালিকানা নিয়ে বসে আছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন সম্পর্কে প্যাটমানের আরও একটি বক্তব্য নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"১৯৬১ সালে যখন বৈদেশিক লেনদেনে সংকট দেখা দেয়, তখন ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ভিন দেশে ঋণ দেয়। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে সরকারী ভরতুকীর টাকা সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে কাজ করেছে। ১৯৬২ সালের ১৭ই মে অর্থদপ্তরের মন্ত্রী ডিলন এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে আমেরিকার মূলধনের বাজারে ইউরোপীয় ঋণপত্রের ক্রমবর্ধমান জোয়ারের ফলে ডলারের মূল্য বজায় রাখার সকল সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বসেছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ঋণ দানের ফলেই এই ভাবে আমেরিকার মূলধনের বাজার থেকে ডলার বেরিয়ে গিয়ে পৌঁছোচ্ছিল ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও কানাডার মত শিল্পোন্নত দেশগুলোয়।

"বিদেশী কর্পোরেশনগুলোকে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ঋণ দেওয়ার ফলে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমাদের গভর্ণমেণ্ট বিদেশে ডলার সাশ্রয়ের জন্য সৈনিক পরিবারদের দেশে ফিরিয়ে আনেন। তা সত্ত্বেও ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ১৯৬১ সালে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার রপ্তানি করে। ১৯৬০ সালেও ফোর্ড মোটর কোম্পানী বৃটিশ ফোর্ডের শেয়ারের সংখ্যালঘু অংশ ক্রয়ের জন্য ৩৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার রপ্তানি করে অথচ ঐ শেয়ার তাদেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল।

"ফল দাঁড়ালো এই যে সৈনিক পরিবারগুলোকে দেশে ফিরিয়ে এনে যে

ডলার আমরা বাঁচালাম, সেটা ফোর্ড ফাউন্ডেশন এবং ফোর্ড মোটর আবার বিদেশে পাঠিয়ে দিল। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, ফোর্ড ফাউন্ডেশন করদাতাদের ভরতুকী নিয়ে ( ট্যাক্স ছাড় ) তাদের কাজ কারবার চালিয়ে থাকে।"

মজা এই যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অস্তিত্ব না থাকলে ফোর্ডের প্রত্যেকটি ডলার উত্তরাধিকার কর হিসাবে সরকারী তহবিলে চলে যেতো এবং প্রত্যেকটি করদাতার কর-ভার হ্রাস পেতো।

রাইট প্যাটম্যান ছিলেন আমেরিকার প্রতিনিধি সভার ক্ষুদ্র ব্যবসা বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর তদন্তে ট্রাস্ট এবং ফাউন্ডেশনগুলোর কার্যকলাপ ফাঁস হয়ে যায়। তদন্তের পর প্যাটম্যান এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ফাউন্ডেশন গঠন করে নিম্নলিখিত কাজগুলো করা যায় :—

১। সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ।

২। দাতা নানাভাবে সম্পত্তির নানাবিধ সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে পারেন :

(ক) ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নির্দেশ করে দিতে পারেন ;

(খ) ফাউন্ডেশনের লগ্নীর উপর নিয়ন্ত্রণ চালু রাখতে পারেন ;

(গ) ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসাবে আত্মীয়দের নিয়োগ করতে পারেন ;

(ঘ) ফাউন্ডেশনের সম্পত্তি বন্ধক রেখে অপর সম্পত্তি ক্রয় করতে পারেন, অবশ্য তাতে যদি ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। ট্যাক্স-ছাড়ের ফলে উদ্বৃত্ত অর্থ মূলধনে রূপান্তরিত করে ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধি করতে পারেন।

৩। ফাউন্ডেশনের আয় দাতা তার পরিবারের মধ্যেই রেখে দিতে পারেন।

৪। পারিবারিক ফাউন্ডেশন দাতার কারবারে নিযুক্ত কর্মচারীকে সাহায্য দিতে পারেন।

৫। ব্যবসায়ের নতুন কোন উদ্যোগে টাকার অভাব হবেনা—এই রকম একটা গ্যারান্টি ফাউন্ডেশন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পাওয়া যেতে পারে।

৬। কোন ট্রাস্ট এবং কোন দাতব্য ফাউন্ডশন যখন ধীরে ধীরে কোন সম্পত্তির আয় কোন ফাউন্ডেশনকে প্রদান করে, তখন সেই সম্পত্তির আয় প্রকাশ না করলেও চলে।

৭। অন্যভাবেও ২০ শতাংশ ( বর্তমানে ৩০ শতাংশ ) দাতব্য-ছাড় ( ট্যাক্সে ) পাওয়া যেতে পারে :

(ক) যে সম্পত্তির প্রকৃত দাম খাতা-পত্রের দামের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে, সেই সম্পত্তি কোন ফাউণ্ডেশনকে দান করলে বাড়তি-দামের লাভের উপর ট্যাক্স এড়ানো যায় ;

(খ) ফাউণ্ডেশনকে টাকা দান করলে দান-খয়রাতি বাবদ ট্যাক্স-ছাড় পাওয়া যায় ,

(গ) মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি, ব্যয়বহুল জমিদারী, ঘরবাড়ী, শিল্পকলার দামী দামী অবদান এবং সকল ধরনের মূল্যবান সংগ্রহ বিলি করে দেওয়া যায় ।

ফার্ডিন্যান্স লুণ্ডবার্গ বলেছেন, কেউ কেউ সন্দেহ করেন যে এই ফাউণ্ডেশনগুলো আধা সরকারী গোয়েন্দা এজেন্সী । বিজ্ঞান সাধনার মর্যাদা নিয়ে এই ফাউণ্ডেশনগুলো পররাষ্ট্র দপ্তরের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করে থাকে । অতি সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে যে ফাউণ্ডেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যাপকভাবে সি-আই-এর আড়াল হিসাবে কাজ করে ।"

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যে ট্রাস্ট ও ফাউণ্ডেশন গঠন করেছে, সেগুলো দান-ধ্যানের ব্যাপার মোটেই নয় । আসলে সেগুলো হচ্ছে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর আরও টাকা কামাবার এবং নিজেদের মস্ত দানবীর হিসাবে প্রচার করার কৌশল মাত্র ।

ফার্ডিন্যান্ড লুণ্ডবার্গ ওরেলীয় "নিউ-স্পীক" ( নব-বাক ) কায়দায় বলেছেন, "এই নব-বাক ব্যবস্থায় কমিউনিজমের হাত থেকে আত্মরক্ষার অর্থ ভিয়েতনাম অথবা ডোমিনিকান রিপাবলিকের উপর আক্রমণ ; আত্মরক্ষার মানে আক্রমণ । দেশপ্রেমের অর্থ অপরের দৈহিক ক্ষতি সাধন, মুদ্রাস্ফীতির অর্থ সমৃদ্ধি, বিরাটত্বের অর্থ মহত্ত্ব এবং সম্পত্তির অর্থ দানধ্যান ।"

ভালভাবে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোয় যে সব গবেষণা প্রকল্পে কাজ চলছে, সেগুলোর উদ্যোক্তা এবং আর্থিক সাহায্য-দাতা হচ্ছে বিভিন্ন ফাউণ্ডেশন ও ট্রাস্ট ( যদি না সেগুলো বিদেশী গভর্ণমেন্টের উদ্যোগে ও টাকায় পরিচালিত হয় ) এবং সেই সব ট্রাস্ট ও ফাউণ্ডেশন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । উন্নয়নশীল দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এই সব প্রকল্পে কাজ করে বিজ্ঞান ও কারিগরীর অগ্রগতিতে সহায়তা করছেন কিন্তু তাঁদের মূল্যবান সব অবদানের পুরো মালিকানা ভোগ করছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো ।

উপরন্তু এই সব গবেষণা প্রকল্পে যে সব জিনিষ নিয়ে গবেষণা হয়, তার সংগে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোন সম্পর্ক নেই ; সে সব উন্নত দেশের, বিশেষ করে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর নিজেদের স্বার্থের ব্যাপার। উন্নয়নশীল দেশের অতি প্রতিভাবান ব্যক্তিরা গবেষণা করে যে ফল পেলেন, তা ভোগ করবে আন্তর্দেশীয় কোম্পানী। এও এক ধরনের মগজ পাচারের ঘটনা। বিজ্ঞানীরা দেশ থেকে নড়ছেন না, অথচ তাঁদের গবেষণার ফল ভোগ করছে ভিনদেশের কারবারীরা।

উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলের উপর আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এবং পরে সেই কারিগরী কৃৎকৌশলই অত্যধিক মূল্যে উন্নয়নশীল দেশে বিক্রয় করে। লুই টার্ণার, তাঁর "Multinational Companies And The Third World" গ্রন্থে বলেছেন যে আমেরিকায় বিদেশ থেকে আয়ের দুটি প্রধান সূত্র হচ্ছে বিদেশে লগ্নীকৃত মূলধনের মুনাফা ( লেনিন এটাকে কুসিদজীবী রাষ্ট্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন ) এবং কারিগরী কৃৎকৌশলের উপর রয়ালটি। টার্ণার হিসাব কষে দেখিয়েছিলেন ১৯৭৫ সালে সারা দুনিয়ার কাছ থেকে ডিভিডেন্ড, ফি এবং রয়ালটি বাবদ আমেরিকার প্রাপ্য দাঁড়িয়েছিল ১৭ বিলিয়ন ডলার। এর বেশীর ভাগটাই দিয়েছিল উন্নয়নশীল দেশগুলো।

আঙ্কটাড ( UNCTAD ) সদর দপ্তর মগজ পাচারের প্রপঞ্চকে মূলত কারিগরী কৃৎকৌশলের উল্টোগতি আখ্যা দিয়ে বলেছেন, "এই পদ্ধতিতে কারিগরী বিদ্যায় পশ্চাৎপদ দরিদ্র দেশগুলো তাদের কারিগরী সম্পদের একটা বড় অংশ প্রতি বছর পাঠিয়ে দিচ্ছে সে সব ধনী দেশে যাদের কারিগরী দক্ষতা অনেক বেশী"। এই প্রপঞ্চ সেই পুরোনো মেট্রোপলিটান-উপনিবেশিক সম্পর্কেরই আর এক রূপ। আন্তর্জাতিক পেটেন্টের অন্যায় ব্যবস্থার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রতিভা আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-গুলোর মুনাফার পদপ্রান্তে নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত কারিগরী কৃৎকৌশলের আন্তর্জাতিক বাজারেও কারিগরী বিদ্যায় পশ্চাৎপদ দেশগুলো পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। অথচ তাদেরই মাথায় কাঁঠাল ভেংগে ( অর্থাৎ তাদের দেশের উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের গবেষণার ফল আত্মসাৎ করে ) ধনী দেশের একচেটিয়া কারবারীরা ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠছে।

কে-এন-কাবরা তার "Political Economy and Brain Drain" গ্রন্থে

বলেছেন, "আজ ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরা (অথবা আন্তর্দেশীয় কোম্পানী) বাস্তব পণ্যের উপর একটা স্পর্শাতীত নতুন পণ্যও বেচতে সুরু করেছে। সেটা হল Know-how (কৃৎকৌশল)। উপনিবেশ এলাকা থেকে এখন তারা কাঁচামালের সঙ্গে টানছে উচ্চগুণসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জনশক্তি। কাঠ-কাটা আর জল-তোলার কাজ আর নেই। তার বদলে উন্নত বাজার-অর্থনীতির গবেষণা সংস্থায় কাজ করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে স্রোতের মত আসতে সুরু করেছে গ্রাজুয়েট আর পি-এইচ-ডির দল।"

ঘটনাটা ঘটে ঠিক এই ভাবে: আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যে মূলধন রপ্তানি করে তার অংগ হিসাবে রপ্তানি হয় তাদের কারিগরী কৃৎকৌশল। এটাকে কৃৎকৌশলের ঔপনিবেশিকতা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এই রপ্তানি থেকে যে আয় হয় তাতে আমেরিকার মত দেশগুলো হয়ে দাঁড়ায় কুসীদজীবী দেশ, দ্বিতীয়ত এই সব কারিগরী কৃৎকৌশল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত অথচ এগুলোর জন্য বিরাট মূল্য আদায় করে নেওয়া হয়। ফলটা দাঁড়ায় এই যে উন্নয়নশীল দেশগুলো এর জন্য ক্রমেই আরও বেশী করে পরনির্ভর হয়ে পড়ে। মগজ পাচারের প্রপঞ্চ উন্নয়নশীল দেশগুলো যথাযথ কারিগরী কৃৎকৌশল ক্রয় করার ক্ষমতা এবং আমদানীকৃত কৃৎকৌশল আত্মস্থ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

ভি-আই-লেনিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা উপনিবেশের শোষণকে "ষাঁড়ের চামড়া দু'বার ছাড়ানো" বলে বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে নয়া ঔপনিবেশিক শোষণকে ষাঁড়ের চামড়া চার বার ছাড়ানো বলে ব্যাখ্যা করা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

## ভারতীয় অভিজ্ঞতা

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার আবির্ভাবের সঙ্গে ভারতে বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবাহ শুরু হয়। আজ তা নতুন আকৃতি ও বিস্তার লাভ করেছে। পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানীর সবচেয়ে চালু রাস্তাটি হলো ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে দেশী সংস্থার সঙ্গে বিদেশী সংস্থার সহযোগিতা। এই সহযোগিতা থেকে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়ে থাকে বিদেশী ফার্মগুলো, সহযোগিতাকারী ভারতীয় ফার্মগুলোর ভাগ্যে শুধু জোটে লাভের ক্ষুদকুঁড়ো। সামগ্রিকভাবে দেশের ভাগ্যে খুব একটা কিছু জোটে না, বরং দেশজ প্রযুক্তিবিদ্যা বিকাশে এই সহযোগিতা বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সহযোগিতা হয়ে থাকে ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদেশী সংস্থা এবং অনুরূপ ভারতীয় সংস্থার মধ্যে। পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানীও প্রধানত হয়ে থাকে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সূত্র থেকে।

'ইন্টারন্যাশনাল ফ্লো অব প্রাইভেট ফরেন ক্যাপিট্যাল'-এ জাতিসংঘ বলছে,…"বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করছে এমন বেশ কয়েকটি দেশ থেকে চোরা পথে পুঁজি পাচার হয়ে যায়, যা কোনোক্রমেই তুচ্ছ করার মতো নয় এবং প্রায়শ পরোক্ষ রাস্তায় দীর্ঘমেয়াদী লগ্নী বজায় রাখতে সাহায্য করে।"

কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ান তাঁর "ইমপোর্ট অব ক্যাপিট্যাল অ্যান্ড টেকনোলজি" গ্রন্থে বলেছেন, সহযোগিতা যদিও ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তবু একে ঘিরে একটা ঢাকঢাক গুড়গুড় ভাব রয়ে গেছে এবং এ-ব্যাপারে কোনো বিস্তৃত তথ্যপরিসংখ্যানও পাওয়া যায়না। তাঁর অনুসন্ধানের সময় তিনি দেখেছিলেন, সহযোগিতা চুক্তিগুলোকে গোপন দলিল হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সংযোগী সংস্থাগুলো সচরাচর মুখ খুলতে চায় না।

আন্তর্জাতিক লগ্নীর প্রবাহকে সাধারণত উৎপাদিকা শক্তির স্থানান্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। মনে করা হয়, এটি হলো বৃদ্ধির ইনজিন। কিন্তু বিভিন্ন উন্নত দেশে এ-নিয়ে যে-সব গবেষণা করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে পুঁজি গঠনের ব্যাপারে বৈদেশিক লগ্নীর তাৎপর্য যৎসামান্য। আগের একটি

অধ্যায়ে এ-বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জাপান। আমাদের আলোচনায় আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় জাপানের বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ কারণ জাপানে বৈদেশিক লগ্নীর পরিমাণ সর্বনিম্ন।

১৯৬৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে মোট বৈদেশিক লগ্নীর পরিমাণ ছিল ১২৩০.৬ কোটি টাকা, এর মধ্যে ৯৮০.১ কোটি টাকা এসেছে প্রাইভেট (অর্থাৎ ট্রান্সন্যাশনাল) সূত্র থেকে, সরকারি উৎস থেকে এসেছে ২৫০.৫ কোটি টাকা। কাজেই মোটের ৭৯.৬৪ শতাংশেরই উৎস হলো ট্রান্সন্যাশনাল (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার হিসেব অনুযায়ী)। ভারতের ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্ষেত্রে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন বিনিয়োগ করেছে; এ-ছাড়া IBRD, AID ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও এ-দেশের প্রাইভেট সেক্টারের বিকাশে সহযোগিতা করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার নিরীক্ষা থেকে আরও একটি তথ্য জানা যাচ্ছে। এ-জাতীয় মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের অর্ধেকটাই হলো সেইসব কোম্পানির মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ। প্রকৃত পুঁজি আসছে খুবই কম। ১৯৬৬-৬৭ সালে দেশে এসেছিল মোট ৩৫১.০ কোটি টাকা; দেশ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল মোট ১১৬.৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ দেশে আসা মোট অর্থের পরিমাণ ২৩৪.৫ কোটি টাকা (RBI নিরীক্ষা)।

ইন্টারন্যাশনাল ফ্লো অব প্রাইভেট ক্যাপিট্যাল' সংক্রান্ত জাতিসংঘের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, নতুন বিনিয়োগে গাঁটের পয়সা লাগেনি। চালু ব্যবসায়ের অন্যায় লাভ থেকেই নয়া বিনিয়োগের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ হাসিল হয়েছে।

ভারতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রাইভেট বৈদেশিক লগ্নীর ৬০ শতাংশ বৃদ্ধির হদিশ এ-থেকে মিলতে পারে। নতুন লগ্নীর পরিমাণ ছিল মাত্র ৪০ শতাংশ।—(কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ান)। তিনি এ-ও সিদ্ধান্ত করেছেন, পুঁজি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং বৈদেশিক মুদ্রার অসুবিধে দূর করতে প্রাইভেট বৈদেশিক লগ্নীর ভূমিকা 'নিতান্তই নগণ্য'।

ভারতের এবং অন্যত্র বৈদেশিক প্রাইভেট বিনিয়োগের চারিটি রূপ: (ক) আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের একটি শাখা গড়ে তোলা, (খ) একটি অধস্তন শাখা গড়ে তোলা, (গ) একক-বৈদেশিক-উদ্যোগমূলক-অধস্তন সংস্থা, এবং (ঘ) ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা। চতুর্থ রূপটি ভারতে থাকার কারণ,

বৈদেশিক মালিকানাধীন কোম্পানির পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীনে কোনো অধস্তন সংস্থা থাকতে না-দেওয়ার সরকারি নীতি। কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। আর সেই ব্যতিক্রমের সূত্রে বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ ও মার্কিন ট্রান্সন্যাশনাল সুবিধা ভোগ করছে। যদি মনে করা হয় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের চাপেই এই সব ব্যতিক্রম রেখে দেয়া হয়েছে, তাহলে তা খুব অযৌক্তিক হবে না।

বেশ কয়েকটি একক-বৈদেশিক-উদ্যোগমূলক-অধস্তন সংস্থা পরবর্তীকালে যৌথ উদ্যোগে নিজেদের রূপান্তরিত করেছে। এর প্রধান কারণ ঐ ধরণের সংস্থার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ভারতীয় জনমতের চাপ।

ভারতবাসী মাত্রেই বেশ ভালো করেই জানেন, প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে বৈদেশিক লগ্নীর অর্থ ছিল একটাই, তা হলো দেশের শিল্পায়বের সমূহ সর্বনাশ। দুই দশকে (১৯৪৮ থেকে ১৯৬৮) ভারতের বৈদেশিক লগ্নীর চারিত্রিক ধাঁচ আমূল পরিবর্তনের কোনো ইংগিত নেই। এই দুই দশকে, বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক যে সমীক্ষা চালিয়েছিল তাতে দেখা গেছে ধাঁচটা সেই ঔপনিবেশকই থেকে গেছে। আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মাণের কোনো ব্যাপারই সেখানে প্রায় ছিল না। শিল্পের চেয়ে বাণিজ্য বিকাশকে ঘিরেই চিন্তাভাবনা চলত।

পরবর্তীকালে সরকার বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের উপর জোর দিল এবং সেজন্য ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য তৈরী সামগ্রী আমদানীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করল, ফলে আন্তর্দেশীয় পুঁজি নির্মাণের (manufacturing) কাজে লাগানো হলো। তবে তারা প্রধানত ভোগ পণ্য উৎপাদনে মন দিল।

সরকার ইংফ্রাস্ট্রাকচার (পরিবহন, জল বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবস্থা) গড়ে তুলল, এবং তৈরি হলো শুল্ক প্রাচীর ; ঘরোয়া বাজারে বিনিয়োগ, যা সংরক্ষিত, অত্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠল। তারপর সরকার তার নীতি আরো উদার করল, নানা রকম কনসেশন দেবারও ব্যবস্থা হলো। ফলে, নির্মাণের (manufacturing) ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশনালের লগ্নীও কিছুটা বেড়ে গেল। এইভাবে, ১৯৭০ সালের মধ্যেই দেখা গেল, ভারতে আন্তর্দেশীয় লগ্নীর পরিমাণ দাঁড়াল ১৬৪০·১ কোটি টাকা এবং ১৯৭৪ সালে ১৯৭৩·০ কোটি টাকা।

তথাপি ভারতে ট্রান্সন্যাশনালের লগ্নীর ধাঁচ এবং চরিত্র মূলত সেই একই রয়ে গেল। নির্মাণের ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশনালের লগ্নী পছন্দসই দ্রব্য বিশেষ করে খাদ্য ও সুরা প্রস্তুত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। দেখা গেল, এ-ক্ষেত্রেও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনেরই আধিপত্য বিরাজিত। পরিবহনের ক্ষেত্রে

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যাপারেও একচ্ছত্র আধিপত্য তাদেরই। এ-সব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে পিস্‌টন, ফুয়েল ইনজেক্‌শন, স্পার্কিং প্লাগ ইত্যাদি।

পছন্দসই অন্যান্য যে-সব ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশনালের লগ্নী কেন্দ্রীভূত সেগুলো হলো, টিনপ্লেট, টাংস্টেন, কারাবাইড, তামা পরিশোধন, জিঙ্ক গলন, লৌহেতর ধাতু, বিশেষত এলুমিনিয়াম।

ভারতে এ-সব ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশনালের লগ্নীর চরিত্র হলো সর্বময় কর্তৃত্বের, সেখানে ভারতীয় সংস্থার রা-টি কাড়ার উপায় নেই।

সম্প্রতি যে-সব ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশনালের লগ্নী সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বেড়েছে তা হলো রসায়ন ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্প। এর মধ্যে ৯৩ শতাংশই সরাসরি লগ্নী করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি পেটেন্ট ব্যবস্থাধীন ওষুধপত্র তৈরির ব্যাপারেও ট্রান্সন্যাশনাল অতিমাত্রায় উৎসাহ দেখাচ্ছে।

সংক্ষেপে বলা চলে, যে-সব দ্রব্য আগে আমদানী করা হতো, এখন তা দেশের মধ্যেই তৈরি করা হচ্ছে; এই ঘরোয়া বাজারও ট্রান্সন্যাশনাল কব্জা করে ফেলেছে, বাজারে এখন তাদের তৈরি জিনিসই একচেটিয়া আধিপত্য করেছে। ঘরোয়া বাজার হওয়া উচিত দেশজ সংস্থারই কর্মক্ষেত্র কিন্তু ট্রান্স-ন্যাশনাল তাদের হাত থেকে সে-বাজার ছিনিয়ে নিয়েছে। আগে হেন জিনিস নেই যা ভারতে আমদানী করা হতো না। এখন সেসব ভারতেই তৈরি হয়ে বাজারে আসছে। কিন্তু তৈরি করা এবং বাজারে ছাড়া—এই দুই বিষয়েই, বলতে গেলে, নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি রয়ে গেছে সেই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনেরই হাতে। এর ফলে, উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভারতীয় সংস্থা তথা ভারতের শিল্পায়নের স্বার্থ।

ভারতের বাজার নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন উপলব্ধি করল, এর ফলে একটা আন্তঃপুঁজিবাদী বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে; বিরোধটা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও ভারতীয় পুঁজির মধ্যে। ফলে ট্রান্সন্যাশনাল যৌথ কারবারের রাস্তা নিল। কেবল ভারতে নয়, সমস্ত উন্নয়নশীল দেশেই ট্রান্স-ন্যাশনাল ইদানীং এই রকম যৌথ কারবারে লগ্নী করার পথ নিয়েছে। এর দ্বারা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন তাদের সঙ্গে আপেক্ষাকৃত দেশের দেশজ পুঁজির বিরোধ কমিয়ে আনতে সমর্থ হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, যৌথ কারবারের এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সহযোগিতা চুক্তির দ্বারা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো তাদের নিজস্ব শাখা ও অধস্তন সংস্থা-গুলো থেকে ভারত এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে মূলধনী পণ্য, আধা-তৈরি

সামগ্রী ও কাঁচামাল রপ্তানী সুনিশ্চিত করতে পারে, লাভ ও রয়ালটির ওপরেও এগুলো উপরি পাওনা এবং ট্রান্সন্যাশনালগুলো তা নির্মমভাবে দোহন করছে।

কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ান যে সমীক্ষা করেছিলেন, তাতে দেখা গেছে যে-সব বিদেশী সংস্থা ভারতে বাণিজ্যের বদলে বিনিয়োগ করেছে তারা কেবল টিকেই যায়নি, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের নিজেদের দেশের কোম্পানি থেকে ভারতের মোট ক্রয়ের পরিমাণও বাড়াতে পেরেছে।

সি. আর. ক্যারল তাঁর 'প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাব্রড' গ্রন্থে বলেছেন, "বিদেশে কোনো যন্ত্রসংযোজন কারখানায় যে পুঁজি লগ্নী করা হয়েছিল তা থেকে কতটা লাভ হয়েছে তার হিসেব করাটা সবসময় ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই বাজারে বিক্রীর পরিমাণ কতটা রক্ষা করা যাচ্ছে তার হিসেবটা, কারণ, ঘরোয়া এবং বিদেশের বাজারে মোট বিক্রীর পরিমাণটাই হলো দেশজ কারখানায় উচ্চহার উৎপাদন ও নিম্নহার উৎপাদনী ব্যয়ের ভিত্তি স্বরূপ।" এই প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, আমেরিকা বছরে যে ১৪ শত কোটি ডলার মূল্যের নির্মিত সামগ্রী রপ্তানী করে থাকে তার চার ভাগের এক ভাগই পাঠিয়ে থাকে বিদেশে অবস্থিত মার্কিনী আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর অধস্তন সংস্থাগুলোতে। ( দ্র. "ইউ এস ট্রেড উইথ ফরেন অ্যাফিলিয়েট্স্ অব ইউ এস কম্পানিজ" ঃ এস. ফাইভার এবং এফ. কাটলার )

তৃতীয়ত, যদি ঘরোয়া লগ্নীকারীদের সহযোগী করা যায় তাহলে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের পক্ষে ঘরোয়া সম্পদের সমাবেশ ঘটানো অনেক সহজ হয়ে পড়ে। এইভাবে ট্রান্সন্যাশনাল তাদের নিজেদের ব্যয় কমিয়ে আনতে পারে এবং একই সঙ্গে ভারতীয় পুঁজি ( টাকা ) বাজার থেকে তুলে নিতে পারে। সহজেই বোঝা যায় ট্রান্সন্যাশনালে যদি নাক না গলাতো তাহলে স্বদেশী সংস্থা গড়ে তোলার জন্য জাতীয় স্তরে ভারতের পুঁজির ( টাকা ) সমাবেশ ঘটানো যেত।

চতুর্থত, যৌথ কারবারে ভারতীয় অংশীদার নিশ্চয়ই তার ট্রান্সন্যাশনাল অংশীদারের চেয়ে শ্রমিক সম্পর্ক অনেক ভালো বুঝবেন এবং অনেক যোগ্যতার সঙ্গে তাদের পরিচালনা করতে পারবেন কারণ দেশীয় শ্রমিকের মানসিকতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় তিনি অনেক ভালো বুঝবেন। এবং পরিশেষে, জনসংযোগ, সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক ব্যাপারে স্থানীয় অংশীদার বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠতে পারেন।

যৌথ কারবারে সহযোগিতা নানা ধরণের হয়ে থাকে। একটি হলো আর্থিক সহযোগিতা। ১৯৫৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের সূত্রে ভারতে আন্ত-

র্জাতিক কর্পোরেশনের সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। দেখা গেল, প্রথম পর্বে বছরে ৯টি ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা ঘটলো, দ্বিতীয় পর্বে তা বেড়ে দাঁড়ালে বছরে ৩৪টিতে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো, আর্থিক সহযোগিতার এই প্রতিটি ক্ষেত্রেও দেখা গেল সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হবার আগে যে মালিক ছিল তারই হাতে যৌথ কারবারের অধিকাংশ শেয়ার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থেকে গেল।

বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক সহযোগিতায় তৈরি সুপরিচিত পণ্যের দৃষ্টান্ত হলো, গুঁড়ো দুধ, কাচের বাসনপত্র, স্যানিটারি ফিটিংস, ট্রানজিস্টর, এয়ার কন্ডিশনার, ছাতার শিক, বল পয়েন্ট, আঠা ও তজ্জাত সামগ্রী, প্রসাধন ও সুগন্ধি দ্রব্য। এ-সব জিনিস তৈরি করতে খুব জটিল প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োজন হয়, এমন দাবি নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। তবু অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলো জাল বিছিয়ে বসে আছে।

কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ান-এর সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, আর্থিক সহযোগিতা-মূলক যৌথ কারবারে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো কদাচিৎ তাদের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ভারতে লগ্নী করে থাকে। যে ৭৪টি আর্থিক সহযোগিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তার মধ্যে ৪৯টি বিদেশী সহযোগী কারিগরী কলা-কৌশলের বিনিময়ে বিনামূল্যে ইকুইটি শেয়ার পেয়ে গেছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লগ্নীর সঙ্গে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে মিশিয়ে ফেলতেই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন আগ্রহী। সুব্রাহ্মনিয়ান বলেছেন, "আর্থিক সহযোগিতার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যাচেহ, আগত বিদেশী পুঁজি হিসেবে যা দেখা যাচ্ছে তা প্রযুক্তিবিদ্যা এবং যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের পরিবর্ত ছাড়া আর কিছু নয়।" এমন কি প্রযুক্তিবিদ্যা সরবরাহের ব্যাপারেও পুরো বিষয়টি বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, 'জিগস্ এন্ড টুল্স্ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ' কেন্দ্রিক।

কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ান আরো দেখিয়েছেন, (তাঁর পরীক্ষিত) ৭৯টি কোম্পানিতে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন মোট শেয়ারের এক তৃতীয়াংশের মালিক: কিন্তু কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার খুব অল্প অংশই তারা যুগিয়েছে। তদুপরি, যৌথ কারবারে প্রকল্পের জন্য আমদানী বাবদ ব্যয় মোট ব্যয়ের এক বিরাট অংশ দখল করে থাকে। মোদ্দা কথা, যৌথ কারবারে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে ট্রান্সন্যাশনাল তা থেকে ফয়দা তুলছে দু'হাত ভরে। সামগ্রিকভাবে, যৌথ কারবারের অংশীদার হিসেবে মূলধনী পুঁজি আমদানী করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার খুব সামান্যই যুগিয়েছে আন্তর্দেশীয়

কর্পোরেশন। পরিশেষে সুব্রাহ্মনিয়ান মন্তব্য করেছেন, "বিশ্লেষণ অন্তে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, আর্থিক সহযোগিতার ফলে যেখানে ভারতের বৈদেশিক দায় দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে সেখানে বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা সমাধানে তা কোনো প্রয়োজনীয় ভূমিকাই পালন করছে না।"

এছাড়াও, ট্রান্সন্যাশনাল সঙ্গে সহযোগিতার অন্য বিপদও রয়েছে। এই সহযোগিতার ফলে কোম্পানির সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের অধিকারী না হয়েও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন যৌথ-কারবারী কোম্পানির উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। "ফরেন এন্টারপ্রাইজেস ইন ইন্ডিয়া : লজ অ্যান্ড পলিসিস" গ্রন্থে এম. জে. ক্রুস্ট দেখিয়েছেন, "যে কোম্পানিতে বিদেশী সহযোগীর ইকুইটি শেয়ারের পরিমাণ ৪০ শতাংশ, দেশীয় সহযোগীর ৩০ শতাংশ এবং বাকি শেয়ার ছোট ছোট অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া, সেক্ষেত্রেও বিদেশী সহযোগী কার্যকর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা পেয়ে থাকে।" ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকও বলেছে, ৪০ শতাংশ বা তার বেশি শেয়ার আছে এমন ভারতীয় কোম্পানির ক্ষেত্রেও সংস্থাটি প্রকৃতপক্ষে বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত।

১৯৫৪-৬৪ সালের মধ্যে, অর্থনৈতিক সহযোগিতা রয়েছে এইরকম ২৫৫টি কোম্পানি সমীক্ষা করে কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ান দেখিয়েছেন, এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশন্যাল নিয়ন্ত্রণ চালাবার উপযোগী ইকুইটি শেয়ারের অধিকারী।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যৌথ কারবারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা ট্রান্সন্যাশনালের একটি চমৎকার হাতিয়ার। এই নিয়ন্ত্রণ পেতে তাদের বিশেষ পুঁজি ও লগ্নী করতে হয় না. এই ধরনের সংস্থায় ৪০ শতাংশ শেয়ার থাকলেই হলো। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ট্রান্সন্যাশনালের দান সামান্য। সমীক্ষা চালানো হয়েছে এমন ১৩৬টি বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক সহযোগিতামূলক কোম্পানিতে এই একই চিত্র। এই ১৩৬টি কোম্পানির মোট ইকুইটি মূলধনের পরিমাণ ১০৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। গড়ে প্রতিটি সংস্থার মূলধনের পরিমাণ ৭৭.৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে ভারতের অংশ ৯২.৩ লক্ষ টাকা।

বলা হয়ে থাকে, বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত সব যৌথ কারবারেই কাজকর্ম অনেক বেশি দক্ষতার সংগে সমাধিত হয়ে থাকে। মন্তব্যটা খুব না ভেবে-চিন্তেই করা হয়। আটটি শিল্প থেকে ২২টি (জোড়া) বেছে নিয়ে কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ান পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। এগুলো হলো : উলের বস্ত্র, পরিবহন যন্ত্রাংশ, ভারী ইন্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক ইন্জিনিয়ারিং, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয়

যন্ত্রপাতি, হালকা ইনজিনিয়ারিং, কেমিক্যাল এবং রবারের টায়ার। যে যে বিষয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল সেগুলি হলো: (ক) আর্থিক কাঠামো, (খ) সম্পদের (asset) ব্যবহার, (গ) উৎপাদনী ব্যয়ের কাঠামো, (ঘ) লাভ-যোগ্যতা এবং উপযোজকতা।

সমীক্ষার ফল এইরকম: ট্রান্সন্যাশনাল যে-সব কোম্পানি তদারক করে তাতে লাভ বেশি হয়; এর কারণ যে-সব পণ্যে লাভ বেশি এরা সে-সব পণ্য উৎপাদনেই মনোযোগ দেয়। কিন্তু সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো বেশি যোগ্যতার পরিচয় দেয় এমন কোনো চিহ্ন নেই।

পরিশেষে সুব্রাহ্মনিয়াম বলেছেন,·· "মনে হচ্ছে, নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক লগ্নীর মাধ্যমে পশ্চিমী বাণিজ্যের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সার্বিক আমদানী প্রয়োজনীয়ও নয়, বা কম ব্যয়সাধ্যও নয়।"

১৯৭৩ সালের 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশনস্ অ্যাক্ট' (FERA) নির্দেশিত পথে ভারতে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতা হয়ে থাকে। পথনির্দেশিকা এইরকম:

১৩টি বিদেশী কোম্পানী লোকসভার প্রশ্নোত্তর অনুযায়ী এই পথনির্দেশিকা মেনে নিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ ছিল, তাই তারা ভারত থেকে তাদের কারবার গুটিয়ে নিল। এদের মধ্যে রয়েছে: কোকা কোলা এক্সপোর্ট কর্পোরেশন, কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ, আই. বি. এম. (IBM) ওয়ার্লড ট্রেড কর্পোরেশন, ডান্স রাইস (ইন্ডিয়া) লিঃ, কলকাতা, নিউম্যাটিক টুল কোং লিঃ, বোম্বে, প্রভৃতি।

যে ট্রান্সন্যাশনালগুলো নির্দেশ মেনে রয়ে গেল তারাও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থেকেও বাড়তি মুনাফা কুড়িয়ে নিল। এটা হতেই পারে, কারণ সরকারকেও অনেক সময় বাস্তব অবস্থার চাপে নীতি একপাশে সরিয়ে রাখতে হয়।

এইভাবেই দেখা গেল ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানিকে নতুন করে ১·৮ কোটি টাকার ইকুইটি মূলধন ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হলো। ফলে হলো এই যে, আগেকার বিদেশী (non-resident) ইকুইটি পুরোটাই অটুট রইল এবং (নতুন ইকুইটি মূলধন ছাড়ার ফলে) তার হার ৪০ শতাংশের নিচে নেমে এল; আর এইভাবেই বিদেশী ইকুইটি আরো বেড়ে যাবার সুযোগ সৃষ্টি হলো। (দ্র. ভি. গৌরীশঙ্কর: 'টেমিং দ জায়েন্টস'")

দিল্লীর ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস দেখিয়েছে যে উইমকো লিঃ, মূলার

অ্যান্ড ফিলিপস্, ডুফার ইন্টারফার্ম লিঃ, রেকিট অ্যান্ড কোলম্যান অব ইন্ডিয়া লিঃ, হিন্দুস্থান দা-অলিভার লিঃ, হিন্দুস্থান লিভার, ইন্ডিয়া ফয়েলস্, এস, ইএ লিঃ, ক্যাডবেরী লিঃ-এর প্রত্যেকেই তাদের মূলধনী ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করেছে। ফলে পুরোনো এবং নতুন ইকুইটি শেয়ার মেশাবার সুযোগ কার্যকর করা সত্ত্বেও তারা লাভের পরিমাণ বাড়াতে পেরেছে। ঠিক এই কাজই করেছে ভারতীয় অধস্তন সংস্থা ভাজির সুলতান টোব্যাকো সম্পর্কে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ; এবং ইউনিয়ন কারবাইড ( ইন্ডিয়া ) সম্পর্কে ইউনিয়ন কারবাইড।

## প্রযুক্তিবিদ্যাগত সহযোগিতা

ভারতে নবাগত আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন সম্পর্কে এফ. ই. আর-এ নির্দেশাবলী প্রযুক্ত নয়। নতুনদের প্রবেশ সম্পর্কে পথনির্দেশিকা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউশন—এটি লোকসভায় উত্থাপিত হয় ১৯৭৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিদেশী বিনিয়োগ ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে কারণ ঃ

"প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য সরকার মনে করে, যে সব ক্ষেত্রে ভারতীয় দক্ষতা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা যথোপযুক্ত বিকশিত নয়, সেই সব অত্যাধুনিক ও অতি-জরুরী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিবিদ্যা বাইরে থেকে দেশের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এ-সব ক্ষেত্রে প্রাপ্তব্য শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ্যা সরাসরি কেনার এবং দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে আধিগত করার উপর সরকার অগ্রাধিকার দেবে। ভারতের যে যে সংস্থা বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানীর অনুমতি পাবে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাদের যথাযোগ্য গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে আমদানী-করা প্রযুক্তিবিদ্যা যথাযথভাবে দেশের উপযোগী ও অংগীভূত হতে পারে। এই কাজ তারা ঠিক ঠিক করছে কি-না তা দেখার জন্য সরকার 'ফরেন ইনভেস্টমেন্ট বোর্ড'-এর দপ্তরে বৈদেশিক সহযোগিতা বিষয়ক একটি 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্রি' গড়ে তুলবে। ভারতের শিল্পবিকাশে বিদেশী কোম্পানির অংশগ্রহণ সম্পর্কেও সরকার তার নীতি স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে চায়। ভারতে যে সব বিদেশী কোম্পানী ইতিমধ্যেই রয়েছে তাদের সম্পর্কে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশনস্ অ্যাক্ট' অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হবে। এই আইন অনুযায়ী মিশ্রণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর, যে-সব কোম্পানির সরাসরি বৈদেশিক লগ্নীর পরিমাণ ৪০ শতাংশের কম, তাদের, বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত ব্যতিক্রম ছাড়া ভারতীয় কোম্পানীগুলোর সংগে এক

করে দেখা হবে, এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ সম্পর্কেও ভারতীয় কোম্পানী-গুলোর প্রতি প্রযুক্ত একই নীতি প্রয়োগ করা হবে।

"জাতীয় স্বার্থে ভারত সরকার নির্ধারিত শর্তেই কেবল ভারতের শিল্প-বিকাশে প্রয়োজনীয় বিদেশী লগ্নী ও প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে। যে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রযুক্তিবিদ্যার কলাকৌশলের প্রয়োজন নেই সে সকল ক্ষেত্রে স্থিত সহযোগিতার নবীকরণ হবে না এবং এ সব ক্ষেত্রে কর্মরত বিদেশী কোম্পানীগুলোকে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন্স্ অ্যাক্টে'র কাঠামোর মধ্যে জাতীয় অগ্রাধিকারের সংগে সংগতি রেখে নিজেদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সংশোধন করতে হবে। নতুন নতুন শিল্পের উদ্যোক্তাদের পথ দেখানোর জন্য সরকার এমন সব শিল্পের একটি সংশোধিত বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করবে যেসব শিল্পে আর্থিক অথবা প্রযুক্তিবিদ্যাগত কোনো সহযোগিতারই প্রয়োজন নেই কারণ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যা পুরোপুরি বিকশিত।

"সকল অনুমোদিত বিদেশী লগ্নীর ক্ষেত্রেই মুনাফা, রয়্যালটি, ডিভিডেন্ড পাঠানোর পুরোপুরি স্বাধীনতা থাকবে, স্বাধীনতা থাকবে মূলধন ফেরৎ পাঠানোর, অবশ্য সকলের পক্ষে প্রযুক্ত আইনকানুন অনুযায়ী। নিয়ম অনুযায়ী মালিকানার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকবে ভারতীয়-দের হাতে, অবশ্য অত্যাবশ্যকীয় রপ্তানী অভিমুখীন এবং / অথবা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সরকার ব্যতিক্রম ঘটাতে পারবেন। শতকরা একশ ভাগ রপ্তানী-অভিমুখীন ক্ষেত্রে সরকার পুরোপুরি বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানীর কথা বিবেচনা করতে পারে।"

ভারত সরকারের পথনির্দেশিকায় ফাঁকফোকড় যথেষ্টই রয়েছে, আর সেই সুযোগই পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো। যে-সব ক্ষেত্রে ভারত প্রযুক্তিবিদ্যাগত সহযোগিতা অর্জন করেছে সেদিকে নজর দিলেই এটা ধরা পড়বে।

মনে রাখতে হবে, বিদেশ থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে এলেই কোনো উন্নয়নশীল দেশের প্রযুক্তিবিদ্যাগত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। আমদানী করা প্রযুক্তি-বিদ্যা অধিগত করে নিজের দেশের উপযোগী করে তোলা চাই। উন্নয়নশীল দেশকে জানতে হবে কোন্ প্রযুক্তিবিদ্যা তার প্রয়োজনীয়। সেইসংগে এ-ও মনে রাখতে হবে বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা স্থানীয় পরিবেশের সংগে খাপ না খেলে পুরো ব্যাপারটাই অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত, উভয় দিক থেকেই ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে।

প্রযুক্তিবিদ্যাগত সহযোগিতাও দুধরণের হয়ে থাকে : (১) নির্ভেজাল প্রযুক্তিবিদ্যাগত সহযোগিতা এবং (খ) আর্থিক-তথা-প্রযুক্তিবিদ্যাগত সহযোগিতা। আর এক ধরণের সহযোগিতা আছে তার নাম, 'টার্ন-কি-কনট্রাক্ট' অর্থাৎ প্রকল্পের পুরোটাই তৈরি করে দেওয়া। প্রযুক্তিবিদ্যাগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী মেলামেশার প্রয়োজন হয়, টার্ন-কি-কনট্রাক্টের বেলায় তার দরকার হয় না। প্রযুক্তিবিদ্যাগত সহযোগিতায় উৎপাদনের জন্য কারিগরী কলাকৌশল আমদানী আবশ্যিক হওয়া চাই, টার্ন-কি-কনট্রাক্টে কেবল প্রকল্প নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ।

প্রযুক্তিবিদ্যাগত সহযোগিতা হয়ে থাকে প্রধানত বৈদ্যুতিক-ইনজিনিয়ারিং, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পরিবহন যন্ত্রাংশ, মেশিন টুলস, কেমিক্যালস্ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এই সহযোগিতার দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যগুলোকে ৭৩০টি ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীতে ভাগ করা যায় (কে. কে. সুব্রহ্মনিয়ান)। এছাড়া রয়েছে ২৪৫টি ক্ষেত্রে 'কারিগরী' সহযোগিতা, ৭০টি সামগ্রী যার অন্তর্ভুক্ত। এই সহযোগিতাকে কোনক্রমেই অতিপ্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করা যায় না। এই উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে পেনসিল, সুগন্ধী সাবান, সিগারেট, জুতো, টুথপেস্ট, বিস্কুট, প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি। এই সবকটি জিনিসই দেশীয় উৎপাদকরা তৈরি করতে সমর্থ।

কেউ কেউ হয়তো যুক্তি দেখাবেন, এসব জিনিস তো রপ্তানীও করা যেতে পারে। কিন্তু সে যুক্তিও ধোপে টেঁকে না। কারণ বিদেশী সহযোগিতায় প্রস্তুত ৫৩টি সামগ্রীর মধ্যে মাত্র ১৪টির ক্ষেত্রে রপ্তানীর অনুমতি রয়েছে। উৎপাদনের একটা অংশ অবশ্যই রপ্তানী করতে হবে—শিল্প-লাইসেন্স অনুমোদনের এই পূর্বশর্ত কার্যক্ষেত্রে প্রায়শ লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। বিদেশী সহযোগিতায় প্রস্তুত বেশির ভাগ সামগ্রী রপ্তানী করার ব্যাপারে কোনো না কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত রয়েছে। (উৎস : পূর্বে উল্লিখিত সূত্র)

এই ধরণের সহযোগিতা কেবল স্থানীয় উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করে, দেশীয় শিল্পায়ন প্রচেষ্টায় গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, অন্য দিক থেকেও এই সহযোগিতা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক : সহযোগী ট্রান্সন্যাশনালের মর্জি অনুসারে মূলধনী পুঁজি ও কাঁচা মাল আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। তদুপরি, এইসব সামগ্রী সমাজের উঁচুতলার আত্মকেন্দ্রিক মানুষের চাহিদা মেটায়, দেশের অর্থনীতির বিকাশে কোনো সাহায্য করে না। সংক্ষেপে বলা যায়, সম্পদের এই বরাদ্দ নিতান্ত অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

সহযোগিতার দ্বারা প্রস্তুত ৭৩০টি সামগ্রীর প্রত্যেকটি কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়াম পরীক্ষা করে দেখেছেন। ৮৯টি সামগ্রীর নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য নেই—এদের প্রকৃতি ব্যাপক। ২৬৫টি নির্দিষ্ট সামগ্রীর বেলায় প্রতি ক্ষেত্রে কেবল একটি সহযোগিতামূলক। অনুমোদিত ৩৭৬টি সামগ্রীর ক্ষেত্রে সহযোগিতা একটির বেশি। এই ৩৭৬ টি সহযোগিতার ৬০ শতাংশের জন্য বারংবার প্রযুক্তিবিদ্যাগত কলাকৌশল আমদানী এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়েছে। এ-কাজ না করেও পারা যেত। একই সামগ্রীর জন্য, একই ট্রান্সন্যাশনালের সঙ্গে একাধিক সহযোগিতা অনুমোদনের ঘটনাও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

এসবের ফলে একই শিল্পের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক মাত্রা, নির্দিষ্ট বিশেষত্ব ও মাপ ব্যবহার করে থাকে। এর অর্থ আরো বেশি জিনিসের তালিকা জমে যাওয়া এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল অযথা ব্যয় হয়ে যাওয়া। "...সহযোগিতার সংখ্যাধিক্যের ফলে সৃষ্ট ভারতীয় শিল্পে মালমশলা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সংখ্যাধিক্য ভারতীয় শিল্পে অত্যল্প উৎপাদনশীলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।"—(সুব্রাহ্মনিয়াম)। ভারতীয় শিল্পের অল্প উৎপাদন, অতিরিক্ত ব্যয় ও অপেক্ষাকৃত অযোগ্য পরিচালনার এটাই কারণ। এগুলো প্রযুক্তিবিদ্যা ও পুঁজি অতি-আমদানীর ফল। অতিরিক্ত এই আমদানীর ফলে, রয়্যালটি এবং অন্যান্য ফী ছাড়াও, প্রকাশ্যে এবং গোপনে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে বাড়তি দাম মিটিয়ে দিতে হয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও (যে-সব সামগ্রীকে অ-প্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য করা যাবে না) সহযোগিতার অর্থ কাঁধে বাড়তি বোঝা টেনে নেওয়া। বিষয়টি বোঝাবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর কাজ শুরু হয় 'প্রাথমিক সেবা' দিয়ে। এধরনের সেবার জন্য যে কারিগরী কাজকর্মের প্রয়োজন হয় তা ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরাই বেশ ভালোভাবে করতে সমর্থ। কিন্তু তা করতে দেওয়া হয় না; 'ইনজিনিয়ারিং ফীজ' হিসেবে ট্রান্সন্যাশনালগুলো বহু অর্থ কামিয়ে নিচ্ছে। তারপর যন্ত্রপাতি বিক্রি এবং প্রযুক্তিবিদ্যা এ-দেশে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধন রয়েছে। বন্ধন এত ঘনিষ্ঠ যে ভারতীয় অংশীদারকে বাধ্য হয়ে অনেক বেশি দাম ধরে দিতে হয়—দুটোকে তিনি আলাদা করতে পারেন না। ভারতীয় অংশীদার যদি প্রযুক্তিবিদ্যা (Knowhow) না ও গ্রহণ করে তাহলেও তাকে তার জন্য দাম দিতে হবে, নইলে তিনি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ পাবেন না। তৃতীয়ত, নকশা (drawings) এবং স্পেসিফিকেশন তৈরি করবে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো। ফলে অতি-

মাত্রার যন্ত্রপাতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে ; আর এইসব যন্ত্রপাতিও কিনতে হবে ট্রান্স-ন্যাশনালের একই উৎস থেকে।

সহযোগিতা চুক্তিগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এমন কোনো চুক্তি নেই যেখানে স্বদেশী গবেষণা এবং বিকাশের জন্য আন্তর্দেশীয় সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ্যাগত যে-কোনো উদ্ভাবনের জন্যই ভারতকে বিদেশী সহযোগিতার উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। এবং এর জন্য সর্বদাই ট্রান্সন্যাশনালকে বাড়তি কড়ি যোগাতে হবে। চুক্তিতে এ-কথাও বলা আছে ভারতীয় উদ্যোগকে তার সবরকম উদ্ভাবনের কথাই দ্রুত এবং সম্পূর্ণভাবে ট্রান্সন্যাশনালকে জানিয়ে দিতে হবে এবং সব দেশের সহযোগীদের নিরঙ্কুশ অধিকার দিতে হবে। চুক্তিতে রয়্যালটি এবং টেকনিক্যাল ফীজ—দুইয়েরই কথা বলা আছে ; কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই রয়্যালটি পরীক্ষিত উৎপাদন দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত নয়।

এসব ছাড়াও চুক্তিতে আরো নানা ধরণের নিয়ন্ত্রক ধারা রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি ধারা এইরকম ঃ

১। ভারতীয় যৌথ-উদ্যোগ কর্তৃক প্রযুক্তিজ্ঞান ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ,

২। উৎপাদনের/প্রক্রিয়ার নক্শা এবং প্রযুক্তিজ্ঞানে কোনো রকম পরিবর্তন আনয়নে যৌথ-উদ্যোগের স্বাধীনতা সীমিতকরণ ;

৩। উৎপাদনের উপর বিদেশী সহযোগীর নিয়ন্ত্রণ ;

৪। বিদেশী ক্রয়ের উপর ট্রান্সন্যাশনালের নিয়ন্ত্রণ ;

৫। স্থানীয় বিক্রয়ের উপর বিদেশী নিয়ন্ত্রণ ;

৬। উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানী করার উপর যৌথ-উদ্যোগের স্বাধীনতা সীমিতকরণ।

প্রযুক্তিবিদ্যাগত দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রসারের ব্যাপারেও সহযোগী-চুক্তিতে সবসময়েই গোপন ধারা থাকে। যেমন ঃ

"চুক্তি বলবৎ থাকাকালে লাইসেন্সধারীকে সবরকমের প্রযুক্তিবিদ্যাগত খবরাখবর গোপন রাখতে হবে এবং লাইসেন্সধারীর সকল কর্মীকেই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।" (ইতালীয় সংস্থার সঙ্গে চুক্তি)

ব্রিটিশ ট্রান্সন্যাশনালের (তারের দড়ি তৈরি সংক্রান্ত) সঙ্গে চুক্তিতে এই ধারাটি রয়েছে ঃ

"ভারতীয় কোম্পানী, সহযোগীর সরবরাহ করা প্রযুক্তিবিদ্যাগত জ্ঞান তৃতীয় কোনো পক্ষকে জানাতে পারবে না।"

মার্কিন ট্রান্সন্যাশনালের সঙ্গে ( অ্যালুমিনিয়াম তৈরির ) সম্পাদিত চুক্তিতে এই ধারাটি রয়েছে ঃ

"ভারতীয় কোম্পানি প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিসংখ্যান অত্যন্ত গোপনে রক্ষা করবে, অন্য কারো কাছে ফাঁস করবে না।"

চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরেও ভারতীয় অংশীদারকে গোপন ধারা মেনে চলতে হয়। কৃত্রিম রবার এবং রপারের প্রস্তুতকারক মার্কিন ট্রান্সন্যাশনালের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে।

একটি ব্রিটিশ ট্রান্সন্যাশনাল ভারতের উপর এই শর্ত আরোপ করেছে ঃ ব্রিটিশ কোম্পানির অনুমতি ছাড়া ভারতীয় কোম্পানি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাউকে প্রযুক্তিজ্ঞান দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না, যাতে তারা দেশে বা অন্যত্র তা কাজে লাগাতে পারে।

এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ফলে, একই প্রকারের অন্যান্য সহযোগী-চুক্তির ফলে ইতিমধ্যেই দেশে যে-সব প্রযুক্তিজ্ঞান রয়েছে সেগুলিকেও ভারতীয় অংশীদারকে আমদানী করতে হয়। এর অর্থ, একই প্রকারের প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানী করার জন্য দুই খেপে অথবা তিন খেপে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়।

একটি মার্কিন ট্রান্সন্যাশনাল ভারতীয় সহযোগীর উপর এই শর্ত আরোপ করেছে ঃ

"নতুন কোম্পানি যে প্রযুক্তিবিদ্যাগত তথ্য, উপদেশ এবং জ্ঞান লাভ করেছে তা কেবল ভারতে তার নিজের ব্যবহারের জন্য এবং বিদেশী সহযোগীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া অন্যত্র কোনো প্রকল্পের নকশা, অথবা নির্মাণ অথবা কাজকর্ম বজায় কাজে তা ব্যবহার করা চলবে না।"

এছাড়া অন্য ধরণের বিধিনিষেধও রয়েছে। দুটি দৃষ্টান্ত ঃ

ক. "নির্মাণ এবং সারাই…করতে হবে বিদেশী সহযোগীর দেওয়া পরিকল্পনা, স্পেসিফিকেশন, ও তথ্য পরিসংখ্যান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে" ( ব্রিটিশ ট্রান্সন্যাশনাল ) এবং

খ. "উৎপন্ন সামগ্রী হতে হবে বিদেশী সহযোগীর দেওয়া ব্লু-প্রিন্ট হুবহু অনুসরণ করে এবং বিদেশী সহযোগীর লিখিত পূর্ব অনুমোদন এবং অনুমতি ছাড়া ভারতীয় কোম্পানি কোনোরকম পরিবর্তন করতে পারবে না।" ( ব্রিটিশ ট্রান্সন্যাশনাল )

আবার, প্রকল্প এবং কারখানা-ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো ঃ

"কারখানা ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদেশী সহযোগীর দেওয়া নক্শা, ডিজাইন, এবং স্পেসিফিকেশন পুরোপুরি মেনে নেওয়া ভারতীয় পক্ষের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।"

বিদেশী সহযোগীর দেওয়া প্রযুক্তিজ্ঞান ভারতীয় পক্ষ কখনই বদলাতে পারে না। কিন্তু বিদেশী সহযোগী যদি কোনো পরিবর্তন ঘটায় তবে ভারতীয় পক্ষকেও সেই পরিবর্তন মেনে নিতে হয়। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তা প্রয়োজনীয় কি না, তার কথা আদৌ চিন্তা না করে একটা চাপিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, হয়ত মডেল একই রয়েছে কিন্তু অন্যান্য অংশ বা যন্ত্রাংশের স্পেসিফিকেশন অনেকখানি বদলানো হয়েছে।

এই সমস্ত ব্যবস্থারই উদ্দেশ্য একটা—আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের স্বার্থসিদ্ধি। আর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মালমশলা আমদানী করা তো সর্বদাই ভারতীয় পক্ষের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, এই সব বিধিনিষেধ আরোপের ফলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যার ফলে ভারতের বাজারে প্রাপ্য মালমশলা, যন্ত্রাংশও ভারতীয় পক্ষকে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কাছ থেকে আমদানী করতে হয়। ফলে ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের সব সময়েই ট্রান্সন্যাশনালের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়; অন্য দিকে যে সব ভারতীয় সংস্থা এইসব মালমশলা ও যন্ত্রাংশ তৈরি করতে সক্ষম তারাও ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে বাজারছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

বিদেশে অবস্থিত ট্রান্সন্যাশনালের কাছ থেকে জিনিস কিনতেও সংযোগী আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো ভারতীয় পক্ষকে বাধ্য করে। চুক্তির কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করলে বিষয়টি বোঝা যাবে ঃ

একটি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, "বিদেশী সহযোগীর অধস্তন সংস্থাগুলো থেকে কাঁচা মাল আমদানী করতে হবে", আর একটি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, "সমস্ত যন্ত্রাংশ (অবশ্যই) বিদেশী সহযোগী অথবা তার পূর্ণ-মালিকানাধীন অধস্তন সংস্থা থেকে কিনতে হবে।"

আরও একটি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, "লাইসেন্সধারীকে তার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সবকিছুই আমদানী করতে হবে কেবলমাত্র বিদেশী সহযোগী অথবা অধস্তন সংস্থা থেকে।"

এ-ধরনের কেনাকাটার ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানিগুলোকে সাধারণ বাজারদরের

চেয়ে বেশি দাম দিতে হয়। "প্রযুক্তিবিদ্যাগত কারণের" অজুহাতে ট্রান্সন্যাশনাল কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানিগুলোকে বেশি দামে কাঁচা মাল কিনতে বাধ্য করে।

এর ফলে সহযোগিতামূলক প্রতিটি ভারতীয় কোম্পানির আমদানী-বিল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই গলা-কাটা দরে জিনিস বেচেও কিন্তু ট্রান্সন্যাশনাল খুশি নয়। কখনো কখনো সে ভারতীয় কোম্পানির পক্ষে ক্রেতা সেজে বসে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট: এইভাবে বাড়তি কমিশন আদায়। কিভাবে এটা হয়ে থাকে, ট্রান্সন্যাশনালের সঙ্গে চুক্তির নিম্নলিখিত ধারাটির প্রতি নজর দিলেই তা বোঝা যাবে:

"বিদেশী সহযোগীই পারচেজিং এজেন্ট থাকবেন, কিন্তু ধারায় এমন কিছু থাকবে না যাতে বিদেশী সহযোগীকে সর্বনিম্ন টেন্ডারই মেনে নিতে হতে পারে।"

সম্প্রসারণের সময়েও একই ট্রান্সন্যাশনালের কাছ থেকে ভারতীয় কোম্পানী-গুলোকে যন্ত্রপাতি কিনতে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন বাধ্য করে। দেখা গেছে, বিদেশী সহযোগীতামূলক সংস্থায় উৎপাদিত সামগ্রীতে আমদানীকৃত উপাদানের হার অনেক বেশী। ( দ্র. কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ান: "ইমপোর্ট অব ক্যাপিটাল আন্ড টেক্নোলজি" )

সংস্থার অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিজেদের লোক নিয়োগ করেও আন্ত-র্দেশীয় সহযোগীরা ভারতীয় কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উৎপাদনের যাবতীয় প্রযুক্তিবিদ্যাগত ব্যবস্থাপনা এইভাবে তাদের হাতে চলে যায়। সুব্রাহ্মনিয়ান একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, কোনো একটি সংস্থায় বিদেশী সহযোগীর ইকুইটি শেয়ারের পরিমাণ মাত্র $\frac{1}{8}$ অংশ কিন্তু চুক্তিতে বলা হয়েছে. "যতদিন পুঁজির অংশীদার থাকবে ততদিন বিদেশী কোম্পানীর, বোর্ড অব ডাইরেকটর্স-এর জন্য একজন ডাইরেকটর নিয়োগ করার এবং পরামর্শদাতা প্রতিনিধি অথবা ম্যানেজিং ডাইরেকটরের উপদেষ্টা পাঠানোর অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। ভারতীয় আইনের অনুমোদন সাপেক্ষে এই অধিকার নতুন কর্পোরেশনের নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। যাই হোক, এই ধরণের প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যাপারে বিদেশী কোম্পানির অধিকার যাতে সুনিশ্চিত হয় সে বিষয়ে ভারতীয় কোম্পানিকে নিশ্চয়তা দিতে হবে।"

কোন্ কোন্ সামগ্রী উৎপাদন করা যাবে সে বিষয়েও ট্রান্সন্যাশনাল সহযোগী ভারতীয় উদ্যোগের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে। চুক্তিতে

দেখা যাচ্ছে, যে যে সামগ্রী উৎপাদনের অনুমতি ট্রান্সন্যাশনাল দিয়েছে ভারতীয় কোম্পানী তার বাইরে কোনো কিছু নির্মাণ করতে পারে না। ঘরোয়া বাজারে বিক্রয়ের ব্যাপারেও নানা বিধিনিষেধ রয়েছে—রপ্তানির বেলায় তো কথাই নেই। চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় সংস্থাকে তাদের উৎপাদিত সামগ্রী আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের নির্দেশ অনুসারে বিক্রী করতে হবে। এর বাইরে বিক্রী করলে ভারতীয় কোম্পানীকে তার জন্য বাড়তি রয়্যালটি দিতে হবে এবং ট্রান্সন্যাশনালের অন্যান্য দাবীও মেটাতে হবে।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সহযোগী ভারতীয় কোম্পানীর ক্ষেত্রে রপ্তানি বলতে গেলে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। অথচ সহযোগী কোম্পানি উৎপাদন করতে সক্ষম এমন সব সামগ্রীও আমদানী করার অধিকার আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের রয়েছে। সহযোগিতামূলক চুক্তিতে এই জাতীয় ধারা অনেক রয়েছে।

টার্ন-কি প্রকল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সম্পূর্ণ প্রকল্প আমদানী ও গ্রহণ করতে ভারতকে বাধ্য করেছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন। সেই সব প্রকল্পগুলো আবার বেশির ভাগই পুরোনো, মেরামত করে চালু করা হয়েছে। এই টার্ন-কি চুক্তির ফলেও ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা বিকাশের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।

কোনো ক্ষেত্রেই ভারতীয় পক্ষ নক্শা-প্রক্রিয়ার সংগে যুক্ত নয়। নক্শা, স্পেসিফিকেশন এবং অন্যান্য সবকিছুই ট্রান্সন্যাশনাল সরবরাহ করে থাকে। সেগুলোও আবার ভারতীয় পরিবেশে বেখাপ্পা। মান্ধাতার আমলের কৃৎকৌশলও যে কত আমদানী করা হয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। সংগত কারণেই CSIR-এর মুখপাত্র বারংবার অভিযোগ করে থাকেন যে, সহযোগিতার মাধ্যমে আমদানী করা প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতীয় পরিবেশে বেমানান, সেকেলে এবং দেশী প্রযুক্তি-বিদ্যার চেয়ে নিম্নমানের।

কেবল প্রযুক্তিবিদ্যা নয়, অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কারিগরী সহযোগী যেখানে প্রকল্প ও যন্ত্রপাতির সরবরাহকারী সেখানেও তার সরবরাহ করা প্রকল্প ও যন্ত্রপাতি সেকেলে এবং অনুপযুক্ত। আর বহু ক্ষেত্রে, যে-সব যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ দেশের বাজারেই পাওয়া যায় সেগুলোও বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে। এ-ব্যাপারে ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন বারংবার অভিযোগ জানিয়েছে।

এমন সব সহযোগিতা চুক্তিও রয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, কারিগরী বিশেষজ্ঞ হিসেবে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো যাঁদের ভারতে পাঠাচ্ছে তাঁদের কারিগরী দক্ষতা ও যোগ্যতা সংশয়াতীত নয়।

ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের ট্রান্সন্যাশনাল কি চোখে দেখে? অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে একটির উল্লেখই এ-ব্যাপারে যথেষ্ট হবে। এই বিশেষ চুক্তিতে (তার (Cable) তৈরি) সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "ওয়্যার ড্রয়িং, থার্মো-প্লাস্টিক প্ল্যান্ট ঘুরে দেখার পুরোপুরি স্বাধীনতা ভারতীয় কোম্পানির প্রযুক্তিবিদদের থাকবে...কোনো মালমশলা ব্যবহার করার অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার অধিকার থাকবে না।" আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি থাকলে বিকল্প আমদানীর চিন্তা কাজে পরিণত করার আশা সুদূর-পরাহত। ট্রান্সন্যাশনাল একনাগাড়ে আমদানী করার তাগাদা দিয়েই যাবে। যে-সব ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহৃত সে-সব ক্ষেত্রে উৎপাদিত সামগ্রীকে চূড়ান্ত পরীক্ষাপর্ব পার হতে হয়। পরীক্ষা চলাকালে স্থানীয় সরবরাহকারী অথবা তাদের প্রতিনিধিদের পরীক্ষা কার্য দেখতে দেওয়া হয় না। অন্যদিকে আমদানী করা সামগ্রীর এ-ধরণের কোনো পরীক্ষাই হয় না। (দ্র. কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ান: "ইমপোর্ট অব ক্যাপিটাল অ্যান্ড টেকনোলজি)

অন্যান্য উৎস থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা পাওয়া গেলেও ভারতকে তা পাবার অধিকার ট্রান্সন্যাশনাল সহযোগী দেয় না। আবার, দেশে প্রাপ্তব্য অতি সরল প্রযুক্তিবিদ্যাও ভারত সরকার বিদেশ থেকে আমদানী করতে দেয়। অনেক সময় সরকারের অনুমোদন ছাড়াই ট্রান্সন্যাশনাল তাদের অন্যান্য সংস্থার জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানী করে থাকে। সরকার আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন—এমন অভিযোগ রয়েছে। বলা হয়েছে, "সরকারের সাধারণ প্রবণতা বিদেশী সহযোগীর প্রতি আনুকূল্য দেখানো এবং স্বদেশী প্রযুক্তিবিদ্যাকে যথাযোগ্য উৎসাহ না দেওয়া।" সরকারী প্রশাসন যন্ত্র নিজেই সরকারের নীতিনিয়ম লঙ্ঘন করছে এমন নজির ভূরি ভূরি রয়েছে।

ব্যাপক অনুসন্ধান করে কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ন দেখিয়েছেন যে "সহ-যোগিতার এই বাড়বৃদ্ধির ফলে দায় শোধে বৈদেশিক লেনদেন-এর বোঝা সরাসরি বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ সহযোগিতার শর্ত বিরক্তিকর এবং সহযোগিতা চুক্তির অভিমুখীনতা আমদানী-সৃষ্টিকারী এবং রপ্তানী-নিরুৎসাহকারী। এটা স্বদেশী গবেষণা ও বিকাশে স্থানীয় উদ্যোগের পক্ষেও বাধাস্বরূপ।" এর ফলে যে-সব ক্ষেত্রে জাতীয় গবেষণাগারগুলোর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সুব্রাহ্মনিয়ান তারও একটি তালিকা দিয়েছেন, যথা: চশমার কাচ, চীনেমাটির বাসন, গ্যালভানাইজড ইস্পাত, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন, স্কুটার স্পার্ক প্লাগ, হেভী ডিউটি প্ল্যানিং মেশিন, ভার্টিক্যাল টারেট লেদস্‌ ইত্যাদি।

## কয়েকটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেন ট্রেড-এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা ১৯৮০ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে ট্রান্সন্যাশনাল ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম এবং তাদের ভারতীয় অংশীদারদের ভূমিকা বিষয়ে একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। ৪৫টি ট্রান্সন্যাশনাল সংস্থা নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল; এদের মধ্যে পাঁচটি সংস্থা FERA-র অনুবিধি অনুযায়ী তাদের ইকুইটি ৪০ শতাংশের নীচে নামিয়ে এনেছে। সমীক্ষার আওতায় ভারতীয় কোম্পানি ছিল ৩০টি। মোট ৭৫টি সংস্থার কাছে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল, উত্তর দিয়েছে ৬০টি সংস্থা।

সমীক্ষার কালসীমা ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত; দেখা গেছে এই সময়ের মধ্যে ট্রান্সন্যাশনাল ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থার মোট বিক্রি বেড়েছে ১৮ শতাংশ আর ভারতীয় সংস্থার বেড়েছে ৪৯ শতাংশ।

সমীক্ষার কালপর্বে মোট বিক্রিত উৎপাদিত সামগ্রীর রপ্তানীর হার ট্রান্সন্যাশনালের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২.৪২, ৫.৪২, ৭.৯৪ এবং ৪.৮৭ এবং ভারতীয় সংস্থার ক্ষেত্রে ৯.০৬, ১৩.০০, ৭.৫৯ এবং ১৯.৯৪।

ট্রান্সন্যাশনাল এবং ভারতীয় সংস্থার রপ্তানীর অনুপাত এইরকম :

| | |
|---|---|
| ১৯৭৩-৭৪ | ১ : ৩ |
| ১৯৭৪-৭৫ | ১ : ২ |
| ১৯৭৫-৭৬ | ১ : ২ |
| ১৯৭৬-৭৭ | ১ : ৪ |

আমদানীর ক্ষেত্রেও ভারতীয় সংস্থাগুলো ভালো ফল দেখিয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে যেখানে ট্রান্সন্যাশনালের আমদানীর 'গড়' (mean) ৪, সেখানে ভারতীয় সংস্থার আমদানীর 'গড়' (mean) ৭; ১৯৭৪-৭৫ সালে এই 'গড়' ছিল যথাক্রমে ৯ এবং ৮; ১৯৭৫-৭৬ সালে ১১ এবং ৪; আর ১৯৭৬-৭৭ সালে ৮ এবং ৮।

ট্রান্সন্যাশনাল ও ভারতীয় সংস্থার আমদানীর অনুপাত নিম্নরূপ :

| | |
|---|---|
| ১৯৭৩-৭৪ | ১ : ২ |
| ১৯৭৪-৭৫ | ১ : ১ |
| ১৯৭৫-৭৬ | ৩ : ১ |
| ১৯৭৬-৭৭ | ১ : ১ |

উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রেও ট্রান্সন্যাশনাল সংস্থা ভারতীয় সংস্থার চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। ট্রান্সন্যাশনাল সংস্থা এবং ভারতীয় সংস্থার মোট বিক্রয়মূল্যের অনুপাত ঃ

| | |
|---|---|
| ১৯৭৩-৭৪ | ১ ঃ ১ |
| ১৯৭৪-৭৫ | ১ ঃ ২ |
| ১৯৭৫-৭৬ | ১ ঃ ১ |
| ১৯৭৬-৭৭ | ১ ঃ ১ |

এম. সি. কাপুর এবং রাজেন সাকসেনা—এই দু'জন সমীক্ষক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, "বলা যেতে পারে, ট্রান্সন্যাশনাল সংস্থা আমন্ত্রাতা দেশের রপ্তানী বাজার বাড়ায় না...ট্রান্সন্যাশনাল সংস্থার মূলে অভিমুখীনতা ভারতীয় সংস্থার থেকে আলাদা। ট্রান্সন্যাশনালের ভারতের আসার উদ্দেশ্য হলো সস্তা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের সুযোগ নেওয়া এবং ভারতের বিশাল বাজারকে কাজে লাগানো, আর জাতীয় সংস্থাগুলো তাদের লাভের পরিমাণ সর্বোচ্চ করার প্রচেষ্টায় সীমানা অতিক্রম করছে এবং তা করতে গিয়ে দেশের রপ্তানী বাজার বাড়িয়ে চলেছে।"

তাঁরা কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস, ঐসব ব্যবস্থা যথাযথভাবে রূপায়িত হলে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো সম্ভব হবে। কাপুর এবং সাকসেনা বলেছেন, "এইসব ব্যবস্থা রূপায়িত হলে দেশ, যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে পারবে, এখন যে বৈদেশিক মুদ্রা ডিভিডেন্ড, টেকনিক্যাল ফীজ এবং হেড অফিসের ব্যয়বাবদ প্রকাশ্যে অথবা আমদানীর জন্য আসল দামের চেয়ে বেশি দাম দেখিয়ে অথবা রপ্তানীর হিসেবে কারচুপি করে গোপনে পাচার হয়ে যাচ্ছে।"

## ভারতে মনোপলি

কে. কে. সুব্রাহ্মনিয়ান এ-ও দেখিয়েছেন যে, দুটি পরিকল্পনাকালে (দ্বিতীয় এবং তৃতীয়) পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বৈদেশিক লগ্নীর দরুণ দেশ থেকে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে গেছে যথাক্রমে ১৬৫ কোটি টাকা এবং ২৩৪ কোটি টাকা। দেশে আগত পুঁজির পরিমাণ ছিল ১০৯ কোটি এবং ১৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই সময়সীমার মধ্যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সরাসরি মোট দান নঞর্থক ; দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৫৫ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৭৬ কোটি টাকা কম। রয়্যালটি এবং অন্যান্য ফীজ যদি এই

হিসেবের মধ্যে ধরি তাহলে নঞর্থক দানের পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। এছাড়া সার্ভিসিং-এর অত্যন্ত গুরুতর বোঝা তো আছেই ; ওই দুই পরিকল্পনার কালপর্বে এই বোঝার হার ছিল যথাক্রমে ৫.৪ এবং ৬.৬ শতাংশ। এ থেকে বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না যে, ভারতের ট্রান্সন্যাশনাল লগ্নী যত বাড়বে এই সব সমস্যা ততই আরো গভীরতর হবে। তদুপরি ট্রান্সন্যাশনালের সঙ্গে যদৃচ্ছ সহযোগিতা, আপন অধিকারে দেশের শিল্পবিকাশের পথে প্রতিবন্ধক। এই ধরণের সহযোগিতার ফলে রপ্তানী বাবদ দেশের আয়ও যে অকিঞ্চিৎকর, প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যে তার প্রমাণ মিলবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতের ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো সংরক্ষিত ঘরোয়া বাজারের সুফল ভোগ করছে, রপ্তানীর উপর নিজেদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখছে, সহযোগী কোম্পানিগুলোতে উৎপাদিত সামগ্রীতে আমদানীকৃত উপাদানের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে, দেশের সম্পদ পাচার করছে এবং ভারতের নিজস্ব শিল্পবিকাশের সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করছে।

এছাড়াও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ভারতের অর্থনীতির আরো একটি অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতিসাধন করছে। 'মনোপলিজ এন্কোয়্যারি কমিশন অব দ গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ার মুখ্য সাহায্যকারী হাতিয়ার হলো ট্রান্সন্যাশনাল সহযোগিতা। এইসব সহযোগী ট্রান্সন্যাশনাল শিল্প-কাঠামোকে সামগ্রী-ভিত্তিক কেন্দ্রীভবন ( Product-wise ) এবং দেশ-ভিত্তিক ( Country-wise ) কেন্দ্রীভবন—এই উভয় দিকেই পরিচালিত করতে সাহায্য করছে। ১১৭০টি সামগ্রীর মধ্যে ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা গেছে। অতি বেশিমাত্রায় কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা গেছে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে। যে সব সামগ্রীর ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশনাল সহযোগিতার মাত্রা খুব বেশি সে-সব ক্ষেত্রে একচেটিয়া কেন্দ্রীভবনের মাত্রাও খুব বেশি।

ভারতের প্রধান ১০০টি কোম্পানির মধ্যে প্রায় পঁচাত্তরটি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সহযোগী। এবং ট্রান্সন্যাশনালের অধঃস্তন সংস্থাগুলোর আধিপত্য তাদের কর্মক্ষেত্রের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে। আবার, ভারতের প্রধান ১০০টি কোম্পানির মধ্যে ট্রান্সন্যাশনালের অধঃস্তন সংস্থাও রয়েছে ২৮টি। এ-থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, ভারতের ঘরোয়া বাজারে ট্রান্সন্যাশনালের আধিপত্য কতখানি ব্যাপক, যদিও এ-দেশে ট্রান্সন্যাশনালের

মোট বিনিয়োগ, দেশের মোট সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগের মাত্র ৮ শতাংশের মতো। (দ্র. ভি. গৌরীশঙ্কর ঃ টেমিং দ জায়েন্টস্)

পণ্যের বাজারে একচেটিয়া অবস্থান রয়েছে এরকম ৭৫টি বড় কোম্পানি চিহ্নিত করেছে 'মনোপলিজ এনকোয়্যারি কমিশন'। আরো ১৬টি কোম্পানিকে আলাদা করে বেছে নিয়েছে যাদের দেশব্যাপী কেন্দ্রীভবন রয়েছে। এই ১৬টি কোম্পানির দেশব্যাপী বহুমুখী কর্মধারা রয়েছে, যা মুখ্যত সম্ভব হয়েছে ট্রান্সন্যাশনালের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তির ফলে। 'মনোপলিজ এনকোয়্যারি কমিশন' এ-ও লক্ষ্য করেছে যে, ৭৫টি বড় কোম্পানির মধ্যে, ট্রান্সন্যাশনাল নিয়ন্ত্রিত ১৪টি অত্যন্ত বড় গোষ্ঠী রয়েছে এবং এই ১৪টি একত্রে দেশব্যাপী কেন্দ্রীভবন সম্পন্ন ৭৫টি কোম্পানির মোট সম্পদের ৪৫ শতাংশ অধিকার করে রয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ভারতে দেশব্যাপী কেন্দ্রীভবনের প্রায় অর্ধেক ট্রান্সন্যাশনাল নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত।

১৯৬৮-১৯৭৭ সালের মধ্যে ভারত সরকার প্রায় ৩,৫০০টি বৈদেশিক সহযোগিতা অনুমোদন করেছেন। একটি হিসেব অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ সালে ৭৫০টি ভারতীয় সংস্থা মোট ২৫৩৩ কোটি টাকার সম্পদ সহ বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। (দ্র. পেট্রিয়ট, নয়াদিল্লি)

ভারতে বিদেশী মনোপলিগুলো কিভাবে কাজ করছে তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত হলো 'ডায়মন্ড ট্রেডিং কোম্পানি।' ভারতের হীরের ব্যবসায় পুরোপুরি এই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনটির কব্জায়। বিশ্বের নানা দেশে এর অধস্তন সংস্থা রয়েছে। বলতে গেলে হীরের একচেটিয়া ব্যবসায় এরই হাতে। বিশ্বের নানা জায়গায় এর হীরের খনিও রয়েছে। (দ্র. ভি. গৌরীশঙ্কর ঃ 'টেমিং দ জায়েন্টস")

লোকসভার (ষষ্ঠ) পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি তার প্রতিবেদনে বলেছে, "বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের দেওয়া সাক্ষ্য তথা লিখিত বিবৃতি থেকে কমিটির এই ধারণা হয়েছে যে আ-কাটা হীরে সরবরাহের ব্যাপারে ডায়মন্ড ট্রেডিং কোম্পানির অবস্থান প্রায় একচেটিয়া এবং মনোনয়ন অথবা মূল্য নির্ধারণে ডিটিসি-র উপরে সরকারের কিছু বলার নেই। সাক্ষ্য থেকে এ-ও জানা গেছে যে সরবরাহের বিকল্প উৎস খোঁজায় সরকারি প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

"অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, আমদানীর প্রবাহ বা তাদের দাম নিয়ন্ত্রণের

ব্যাপারে সরকার নিরুপায় এবং ডিটিসি-র দয়ার উপরেই নির্ভরশীল। এই অবস্থায় ডিটিসি যে কেন সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য ছ'মাস অন্তর ভারতে প্রতিনিধি পাঠায় এবং সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার নাম করে সেন্ট্রাল সেলিং অর্গানাইজেশন (ডিটিসি অনুমোদিত) কেন যে ভারতে একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল পুষছেন তা কমিটির কাছে পরিষ্কার নয়। স্পষ্টতই ডিটিসি সরকারের কাছে কিছু সুবিধা প্রত্যাশী। মনে হয়, ছোট ছোট হীরে কাটা এবং পালিশ করার জন্য শস্তায় ভারতে প্রাপ্তব্য দক্ষতা ও সুযোগসুবিধে পেতে ডিটিসি উদ্‌গ্রীব, কারণ, জানা যাচ্ছে, এই সুযোগসুবিধা অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়।

"কমিটি জানে যে, লাইসেন্স অনুমোদন করার এবং রপ্তানী নীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ পাইয়ে দেবার ক্ষমতা সরকারের আছে। কমিটি এ-ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে চায় যে, এইসব ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা যেন কোম্পানি এদেশে তার বাজার সম্প্রসারিত করার এবং তার উপর আমাদের নির্ভরতা বৃদ্ধির সুযোগ না পায়।"

অপর দৃষ্টান্ত 'ইন্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানি'। এই কোম্পানিটি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি অনুমোদিত। বিএটিসি বিশ্বের বৃহত্তম পঞ্চাশটি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের অন্যতম (FORTUNE তালিকা অনুযায়ী)। ভারতের সিগারেট উৎপাদনের ৬০ শতাংশেরও বেশি আইটিসি নিয়ন্ত্রণ করে। বিএটিসি অনুমোদিত আর একটি কোম্পানি হলো ইন্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ। ভারতের মধ্যে তামাকের কাঁচা মাল কেনার ব্যাপারটা এই কোম্পানির মুঠোয়।

এইসব কোম্পানি কলকাঠি নাড়ার ফলেই ভারতে আমদানী করা তামাকের ইউনিট ভ্যালু, ১৯৭০-৭১ সালের প্রতি কেজি ১.৪৪ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে দাঁড়িয়েছিল প্রতি কেজি ২১.৭৫ টাকায় কিন্তু ভারত থেকে রপ্তানী করা তামাকের ইউনিট ভ্যালু প্রতি কেজি ৬.৬১ থেকে বেড়ে হয়েছিল মাত্র প্রতি কেজি ১০.৭২ টাকা।

লোকসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি লক্ষ্য করেছিল যে, ভারতের তামাক শিল্পের বৈদেশিক ক্ষেত্র দেশের মোট সিগারেট উৎপাদনের ৭৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করেছে, নিজেদের উৎপাদিত কোনো কোনো ব্রান্ডের সিগারেটের দাম কমিয়ে ফেলার মতো সংরক্ষিত বাণিজ্যিক কার্যকলাপের দ্বারা ভারতীয় উৎপাদকদের ক্ষতিসাধন করছে।

'ইণ্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস'-এর পুরো কাজকারবারটাই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের যদৃচ্ছ লুণ্ঠন ছাড়া আর কিছু নয়। লোকসভার 'পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ

"চাওয়া-মাত্র পাওয়া যাচ্ছে এরকম যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপারে সরকারি বিভাগের তৎপরতার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে কিন্তু তারা বেশি প্রলুব্ধ হন ভারতে কর্মরত বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির রেডি-মেড লোহালক্কড় বা অন্যান্য যন্ত্রপাতির প্যাকেটের প্রতি। এই ব্যবস্থাটা আমাদের আলাদা আলাদা চাহিদা মেটানোর উপযোগী নয়, বরং প্রস্তুতকারকের কাছে চাইবা-মাত্রই যা পাওয়া যাচ্ছে তা, বিশেষত আইবিএম-এর অত্যাধুনিক এবং ভয়ানকভাবে আগ্রাসী সেলস্ম্যানশীপের দৌলতে এদেশের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

ভারত সরকার গঠিত 'ইণ্টার-মিনিস্টেরিয়াল ওয়ার্কিং গ্রুপ'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

"এই সব ভাড়া-করা মেশিনের ( আইবিএম-এর ) আর একটি মজার বৈশিষ্ট্য হলো, অধিকাংশ মেশিনই অনাত্র, অন্য কোনো উন্নত দেশে ব্যবহৃত—মেশিনগুলোর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত। ওইসব দেশে মেশিনগুলো যখন সেকেলে হয়ে যায়,…তখন সেগুলো ভারতে আমদানী করা হয়…আকাশ-ছোঁয়া ভাড়া দেওয়া হয়। এইভাবে উন্নত দেশের বাতিল মেশিন ভারতের মতো দেশে ভাড়া খাটিয়ে আই বি এম দেদার পয়সা লুটছে।"

ভারতে তার মেশিনগুলোর মূল্য ( value ) কত আই বি এম এখনো তা বলে না। শুল্ক-দপ্তরের চেয়ারম্যান লোকসভার পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটিকে বলেছেন, "এমনকি এই অবস্থাতেও, এইসব মেশিনের প্রকৃত মূল্য জানাতে আইবিএম-কে অনুরোধ করা হয়েছে, খুবই সম্ভব তারা হয়তো সত্যি কথা বলবে না কারণ ঠিক ঠিক তথ্য জানালে তাদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে।"

পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটি এ-ও লক্ষ্য করেছে,

"কমিটি মনে করে কম্পিউটার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ভাড়া করা পুরোপুরি অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভাড়া করার শর্তাবলী নিতান্ত একপেশে। বাস্তবে, মনে হয় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের স্বার্থেই এটা করা হয়েছে। শর্তের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হয়নি এবং সরকারের স্বার্থই তাতে ক্ষুন্ন হয়েছে। এ-এক নজীরবিহীন ব্যবসায়িক লেনদেন যেখানে সরবরাহকারী সব রকম হুকুম দেয় এবং সরকার বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেয়।"

লোকসভার পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটির অনুসন্ধানে বলা হয়েছে,

"ভারতে দক্ষ শ্রমশক্তি অফুরন্ত, এবং আইবিএম যদি এদেশের প্রযুক্তি-বিদ্যাগত অথবা শিল্পের বিকাশে সত্যিই সহযোগিতা করতে চায় তাহলে তাদের আরো অর্থবহ নির্মাণ-কর্মসূচী থাকা দরকার। রপ্তানীর ব্যাপারে অর্থময় অংশ গ্রহণের জন্য তারা কোনো উদ্যোগই নেয়নি, না দিয়েছে দেশীয় সংস্থাকে রপ্তানীর সাব-কনট্রাক্ট, না দিয়েছে তাদের প্রযুক্তিবিদ্যাগত সাহায্য। যে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বারা আত্মনির্ভরতা অর্জিত হতে পারে এবং প্রযুক্তিবিদ্যা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক মানে উন্নীত হতে পারে, সে জাতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য আইবিএম-এর মতো কোনো সংস্থার কাছ থেকে সহযোগিতা আশাই করা যায় না।"

## আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কার্যকলাপের রাজনৈতিক প্রভাব

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে নির্দিষ্ট কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

১৯৭৫ সালের কোনো এক সময় রাজ্য সভার সদস্য ভি. পি. ডাট সভায় একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন,

"...বিদেশে ব্যবসারত মার্কিন সংস্থার কার্যকলাপ সম্পর্কে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত কয়েকটি উদ্বেগসৃষ্টিকারী প্রবন্ধ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশ সম্পর্কে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। ভারতে তারা কিভাবে কাজ করছে সে সম্পর্কে একটি দায়িত্বশীল পত্রিকা যা লিখেছে আমি তা প'ড়ে শোনাতে চাই। 'চল্লিশটি আমেরিকান কোম্পানি—অনেকের বিশ্বাস তাদের মধ্যে অনেকগুলো যোগাযোগরক্ষাকারী দপ্তর যারা সম্ভবত ভারতীয় উচ্চপদস্থ আমলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে—রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থ দান করে থাকে, সরকারে এবং সংসদে নিজেদের লোক রাখার জন্য টাকা খরচ করে এবং অন্যান্য প্ররোচনার মধ্যে রয়েছে মদ সরবরাহ, বিলাসবহুল হোটেলে আমোদপ্রমোদ এবং আমলারা বিদেশে বেড়াতে গেলে ভারতের বাইরে তাদের আদর-আপ্যায়ন।'—এটি একটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্র এবং স্পষ্টতই এসব খবর কোম্পানিগুলো নিজেরাই যুগিয়েছে, কারণ, অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামধাম নাড়ীনক্ষত্র পর্যন্ত ছাপা হয়েছে।...এই লেখাটিকে ১১ মে তারিখে 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এ প্রকাশিত আর একটি প্রবন্ধের সঙ্গে একযোগে পড়তে হবে, সে প্রবন্ধের বিষয় হলো সিআইএ

কর্তৃক বিদেশস্থ মার্কিন সংস্থাকে কাজে লাগানো। ব্যবসায়ে কার কোন্ স্থান—তালিকাটি তা নিয়ে তৈরি এবং এর মধ্যে রয়েছে পেট্রোলিয়াম, রবার শিল্প, ভ্রমণ, বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা, জনসংযোগ এবং আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্র। আমার মনে হয় ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের উচিত এ-বিষয়ে তদন্ত করা এবং বিদেশী কোম্পানিগুলো থেকে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল টাকা পাচ্ছে, সংসদ এবং সরকারী দপ্তরের কোন্ কোন্ 'মহল'-এর কথা তারা উল্লেখ করেছে, আমলারা এবং বিদেশে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা কাদের আতিথেয়তা লাভ করছেন তা খুঁজে বের করা। সংসদে রাজনৈতিক অর্থদান এবং 'লবি'র যে কথা তারা উল্লেখ করেছে সে বিষয়েও আমি উদ্বিগ্ন।"

১৯৭৩ সালের বৈদেশিক দান (বিধি) বিল সম্পর্কে সংসদীয় যৌথ কমিটির প্রতিবেদনেও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের উল্লেখ রয়েছে। কমিটির সদস্য কে. চন্দ্রাপ্পান এবং জে. রাই বলেছেন,

"সিআইএ-র ঘনিষ্ঠতম মিত্র হলো আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলি, যারা নানা উপায়ে, যে দেশে বসে কাজ করছে সে দেশের স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং অর্থনীতি নষ্ট করে। বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং তৃতীয় দুনিয়ার কাঁচা মাল, খনিজসম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ হাতের মুঠোয় থাকায় তারা গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিকে বিপুল আর্থিক সমর্থন যুগিয়ে অবিরত নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে চায় এবং রাষ্ট্রের মধ্যেই রাষ্ট্র হয়ে ওঠে। বাণিজ্য এবং ব্যবসার নামে তারা সমাজের প্রতি স্তরে নাক গলাবার চেষ্টা করে এবং আর্থিক সহযোগিতা সহ সম্ভাব্য সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন ক'রে যে-দেশে বসে কাজ করছে সে দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ফাঁস থেকে যারা নিজেদের মুক্ত করতে চায় সেইসব গণতান্ত্রিক সরকার এবং স্বাধীনতার পক্ষে একক সবচেয়ে বড় বিপদ হলো এরাই।"

গুড ইয়ার টায়ার (ভারত)-এর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগের যে শুনানী কলাম্বিয়ার (আমেরিকা) আদালতে হয়েছিল, ভি. গৌরীশঙ্কর তাঁর "টেমিং দ জায়েন্টস্" গ্রন্থে তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। "গুড ইয়ার টায়ার (ইন্ডিয়া লিঃ)" যে বিবৃত দাখিল করেছিল তাতে দেখা যাচ্ছে,

১। কোম্পানির ভারতীয় অধস্তন সংস্থার হাতে যে তহবিল রয়েছে, কোম্পানির খাতায় তা নথিভুক্ত নেই ;

২। এই তহবিলের বেশির ভাগই এসেছে কাঁচা মাল সরবরাহকারীর বাটা

(Rebate) থেকে, অর্থাৎ সরকার-নির্ধারিত সর্বনিম্ন দাম এবং নিম্নতর বাজার দরের পার্থক্য ;

৩। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫-এই পাঁচ বছরের মধ্যে তহবিলের মোট পরিমাণ ছিল ৫০০০০০ থেকে ৮০০০০০ ডলারের মধ্যে। কোনো বিশেষ সময়ে এই পরিমাণ কত তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় ;

৪। তহবিল নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে রয়েছে, যথাযথভাবে কাঁচা মালের সরবরাহ পাবার জন্য বিদেশী সরকারের ছোট ছোট কর্মচারীদের টাকা দেওয়া, আত্মরক্ষার কাজে পুলিসকে ব্যবহার করা এবং সরকারী ব্যবসা পাওয়া···শ্রমিক সংক্রান্ত সমস্যা মেটানোর জন্য লেবার অফিসারদের টাকা দেওয়া, রাজনৈতিক দান এবং কর্মচারীদের নানা ধরণের ব্যয় মেটানো।"

এজাহার থেকে প্রকাশ পেয়েছে এক-বছরের মধ্যেই (১৯৭৪-১৯৭৫) একটি রাজনৈতিক দলকে ৫১০০০ ডলার দেওয়া হয়েছে।

আই. সি. আই-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ১৯৭৬ সালে মরিস করিনা 'দ স্টেটসম্যান'-এ লিখেছেন, "কোথায় এবং কাকে অর্থ দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে আই. সি. আই যখন কিছু বলতে রাজী হচ্ছে না তখন এমন অনুমান করতে কোনো বাধা নেই যে বেশ কিছু পরিমাণ বেআইনী অর্থ ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্য দেওয়া হচ্ছে। এই বেআইনী অর্থের পরিমাণ বছরে ৩০০০০০ ডলার।"

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের এই ধরণের কার্যকলাপ ভারত সহ উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপদস্বরূপ। জাতি সংঘ গঠিত একদল প্রখ্যাত ব্যক্তির গোষ্ঠীও তাঁদের প্রতিবেদনে মাল্টিন্যাশনালের এই নাশকতামূলক কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন।

গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধানদের চতুর্থ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছিল,

"রাষ্ট্র অথবা সরকারের প্রধানরা বিশ্ব জনমতের সমক্ষে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের গ্রহণের অযোগ্য কার্যকলাপের নিন্দা করছে, যারা উন্নয়নশীল দেশের সার্বভৌমত্বে নাক গলায় এবং হস্তক্ষেপ-না-করার আদর্শ ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লঙ্ঘন করে—যা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রগতির বুনিয়াদী পূর্বশর্ত।" বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তার উল্লেখ করে ভি. গৌরী শংকর লিখেছেন,

"নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো পরোক্ষ-ভাবে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক যন্ত্রকে প্রভাবিত করার জন্য যে কার্যকলাপ

চালিয়ে থাকে সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ যথাযথভাবে এর মধ্যে প্রতিফলিত। এই সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে যে, সকল জাতির রাজনৈতিক আইনগত বিবেকের প্রকাশক সাধারণ পরিষদের (জাতি সংঘের) প্রস্তাবগুলি সুপারিশের চেয়েও বেশি।"

অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কার্যকলাপ অর্থনীতির পক্ষে অনুকূল নয়; তাদের কার্যকলাপ দেশের রাজনৈতিক স্বার্থেরও পরিপোষক নয়। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কার্যকলাপ যে প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপদস্বরূপ তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

## ভেদাভেদ সৃষ্টি করে শাসন কর

পঁুজিবাদী দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর ক্রিয়াকলাপ সমীক্ষা করে বহু গ্রন্থকার তাদের ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ প্রতিহত করার জন্য নানা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশগুলো প্রধানত এই ইঙ্গিত বহন করে যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন এবং তাদের অপকার্যের হাত থেকে পঁুজিবাদী দুনিয়ার উদ্ধার নেই। এটা একরকম ধরেই নেওয়া হয়েছে যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন স্থায়ীভাবে গেড়ে বসেছে এবং দিনের পর দিন এদের ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এই সব অনুমান প্রকাশের সময় বিভিন্ন সংগঠন এবং গ্রন্থকার আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটা এড়িয়ে যান। সংকট, অন্তর্বিরোধ, সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের তাড়নায় মানুষ ও সম্পদের সর্বাধিক শোষণ—এসব হচ্ছে পঁুজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এই সবেরই প্রকাশ আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর মধ্যেও প্রকট।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের উপর বিধি নিষেধ আরোপের অর্থ সর্বাধিক মুনাফার উপর বিধি নিষেধ আরোপ। তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন আর আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন থাকবে না এবং তার ক্ষতি করার ক্ষমতাও লোপ পাবে। শেষ পর্যন্ত তার অর্থ দাঁড়াবে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের উপর বিধি নিষেধ আরোপ। তখন এমন এক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র তার সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার ভোগ করবে। প্রত্যেক দেশের উৎপাদনী শক্তিগুলোর বাধা-বন্ধন ঘুচে যাবে এবং তার ফলটা দাঁড়াবে এই যে উৎপাদনের পঁুজিবাদী সম্পর্কের স্থান অধিকার করবে উন্নততর এবং উচ্চতর—সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এত বে-পরোয়া ভাবে যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে যে, যে সমস্ত সংগঠন এবং গ্রন্থকার চলতি উৎপাদন-সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখনই একমত নন, তারাও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে বদ্ধপরিকর। তার ফলে

সারা দুনিয়ায় সেই যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিরোধের চেতনা জেগে উঠেছে।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের অপকর্মের বিরুদ্ধে সর্বত্রই তীব্র সমালোচনা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যে সব দেশে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো ঘাঁটি গেড়েছে, সেই সব দেশের জাতীয় লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করতে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর শোচনীয় ব্যর্থতাই তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনার ভিত্তি। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থা যে সব সমীক্ষা চালিয়েছেন তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টের নাম নীচে দেওয়া হচ্ছে: ইউনাইটেড নেশানস্ ইকনমিক এন্ড সোসাল এফেয়ার্স: "আন্তর্দেশীয় কোম্পানী এক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি": আঙ্কট্যাড (UNCTAD): "ভারতে বৈদেশিক সহযোগিতা চুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা"; রাষ্ট্র সংঘ: "আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কাছ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কারিগরী কৃৎকৌশল সংগ্রহ"; আঙ্কট্যাড: "কারিগরী কৃৎকৌশল হস্তান্তরের আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ: ভারতের ঔষধ শিল্প"; রাষ্ট্র সংঘ: "প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব", প্রভৃতি।

এই সব সমীক্ষায় আন্তর্দেশীয় কোম্পানী ও তাদের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে কয়েকটি আচরণ বিধির সুপারিশ করা হয়েছে। ভারতে এই ব্যাপারে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার নাম ফেরা (FERA), বৈদেশিক চাঁদা বিষয়ক আইন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন নির্দেশনামা।

কয়েকটি দেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন কোন আইন নেই যা দ্বারা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। বিধি নিষেধ আরোপের উপযোগী কোন আইনই নেই। এমন কি O.E.C.D.-র আচরণ বিধি এবং E.E.C.-র সুপারিশ বাঞ্ছিত ফললাভে ব্যর্থ হয়েছে। এবিষয়ে রাষ্ট্র সংঘের প্রস্তাব ও সুপারিশ, আঙ্কট্যাডের বিভিন্ন সুপারিশ—সবই উপেক্ষিত হয়েছে।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে সুদৃঢ় আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ আরোপিত না হলে (সেটা রাষ্ট্র সংঘও আরোপ করতে পারে) আন্তর্দেশীয় কোম্পানী এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ সংযত করা যাবে না। সদিচ্ছা প্রণোদিত প্রস্তাব পাশ অথবা সুপারিশ প্রণয়নের দ্বারা উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নয়।

ভারতে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, মোটামুটি তারই অনুকরণে বিধি নিষেধ প্রণয়ন করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, ফেরা (FERA) এবং

বৈদেশিক চাঁদা আইনে (Foreign Contribution Act) যে সব সুনির্দিষ্ট ধারা আছে যার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ছাড়া আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন এদেশে কাজ কারবার করতে পাবে না। সেই ধারাগুলো হচ্ছে ঃ

১। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুনির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়া ভারতে কোন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে না এবং শিল্প স্থাপন করতে পারবে না ;

২। ভারতে কোন শাখা অফিস অথবা কারবারকেন্দ্র খুলতে পারবে না ;

৩। ভারতে কোন কোম্পানীর শেয়ার কিনতে পারবে না ;

৪। ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যে এবং শিল্পে রত কোন সংস্থা অথবা তার অংশ অধিগ্রহণ করতে পারবে না ;

৫। কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীকে ব্যবসা ও বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবে না ;

৬। কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীকে ভারতে কারিগরী অথবা ব্যবস্থাপনার উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারবে না ;

৭। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লাভের জন্য কোন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর ট্রেড মার্ক কেউ ব্যবহার করতে পারবে না ;

৮। কোন অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ, দখল, হস্তান্তর এবং বিক্রি করতে পারবে না ;

৯। কোন অর্থ ঋণ হিসাবে অথবা আমানত হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অনুমতি ছাড়া ভারতে কোন আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন কাজকারবার চালাতে পারে না। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি কঠোরভাবে ভারত সরকারের নীতি অনুসরণ করে, তাহলে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের লগ্নী ও ক্রিয়াকলাপ গভর্ণমেণ্ট পরিকল্পিত জাতীয় বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সরকারী নীতি কি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে ?

তবে গভর্ণমেণ্টের সর্তগুলো আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে সংযত রাখার পক্ষে কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু এটা সহজেই অনুমেয় যে কোন একটি রাষ্ট্র এককভাবে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে সংযত রাখতে পারে না। কারণ তাদের হাতে রয়েছে বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং তাদের

পেছনে থাকে তাদের পিতৃদেশের ষোলো আনা সমর্থন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোকে সংযত রাখার আঞ্চলিক প্রচেষ্টাও যে সফল হতে পারে না তা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। এই কোম্পানীগুলো যে বিপুল অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে, তার পরিমাণ বেশ কয়েকটি দেশের মোট জাতীয় পণ্যের মূল্যের চেয়ে বেশী।

একমাত্র রাষ্ট্র সংঘের মত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কিন্তু রাষ্ট্র সংঘের বিধি নিষেধও যে কার্যকর হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ অনেকেই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোকে এক ধরণের "প্রাইভেট রাষ্ট্র সংঘ" বলে বর্ণনা করে থাকেন। তাছাড়া রাষ্ট্র সংঘে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর পিতৃদেশের প্রভাব প্রতিপত্তিও কিছু কম নয়। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর পিতৃদেশ সব সময়ই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট এবং আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা দেখলেই তারা রে-রে করে ওঠে। বেবীফুড উৎপাদন ও বিক্রয়ের প্রশ্নে রিগ্যান সরকারের নেতিবাচক ভোট প্রদানই তার দৃষ্টান্ত। এই সব বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর ক্ষতিকর ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও এলাকাকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেই সব প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমাজ সচেতন মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলোকেও এই কাজে ব্রতী হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। কারণ শ্রমজীবী মানুষ উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সংগে সরাসরি জড়িত থাকেন। তাই তাঁরা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের অপকার্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় শক্তি হিসাবে কাজ করতে সক্ষম।

## ট্রেড ইউনিয়নের সমস্যা

কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের ট্রেড ইউনিয়নগুলোরও সমস্যা আছে। কোন দেশের গভর্ণমেন্টের মতই সেই দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় সংস্থা কিন্তু সে আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যে চিরাচরিত কোম্পানী থেকে পৃথক ধরণের সংগঠন, সেটা বুঝতেই তাদের যথেষ্ট সময় লেগেছে। তবে ইদানিং এটা সকলেই অনুধাবন করেছে যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার কাছে জাতীয় গভর্ণমেন্টগুলো একেবারেই অসহায়। তাদের সামলে রাখবার কোন ক্ষমতাই জাতীয় গভর্ণমেন্টের নেই।

এই অবস্থায় আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন। এবং সেই সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী হওয়া দরকার।

তথাকথিত আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলোর কাঠামো এবং তাদের নমনীয়তা এমনই যে তদ্দ্বারা তারা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃত্বের মূলেও আঘাত হানতে সক্ষম। সাধারণত একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কোম্পানীর সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে পারেন এবং আলোচনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের দিয়ে কারখানায় ধর্মঘট করিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আন্তর্দেশীয় কোম্পানীতে স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর স্থানীয় অধঃস্তন সংস্থার কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন মাত্র। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় অধঃস্তন সংস্থা হচ্ছে অনেকটা সাব-পোস্ট অফিসের মত স্রেফ ডাক বিলির অফিস মাত্র। আর যদি কোন অধঃস্তন সংস্থার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন, তাহলে আন্তর্দেশীয় কোম্পানী অন্যত্র সেই পণ্য উৎপাদন ক'রে ধর্মঘটী শ্রমিকদের অনায়াসেই শায়েস্তা করতে পারেন। আমেরিকায় একাধিক একচেটিয়া কারবারে এই ঘটনাই ঘটেছে। একের পর এক কারখানা বন্ধ করে দিয়ে ভিন দেশে সেই কারখানার পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে কারণ ভিন দেশে ট্রেড ইউনিয়ন দুর্বল। অর্থাৎ কোম্পানী চাবুক হাতে করে শ্রমিকদের সায়েস্তা করেছে।

খাশ আমেরিকায় গুড ইয়ার রবার কোম্পানী তার ভিন দেশে অবস্থিত অধঃস্তন সংস্থাগুলোয় প্রচুর মাল মজুত করে, অবশেষে আমেরিকায় ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। এই ভাবে তৈরী মাল মজুত হলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে কোম্পানী পাল্টা আঘাত হানবার জন্য তৈরী হয়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকরা তখন দারুণ অসুবিধায় পড়ে যায়।

অনেক সময়ই দেখা যায় যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর স্থানীয় ও জাতীয় ব্যবস্থাপনার ( management ) সঙ্গে আলোচনায় রত ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তাদের দাবী-দাওয়াগুলো একমাত্র কেন্দ্রীয় অফিসের কর্তারাই মীমাংসা করতে পারেন। সেখানে পৌঁছোনো স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া "মুনাফা হচ্ছে না" জাতীয় যুক্তি তো আছেই। আন্তঃকোম্পানী স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণ জাতীয় নানা অপকৌশলের সাহায্যে এরা হিসাবের খাতা ওলট-পালট করতে পারে। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো স্বল্প-বেতন ও স্বল্প-কর এলাকায় মুনাফা চালান দিয়ে কোন একটি দেশের খাতাপত্রে অনায়াসেই লাভের পরিবর্তে লোকসান

দেখাতে পারে। এই সব অপকৌশলের সাহায্যে ট্রেড ইউনিয়নের দরকষাকষির ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হয়।

যেখানে ধর্মঘট হয় অথবা কোম্পানীর কর্মকর্তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মঘটীরা তাদের দাবী দাওয়া আদায় করে নেয়, সে ক্ষেত্রে হুমকী দেওয়া হয় যে, তারা অন্যত্র গিয়ে কোম্পানী খুলবে। কানাডার ম্যাসি-ফাগুর্সন প্রকাশ্যেই কানাডীয় কর্মচারীদের হুমকী দিয়ে বলেছিল যে তারা কারবার অন্যত্র তুলে নিয়ে যাবে। কর্মচারীদের অপরাধ, তারা কোম্পানীর মার্কিন সংস্থার কর্মচারীদের বেতনের সমান বেতন দাবী করেছিল। বব এডওয়ার্ড বলেছেন যে ইচ্ছে করে বিভ্রান্তি সৃষ্ট করা হয়। আর ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রভাব বিস্তারের কোন সুযোগই নেই। কারণ হেড অফিস কারও সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেমন ধরুন জেনারেল মোটরসের মার্কিনী হেড অফিস স্থির করে যে পশ্চিম জার্মানীর ওপেল মোটর গাড়ী (জেনারেল মোটরসের অধঃস্তন সংস্থা) আমেরিকায় গাড়ী রপ্তানি করতে পারবে, কিন্তু অপর অধঃস্তন সংস্থা বৃটিশ ভক্সল আমেরিকায় গাড়ী রপ্তানি করতে পারবে না।

উপরন্তু বেতন ও ভাতা হয়ত নির্ধারিত হচ্ছে ডেট্রয়েট ও জেনেভায় কিন্তু সেগুলো রদবদলের ক্ষমতা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেই। যে সব এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন দুর্বল, বে-আইনী অথবা পুলিশী দমননীতির শিকার, সেই সব এলাকায় শ্রমিকদের বেতনের হারও কম। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো সেই সব এলাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা স্থানান্তরিত করে। রাসায়নিক, রবার, বয়ন ও ইলেকট্রনিক শিল্পের এই ধরনের স্থানান্তরের বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। শ্রমিকদের তরফ থেকে ট্রেড ইউনিয়নগুলো যখনই তাদের দাবী-দাওয়া উত্থাপন করে, তখনই তাদের ভয় দেখানো হয় যে, কারখানা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে অথবা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং নতুন কোন মূলধন লগ্নী করা হবে না। (বব এডওয়ার্ডস—"মাল্টিন্যাশানাল এন্ড ট্রেড ইউনিয়নস")

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো আর একটি সুবিধা ভোগ করে: সেটা হচ্ছে এই যে, তাদের কর্তৃপক্ষ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন স্বার্থের বিস্তারিত তথ্য সম্বন্ধে অবহিত। কোথায় কারখানাটা রাখা জরুরী এবং কোথায় না, তা তাঁরা ভালই জানেন। কোথায় কারখানা বাড়াতে হবে, কোথায় নতুন মূলধন লগ্নী করতে হবে, কোথায় কনসেসন দিতে হবে এবং কোথায় হবে না এবং কোথায় কারখানা বন্ধ থাকলেই ভাল—তাও তারা ভাল করেই

জানেন। সুতরাং আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যখন কোন জাতীয় অথবা স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসে, তখন দেখা যায় সদর দপ্তরের সমস্ত তথ্য হাতে নিয়ে বসে আছেন, তাঁদের স্থানীয় প্রতিনিধিরা সেই সব তথ্যের খবর রাখেন না। আর ট্রেড ইউনিয়ন শুধু স্থানীয় অধঃস্তন সংস্থার খবর রাখেন মাত্র, তার বাইরে আর কিছুই নয়।

( ক্রিস্টোফার টুগেনডহাট—দি মাল্টিন্যাশনালস )

সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে সব চেয়ে শক্তিশালী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নও আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কাঠামোর কাছাকাছি যেতে অক্ষম এবং আজকের দুনিয়ায় তাদের অভূতপূর্ব ক্ষমতা ও শক্তির বিরুদ্ধে একেবারে অসহায়। সেই কারণে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর একটি বিশ্বব্যাপী পরিপ্রেক্ষিত ও কর্মসূচী দরকার।

এই প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেই সম্ভবত আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন ( আই. এল. ও ) আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কয়েকটি সমীক্ষার ব্যবস্থা করে এবং আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়নের প্রস্তাব করে। সেই সব সমীক্ষার উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট হচ্ছে "Impact of Multinational Enterprises on Employment and Trading", "International Principles and Guidelines on Social Policy for Multinational Enterprises", "Multinationals in Western Europe : the International Relation Experience", "Wages and Working in Multinational Enterprises", প্রভৃতি।

কিন্তু রাষ্ট্র সংঘের এবং আংকট্যাডের ( UNCTAD ) সমীক্ষা রিপোর্টের মত আই-এল-ও-র রিপোর্টগুলোও প্রধানত পুঁথিগত তথ্য হিসাবেই থেকে গেছে। রিপোর্টে যে সব সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলো মেনে নেওয়ার কোন লক্ষণ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো দেখায় নি। তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সংস্থার এই সব রিপোর্ট সারা বিশ্বে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর অপকর্মের কাহিনী ফাঁস করে শ্রমজীবী মানুষের যথেষ্ট উপকার করেছে।

রেমন্ড ভার্নন তার "Sovereignty at Bay : The Multinational Spread of U. S. Business" গ্রন্থে বলেছেন কোন একটি স্থানীয় অর্থনীতিতে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের ক্রিয়াকলাপ সুরু হলে সেখানকার স্থানীয় কয়েকটি গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অন্য গোষ্ঠীগুলো পিছু হটে। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন বেতনের নতুন কাঠামো চালু করে এবং বিশেষ ধরণের

জীবনযাত্রার জন্য অর্থব্যয়ের সূচনা করে। সেই কারণে চাকুরী প্রার্থী যুবকেরা আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ভি-গৌরীশঙ্কর এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে ৭১ শতাংশ পিতা-মাতা চায় যে তাদের সন্তানেরা স্বদেশী কোম্পানীর পরিবর্তে বিদেশী কোম্পানীতে চাকরী গ্রহণ করুক। তিনি বলেছেন, "এই সব কর্মচারী কোম্পানীর প্রতি আনুগত্যে দীক্ষা লাভ করে এবং অনেক সময়ই দেখা যায়, দেশের প্রতি এবং কোম্পানীর প্রতি আনুগত্যের মধ্যে যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে, সেটা তারা ভুলে যায়।" ( "Taming the Giants" )

উপরন্তু, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের তৈরী এই নতুন অভিজাত গোষ্ঠী সরকারী অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতাদের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে। তাই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর হয়ে তাদের ওকালতি সরকারী নীতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় ভারতের পক্ষ থেকে ১৯৭৬ সালে যে বক্তব্য রাখা হয়:

(ক) প্রথমত আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কাজ কারবারের সংগে সংগে চাকরী-বাকরীর সংখ্যা বাড়বে—এই ধারণা ঠিক না। চাকরী-বাকরীর সংখ্যা যা বৃদ্ধি পায়, তা খুবই সামান্য। বরং নেতিবাচক ফলাফলই বেশী কারণ আন্তর্দেশীয় কোম্পানী চাকরীর কোন গ্যারান্টি দেয় না, উপরন্তু চাপ সৃষ্টির জন্য প্রায়ই কারবার সরিয়ে নেবার এবং গুটিয়ে নেবার ভয় দেখায়।

(খ) আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর সমগ্র ক্রিয়াকলাপ, নিয়োগ পদ্ধতি, বেতন-নীতি এবং ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

(গ) শ্রম-সম্পর্ক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো যে দাবী করে তা একেবারেই ভুয়া। তারা বলে যে স্থানীয় শ্রম-বিরোধ স্থানীয় কর্মকর্তারা মীমাংসা করে কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সে ব্যাপারে সদর দপ্তরই কলকাঠি নাড়ছে।

(ঘ) আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের শাখা সংস্থাগুলোর বেতন জাতীয় কোম্পানীর বেতনের চেয়ে ভাল বটে তবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো মনে করেন যে একই কোম্পানীর অপর এলাকার অধঃস্তন সংস্থার কর্মচারীদের বেতনের সংগে তাদের বেতনের একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

(ঙ) তা ছাড়া, আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো তাদের ক্রিয়াকলাপের কোন তথ্য সরকার অথবা ট্রেড ইউনিয়নকে জানাতে অনিচ্ছুক। ব্যাপারটা সত্যিই বিরক্তিকর। ( ডি. গৌরীশংকর ঃ Taming the Giants )

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এমনভাবে তাদের নীতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করে যে সেটা সব সময়ই শ্রমিক ঐক্যের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কম বেতনের দেশে অথবা অঞ্চলে উচ্চ বেতন কাঠামো তৈরী করে তারা শ্রমজীবী মানুষকে দুভাগে ভাগ করে দেয়। কিন্তু দেখা যায় যে, সেই উচ্চ বেতনও কোম্পানীর নিজ দেশের শ্রমজীবীদের বেতনের চেয়ে অনেক কম। এই ভাবে একই কোম্পানীর স্বদেশের শ্রমিক ও ভিন দেশের শ্রমিকের মধ্যে একটা ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয়।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যে সব দেশে কাজ-কারবার করে সেই সব দেশেও শ্রমিকের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। যেমন ধরুন, একটি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন স্থির করল যে তাদের বেলজিয়ামস্থিত অধঃস্তন সংস্থার উৎপাদন ক্ষমতা তাদের গ্রেট বৃটেন এবং পশ্চিম জার্মানীস্থিত অধঃস্তন সংস্থার উৎপাদন ক্ষমতার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্পোরেশন আরও স্থির করল যে বৃটেন এবং পশ্চিম জার্মানীর কারখানায় যে সব কাজ হয়, তার কিছু কাজ বেলজিয়ামের কারখানায় স্থানান্তর করা হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে বৃটিশ ও পশ্চিম জার্মান শ্রমিকরা এর প্রতিবাদ করবেন এবং বেলজিয়ামের শ্রমিকরা করবেন না। তাহলে দেখা যাবে যে বেলজিয়ামের শ্রমিকের স্বার্থ আর বৃটিশ ও জার্মান শ্রমিকের স্বার্থ পরস্পরের বিরোধী। তখন একই কোম্পানীর দুই দেশের শ্রমিকের মধ্যে অন্তত কিছুকালের জন্যও বিভেদ সৃষ্টি হবে।

উন্নয়নশীল দেশে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর যে সব শ্রমিক-কর্মচারী নিজেদের "অভিজাত" শ্রেণীর লোক বলে আত্মগরিমা বোধ করেন এবং স্বদেশী কোম্পানীর শ্রমিক-কর্মচারীদের ছোট চোখে দেখেন, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে, আন্তর্দেশীয় কোম্পানী তাদের কাউকে সর্বোচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপনায় কখনও স্থান দেবে না। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো তাদের স্বদেশের লোক ছাড়া আর কাউকে যে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়োগ করে না, তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ আছে। সি-টুগেন্ডহাট বলেছেন, "আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সদর দপ্তরের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা বোর্ডে কোন বিদেশী বড় একটা স্থান লাভ করতে পারে না।"

এ সব ব্যাপারেও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রতি আচরণে একটা পার্থক্য

বিদ্যমান। অনেক সময়ই দেখা যায় আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর অধঃস্তন সংস্থা (উন্নত দেশে) তাদের ম্যানেজার অথবা সুপারভাইসর পদে স্থানীয় লোক নিয়োগ করেছে। সে-ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্মকর্তাকে বুঝতেই দেওয়া হয় না যে তিনি বিদেশের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হচ্ছেন। উন্নয়নশীল দেশে সর্বোচ্চ পদে স্থানীয় লোক নিয়োগের ঘটনা একেবারেই বিরল। আমেরিকা ভিত্তিক আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর উচ্চতম পদগুলোয় আমেরিকার লোকই বেশী, তা সে উন্নত দেশেই হোক আর উন্নয়নশীল দেশেই হোক।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সদর দপ্তরে সিনিয়র পদে সাধারণত বিদেশীর কোন স্থান হয় না। এই বৈষম্যমূলক রীতি-নীতির তীব্র সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এই বৈষম্য চালু রেখেছে।

এখানে তার একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। নেসলেস্ একটি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন এবং এর সদর দপ্তর সুইজারল্যাণ্ডে। এই কর্পোরেশনের কারবারের ৯৭.৫ শতাংশই সম্পন্ন হয় ভিন দেশে। সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নেসলেসের মাল বিক্রী হয়। তবে এর মালিকানা সুইজারল্যাণ্ডের লোকের কুক্ষিগত। যাতে এই কোম্পানী অপর দেশের লোকের হাতে চলে না যেতে পারে, সেই জন্য নিয়ম করা হয়েছে যে সুইজারল্যাণ্ডের লোক ছাড়া আর কেউ এর ভোটাধিকার প্রদায়ী শেয়ারের মালিক হতে পারবে না।

(সি-টুগেণ্ডহাট ঃ "দি মাল্টিন্যাশনালস্")

এটা খুবই পরিষ্কার যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানী যেখানেই কারবার খোলে, সেখানেই বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং প্রায়ই সেই বিভেদ নানা রূপ ও চরিত্র পরিগ্রহ করে।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানী শ্রমজীবীর ব্যক্তিত্বও বিনাশ করে। উইলিয়াম হাইট তাঁর "দি অর্গানাইজেশন ম্যান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"ওরা শ্রমিক না, কেরানী বলতে ধোপদোরস্ত পোষাক-পরা যে শ্রমজীবী মানুষটিকে আমরা চিনি, ওরা সেই জাতীয় মানুষ নয়। ওই লোকগুলো শুধু সংগঠনের জন্য কাজ করে এবং ওদেরই লোক। ওরা আত্মিক ভাবে এবং প্রকৃতপক্ষেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘর-ছাড়া মানুষ। ওরা সংগঠন-এর জীবন যাপনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ এবং ওরাই আমাদের বিরাট বিরাট অবিরত সম্প্রসারণশীল সংগঠনের মন ও আত্মা···ওরাই আমাদের সমাজের মুখ্য সদস্য··· আমাদের নেতৃত্বের প্রথম এবং দ্বিতীয় সারি এদের নিয়েই গঠিত।"

এই লোকগুলো আর সমাজের অধীন নয়। সংগঠনের অধীন। আর এই সংগঠন হচ্ছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন।

বর্তমান কালে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মানুষ হয়ে গেছে মেসিনের অঙ্গ। সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরণের যে কর্ম সমীক্ষা বিজ্ঞান চালু আছে, তার একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, মেসিনকে কিভাবে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানো যায়। যে কোন কাজকে নানা ভাগে বিভক্ত করে, অপ্রয়োজনীয় গতিবিধি বাতিল করে এবং বিশেষীকরণের দ্বারা দক্ষতা পরিবর্ধন করে উৎপাদনের হার প্রচণ্ড পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এসেম্বলী লাইন—চলমান বেল্টকে ঘিরে অসংখ্য শ্রমিক একই কাজের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করেন। সমস্ত কাজটাই অত্যন্ত বিরক্তিকর ও একঘেয়ে—একেবারে যান্ত্রিক। (গ্রাহাম ব্যানক "দি জাগারনাট")।

এর ফলে মানসিকভাবে ব্যক্তি একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কাজের সমগ্র প্রক্রিয়াটি মানুষকে সম্পূর্ণতার কথা ভুলে যেতে বাধ্য করে। মানুষ মেসিনের প্রায় একটা অংশে পরিণত হয়ে সেই মেসিনেই একটা নির্দিষ্ট কাজ ক্রমাগত করতে থাকে। সমগ্র কাজটি সম্পর্কে তার মনে কোন ধারণাই তৈরী হয়না। চার্লি চ্যাপলিন তাঁর "মডার্ণ টাইমস্" ছবিতে এই ছিন্নভিন্ন মানুষকেই রূপায়িত করেছিলেন।

সাধারণভাবে পুঁজিবাদের আওতায় এবং বিশেষভাবে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর আওতায় শ্রমিকের মানসিক দুর্গতি সত্যই অবর্ণনীয়। শ্রমিকের মনে ব্যর্থতাবোধ ক্রমেই আরও বেশী বেশী করে চেপে বসে। গাস হল তাঁর "ইম্পিরিয়ালিজম টুডে" গ্রন্থে বলেছেন, "১৯৫০ সালে হিরোইন মাদকের শিকারের সংখ্যা ছিল ৫৫ হাজার জন। আজ (১৯৭২) সেই সংখ্যা (আমেরিকায়) ৫ লক্ষ ৬০ হাজারে পৌঁছেছে। 'জনগণের পুঁজিবাদের' বাস্তবতা ভুলে থাকবার জন্য কোটি কোটি মানুষ কোকেন জাতীয় নানা মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে ভালবাসেন। তাঁদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ হিরোইন সেবী। সাম্রাজ্যবাদের জীবনধারায় বিপর্যস্ত কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মানসিক রোগীর সংখ্যা ১৯৫৫ ও ১৯৬৮ সালের মধ্যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। নরখাদক সমাজ-ব্যবস্থাই এদের হত্যা করেছে।"

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো নিজেদের পণ্য বিক্রয় লব্ধ মুনাফা বৃদ্ধির তাগিদে ক্রেতার ধ্যান-ধারণাও পাল্টে দেয়। কিন্তু সেই কাজটা করা হয় পরোক্ষ

উপায়ে। নিজেদের শ্রমিক কর্মচারীর কর্মশক্তি শুষে-নিঙড়ে নেবার জন্য তাদের উপর প্রত্যক্ষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সর্বোচ্চ স্তরে হয়ত এমন একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি নিরাপদে অবস্থান করেন, যিনি নিজস্ব পছন্দ অথবা সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথা ঘামান না। ইনি হলেন আন্তর্জাতিক সংগঠন যন্ত্রের আসল খাঁজ। পরবর্তীকালে ইনি হবেন "ক্রীতদাস চালক"। কারণ একেবারেই গোড়াতেই এদের "মগজ ধোলাই" করে নেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের ক্রেতাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের দ্বারা তারা তো প্রভাবিত হয়ই, উপরন্তু তাদের কর্মচারীদেরও ঐ সব পণ্য কিনতে বাধ্য করা হয়। কর্মচারী সেই সব পণ্য কিনলে দামে বিশেষ ছাড় পান এবং আগে মাল কিনে টাকা পরে দিলেও চলে। এই সব সুযোগ পেয়ে কর্মচারীরা ঐ সব পণ্যই ক্রয় করে থাকেন।

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো আর প্রকাশ্যে আগেকার মত স্বৈরতান্ত্রিক নয়। আগে তাদের নীতি ছিল "কথাটি না বলে যা বলছি তাই কর।" এখন তারা অনেক মিষ্টভাষী হয়ে গেছে। বলি, "আরে ভাই, এখানে আমরা সবাই একই টীমের সদস্য এবং বাণিজ্যের লড়াই যদি জিততে হয় তাহলে আমাদের নিয়ম মেনে চলতে হবে। এটা তুমি মানবে তো?" কিন্তু উপরোক্ত দুটি বক্তব্যের মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই। কর্মচারীরা পছন্দ করুক আর না-ই করুক লিখিত এবং অলিখিত নিয়মকানুন তাদের মেনে চলতেই হবে ( গ্রাহাম ব্যান্নক—দি জাগারনাট )।

কিছুদিন আগে "দ টাইমস্" পত্রিকায় ব্রিটেন এবং আমেরিকার কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ারিং স্নাতকের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী "নতুন ভাবনাচিন্তা নিয়ে যে-সব তরুণ নবাগতরা আসেন তাঁদের চিন্তাধারা কাজে না লাগিয়ে মনোপলি শিল্প প্রায়শ নিজেদের পুরোনো পথে তাঁদের পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন। নবাগতরা যতদিন না নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শেখেন ততদিন তাঁদের কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় না"। ( পূর্বের সূত্র )

ট্রান্সন্যাশনালের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই মানবিক গুণাবলী প্রকাশের পরিপন্থী। শ্রমিক এবং কর্মচারীদের অবশ্য এখন আর শারীরিক নির্যাতন সইতে হয় না কিন্তু মানসিক দিক থেকে তাদের আহত এবং পঙ্গু করে দেওয়া

হয়। এভাবে ট্রান্সন্যাশনাল উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রেতাদের ক্ষেত্রে যেমন, শ্রমিক ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও তেমনি ট্রান্সন্যাশনাল সংস্থার কাজকর্ম স্পষ্টতই সমাজ বিরোধী।

ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অবশ্য কর্তব্য ট্রান্সন্যাশনালের এইসব সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এই সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে বিশাল মানবিক দায়িত্বও পালন করতে হবে : ট্রান্সন্যাশনালের অমানবিক কার্যকলাপের কবল থেকে শ্রমিক ও কর্মচারীদের মুক্ত করা। ট্রান্সন্যাশনালের অধীন শ্রমিক ও কর্মচারীরা যাতে তাঁদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ফিরে পান, যাতে তাঁরা আর ব্যবসা-যন্ত্রের যন্ত্রাংশ হয়ে না থাকেন, পূর্ণ ব্যক্তি মানুষ হিসেবে সার্থক হয়ে উঠতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে নিরলস সংগ্রাম করে যেতে হবে।

কাজটি খুবই কঠিন। কিন্তু কোনো প্রতিকূলতাই বিশ্বের কোথাও কোনো প্রগতিশীল আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। এই কর্তব্য পালন করতে হলে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে অবশ্যই সবার আগে নিজেদের সুবিধাবাদী পথ পরিহার করতে হবে।

## সুবিধাবাদের ক্ষতিকারক দিক

একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সুবিধাবাদের স্রষ্টা। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর "১৮৪৫ এবং ১৮৮৫ র ইংলন্ড"-এ লিখেছেন,

"সত্য ঘটনাটি হলো এই : ইংলন্ডের ইনডাসট্রিয়াল মনোপলি পর্বে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী, অন্তত কিছুটা, মনোপলির সুযোগসুবিধা (benefits) ভোগ করতেন। এই সুযোগসুবিধা খুবই বৈষম্যমূলকভাবে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হতো ; সুবিধাভোগী সংখ্যালঘিষ্ঠরাই বেশীরভাগটা ভোগ করতেন ; তবু বৃহত্তর জনগণ অন্তত, অস্থায়ীভাবে মাঝে মাঝে কিছু অংশ পেতেন।" ভি. আই. লেনিন তাঁর "ইম্পিরিয়ালিজম্, দ হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম"-এ এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন এবং সংরক্ষিত তহবিলের উৎসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এটা করতে পেরেছে, কারণ,

১। এই দেশটি কর্তৃক সমগ্র বিশ্ব শোষণ ;

২। বিশ্বের বাজারে এর একচেটিয়া অবস্থান ;

৩। এর ঔপনিবেশিক মনোপলি।

চতুর্দশ অধ্যায়

# উপসংহার

এখন (১৯৮১) থেকে ছ' বছর আগে রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পরিষদ নতুন একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৮০ সালেই উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান দাঁড়ায় ৯৮২০ ডলার। ব্রুস এ. রাসেট তাঁর "রিচ এণ্ড পুয়োর ইন ২০৩০ এ-ডি" গ্রন্থে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ২০০০ সালে এই ব্যবধান ১১০০০ ডলারে পৌঁছোবে। রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পরিষদ নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধানের যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা যে কি ভাবে রূপায়িত হচ্ছে উপরোক্ত তথ্যই তার প্রমাণ।

এই ছ' বছরে আচরণবিধি ও অন্যান্য বিষয়ে আরও অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, আরও অনেক সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং আরও অনেক সুপারিশ ও প্রস্তাব তোলা হয়েছে কিন্তু বিশ্ব সংস্থাগুলোর সেই সব প্রচেষ্টা কোন ফল লাভে সমর্থ হয়নি। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো সেই সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

ইন্টার প্রেস সার্ভিস পরিবেশিত এক সংবাদে ( ১৯৮১ সালের ২৬শে জুন "পেট্রিয়ট" পত্রিকায় প্রকাশিত ) বলা হয়, "আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য আচরণবিধি প্রণয়নের পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর তাদের যে অসাধারণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, তাতে তাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ব বাণিজ্যের মোট পরিমাণের ৬৫ শতাংশই সাধিত হয় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর নিজেদের মধ্যে।

"তা ছাড়া, প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোও তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। সাতটি তৈল কোম্পানী—তথাকথিত "সাত ভগ্নী" তৈল শিল্পের প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ৬।৭টি কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করে তামা শিল্প এবং মূলত তারাই আবার বকসাইট ও এলুমিনা শিল্পও নিয়ন্ত্রণ করে।

"পৃথিবীর আকাশ ও জল পথে যে যাত্রী ও মাল আনা-নেওয়া হয় তার ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে আন্তর্দেশীয় বিমান ও জাহাজ কোম্পানীগুলো এবং

মূলধনের আন্তর্জাতিক সরবরাহের পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করে আন্তর্দেশীয় ব্যাংক-গুলো। (চারটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান—তথাকথিত "চার ভগ্নী" নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বের সংবাদ সূত্রের ৮৫ শতাংশ।)

"আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো ভিনদেশের রাজনীতিতে কি ভাবে হস্তক্ষেপ করে, তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় চিলিতে। সেখানে আন্তর্দেশীয় কোম্পানী ইন্টারন্যাশনাল টেলিফোন এন্ড টেলিগ্রাফ (আই. টি. টি) সালভাডোর আলেন্দের গভর্নমেন্ট উচ্ছেদ করে।

"আচরণ-বিধির প্রবক্তারা এই সব ঘটনার উল্লেখ করে আচরণ-বিধি প্রণয়নের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। অপর দিকে প্রতিবাদীরা বলেন যে যারা পুঁজি এবং কৃৎকৌশল সরবরাহ ক'রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিকাশে সাহায্য করে, তাদের উপর আচরণ বিধি চাপাইয়া দেওয়া অযৌক্তিক। কিন্তু আন্তর্দেশীয় কোম্পানী-গুলো বিকাশ প্রক্রিয়ায় সত্যিই সাহায্য করছে কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়।

"গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো তাদের মোট মূলধনের (লগ্নী করা) ৮০ শতাংশই লগ্নী করেছে ১০টি বৃহত্তম উন্নয়নশীল দেশে যেমন আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, ভেনেজুয়েলা, ভারত ও নাইজেরিয়ায়। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে বাকী ১০০'টি উন্নয়নশীল দেশের বিকাশে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কোন ভূমিকার সম্ভাবনা নেই।

"আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কাজ-কারবারের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশের আন্তর্জাতিক দায় শোধের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেই প্রশ্নও অবান্তর নয়। আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন বিষয়ে রাষ্ট্র সংঘের এক সমীক্ষায় প্রকাশ, "আন্তর্জাতিক দায় শোধের ক্ষেত্রে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কাজ-কারবার কোন ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে না।

"তার কারণ, রপ্তানির চেয়ে আমদানী বেশী এবং সেই বাড়তি আমদানী দায় মেটাবার জন্য বাইরে থেকে কোন পুঁজি পাওয়া যায় না। ১৯৭৭ সালে মেক্সিকোর পরিস্থিতি সমীক্ষা করে দেখা যায় যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো যে টাকার মাল রপ্তানি করছে, তার চেয়ে ৪৭ শতাংশ বেশী টাকার মাল আমদানী করেছে এবং সেটাই দাঁড়িয়েছে মেক্সিকোর বৈদেশিক দায় শোধের ঘাটতি।

"এই সব তথ্য-প্রমাণই উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দুশ্চিন্তায় ফেলে এবং তারা এখন দাবী করছে যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর জন্য এমন একটা আচরণ বিধি চালু করা হোক যাতে তারা বৈদেশিক দায়শোধের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা না বাড়িয়ে দেশের বিকাশে সহায়তা করে।

"আচরণ-বিধি প্রণয়নের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বহু কূটনীতিক আলোচনায় মন্থর অগ্রগতিতে হতাশা প্রকাশ করেছেন। এই আচরণ-বিধি বাধ্যতামূলক হবে না এবং বিধিভঙ্গকারীর জন্য কোন শাস্তির বিধানও থাকবে না জেনে তাঁরা আরও নিরুৎসাহ বোধ করছেন।

"তা সত্ত্বেও তাঁরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন কারণ তাঁরা ভাবছেন, একটা যে কোন ধরণের আচরণ-বিধি থাকলে চিলিতে আই.টি.টি-র ভূমিকার মত কোন ঘটনার, লকহিড ঘুষ কেলেংকারীর মত ঘটনার এবং ক্ষতিকর পণ্য স্বদেশে বাতিল হবার পর ভিন দেশে চালু করার মত ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা কমে যাবে। একজন কূটনীতিকের মতে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।"

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান যে ২০০০ সালে ৯৮০০ ডলার থেকে ১১০০০ ডলারে উঠবে সেটা কোন অবাক হবার মত ঘটনা নয়। এই হিসাব থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর এই সময়ের মধ্যে কোন উন্নতিই হবে না। ব্যবধান হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে ব্যবধান বেড়ে চলছে। আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর শোষণই সেই ব্যবধান বাড়িয়ে যাচ্ছে।

১৯৮১ সালের ২৯শে জুলাই স্টেটসম্যান পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়ঃ "পানামা সিটি, জুন ২৮—প্রেনসা ল্যাটিনার এক বার্তায় প্রকাশ ল্যাটিন আমেরিকান কনষ্ট্রাকশন ফেডারেশন (ফেমাকন) বলেছে যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এই এলাকা থেকে দৈনিক ২৪ লক্ষ ডলার করে কামিয়ে যাচ্ছে।

"বার্তায় আরও বলা হয়েছে যে আমেরিকা ভিত্তিক আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো সমস্ত স্থানীয় তহবিল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং ১৯৪০ সালের লগ্নীর তুলনায় এখন আরও ১০ গুণ অর্থ লগ্নী করে।

"সেমাভাবে প্রকাশ পায় যে কলাম্বিয়ায় অর্থনীতির ২০ শতাংশই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর দখলে এবং উঁচু দরের কৃৎকৌশলের পুরোটাও তারাই নিয়ন্ত্রণ করে।

"ফেমাকন বলেছে যে ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর উপস্থিতির ফলে প্রতিদিন ২৪ লক্ষ ডলার করে লোকসান হচ্ছে এবং সেখানকার ১০ কোটি লোক অপুষ্টিতে ভুগছে।

"সরকারীভাবে ঘোষিত ৩ কোটি বেকারের ১০ শতাংশ নির্মাণ ক্ষেত্রের শ্রমিক। ইকোয়েডোর, পেরু, কলম্বিয়া, গুয়াটেমালা, হণ্ডুরাস, বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়েতে নির্মাণ-শ্রমিকদের অতি নিষ্ঠুর ভাবে শোষণ করা হয়।"

শুধু লাতিন আমেরিকাই বা কেন? ১৯৮১ সালের ২৬শে জুন স্টেটসম্যানে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়, "...জানা গেছে যে, গত বছরই সর্বপ্রথম মার্কিন কোম্পানীগুলো ভারতের সংগে সর্বাধিক সংখ্যক বৈদেশিক কারিগরী চুক্তি সম্পাদন করে...১০৬টি মার্কিন কোম্পানী ১৯৮০ সালে ভারতের সংগে আরও ১৯টি আর্থিক চুক্তি সম্পাদন করে।

"ইন্ডো-আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স পরিচালিত এক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে বর্তমানে ভারতে মার্কিন লগ্নীর পরিমাণ ৩৫ কোটি ডলার। বিদেশে মার্কিন লগ্নীর ক্ষেত্রে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থানের অধিকারী গ্রেট বৃটেন।

"সমীক্ষায় আরও প্রকাশ পেয়েছে যে ৩০টি মার্কিন অংশীদার বিশিষ্ট কোম্পানীর বিক্রয় পাঁচ বছরে (১৯৭৫ থেকে ১৯৮০) বেড়েছে বার্ষিক গড়ে ১৬ শতাংশ হারে। মোট মুনাফা বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক গড়ে ১৫.২ শতাংশ আর ডিভিডেন্ড বেড়েছে বার্ষিক গড়ে ১৯ শতাংশ হারে।"

উন্নয়নশীল দেশগুলোয় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর লগ্নীর প্রকৃত অর্থ কি? প্রকৃত অর্থ হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নয়া উপনিবেশবাদী বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা। পুরোনো যুগের পদ্ধতি এখন অচল বলে এই বন্ধনের পদ্ধতি আরও সূক্ষ্ম ও জটিল। সাম্রাজ্যবাদের "শক্তি কেন্দ্রের" সংগে এই দেশগুলোকে জড়িয়ে ফেলা। আধুনিক সাজ সরঞ্জাম ও কৃৎকৌশলের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদনী শক্তি সমূহের বিকাশ আয়ত্তাধীন করা।

অপর দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা অপনোদনের জন্য চাইছে এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধান। আন্তর্দেশীয় কোম্পানী এই সব উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় স্বার্থের প্রধান প্রতিবন্ধক। সেই কারণেই কাঁচামাল এবং কারখানাজাত পণ্যের মূল্যের মধ্যে এত ফারাক। উন্নয়নশীল দেশগুলো চায়, তাদের কাঁচামাল ন্যায্য দামে বিক্রী হোক এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের চক্রাকার ওঠা-নামা হ্রাস পাক। তারা আরও চায় কার্যকর কারিগরী ও অর্থনৈতিক সাহায্য। কিন্তু সে সব তারা পায় না।

সেই কারণেই উন্নয়নশীল দেশগুলো চায় যে রাষ্ট্রসংঘ ও অন্যান্য বিশ্বসংস্থা শোষণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। অপরদিকে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো সকল প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বানচালের চেষ্টা করে।

বর্তমানকালের নয়া উপনিবেশবাদী নীতি দুটি পরস্পরের পরিপূরক

উপাদানে গঠিত : সকল ধরনের রাষ্ট্রীয় "সাহায্য" এবং প্রাইভেট মনোপলি পুঁজির সম্প্রসারণ। মূলধন, পণ্য, শ্রমশক্তি, আধুনিক মেসিনপত্র এবং কৃৎ-কৌশলের আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার রয়েছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর কব্জার মধ্যে। তাই নয়া উপনিবেশবাদী নীতি সক্রিয় প্রয়োগের সুবিধা ভোগ করে তারাই সবচেয়ে বেশী। শুধু আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর ভিনদেশীয় অধঃস্তন সংস্থাগুলোই বাজারে ৪০,০০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য ছাড়ে। এটা লাতিন আমেরিকায় উৎপন্ন মোট পণ্যের (জি এন পি) চেয়ে ৪০০০ কোটি ডলার বেশী। বৃহত্তম আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মধ্যে আমেরিকায় রয়েছে একসন (EXXON), আই-টি-টি (I.T T), আই-বি-এম (I.B.M) ও জেনারেল মোটারস্; গ্রেট বৃটেনে রয়েছে বৃটিশ পেট্রোলিয়াম ও ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিস; পশ্চিম জার্মানীতে রয়েছে ভক্সওয়াগেন ও বেয়ার; সুইজারল্যাণ্ডে রয়েছে নেস্‌লেস্; হল্যাণ্ডে ফিলিপস; জাপানে হিতাচি। (১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসের "ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স" দেখুন।)

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটা উৎপাদন-আর্থিক বাণিজ্য-অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক-কৃৎকৌশলগত সম্পর্কের ব্যবস্থা গড়ে তোলবার কাজে পুঁজি প্রবাহকে কাজে লাগায়। তদ্দ্বারা তারা উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে সব চেয়ে বেশী হারে মুনাফা কামাতে পারে, বে-পরোয়া এবং নির্মমভাবে তাদের সম্পদ শোষণ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে এই দেশগুলোকে পশ্চিমী দুনিয়ার বশংবদ করে রাখতে পারে। পুঁজি রপ্তানিই হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ার প্রধান বাহন। ভি-আই-লেনিন সর্বপ্রথম চোখে আঙুল দিয়ে এটা দেখিয়ে দেন। আজও অবস্থাটা একই রকম আছে। এই অনুপ্রবেশের ফলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম নিরুত্তাপ হয়ে যায়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নিজস্ব উৎপাদনী শক্তিসমূহের উপর উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা অথচ আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর লক্ষ্যই হল এই উৎপাদনী শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদনী শক্তিগুলোর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার পরই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো তাদের বিশ্ব পুঁজিবাদের "অংশীদার" বানিয়ে ফেলে।

উপরোক্ত পটভূমিকার ভিত্তিতেই উন্নয়নশীল দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের হস্তক্ষেপের বিষয়টি বিচার করা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৭৯ সালের মে মাসে আংকটাডের (UNCTAD) পঞ্চম অধিবেশনে ( ম্যানিলায় ) কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ একটি দলিল পেশ করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো গ্রাহক দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে, তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার নস্যাৎ করছে এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তছনছ করে দিচ্ছে। তার চেয়ে খারাপ কথা এই যে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো গ্রাহক দেশের উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য প্রায়ই নিজেদের অর্থনৈতিক ও গবেষণার ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। এই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো হচ্ছে নয়া উপনিবেশবাদের বৈষয়িক ভিত্তি, হুকুমদারী শোষণ এবং অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবস্থা।

ভিন্নদেশে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কিভাবে ঘুষ-ঘাষ দিয়ে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে, ১৯৭৫ সালে "ফরচুন" পত্রিকায় তার বহু দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয়েছিল। একসন ইটালীর নির্বাচনী তহবিলে ২ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার চাঁদা দিয়েছিল এবং ইটালীতে অবস্থিত অধঃস্তন সংস্থাকে একই তহবিলে আরও ১৯ লক্ষ ডলার চাঁদা দেবার নির্দেশ দিয়েছিল। এর জন্য হিসেবের যে সব কারচুপি করা হয়েছিল, কোম্পানীর কর্তারা তা অনুমোদন করেছিলেন। কলার উপর ট্যাক্স অর্ধেক কমিয়ে দেবার জন্য ব্র্যান্ড কোম্পানী হোন্ডুরাসের এক মন্ত্রীকে ঘুষ খাইয়েছিলেন। গালফ অয়েল বোহেমিয়াকে ৩৫০০০০ ডলার এবং বোহেমিয়ার প্রেসিডেন্টকে ১১০০০০ ডলার মূল্যের একটি হেলিকপ্টার উপহার দেয়। সেই হেলিকপ্টার এক দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং প্রেসিডেন্ট তাতে মারা যান। গালফ অয়েল দক্ষিণ কোরীয় প্রেসিডেন্ট পি-চুঙ-হির রাজনৈতিক পার্টিকে ১ কোটি ডলার প্রদান করে। ১৯৭০ সালে পার্টির তহবিল সংগ্রাহক আরও ১ কোটি ডলার দাবী করেন। অনেক দর কষাকষির পর সেটা ৩০ লক্ষ ডলারে রফা হয়। গালফের মুখ্য পরিচালক বব ডোরসে হিসাব করে বলেছিলেন যে দক্ষিণ কোরীয়ার মত একটা ছোট দেশে নির্বাচন চালাবার পক্ষে ঐ টাকাটাই যথেষ্ট।

জোট নিরপেক্ষ দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের চতুর্থ সম্মেলনে নিম্নলিখিত ঘোষণা করা হয়ঃ

"আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো উন্নয়নশীল দেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ

করছে, ঘরোয়া ব্যাপারে নাক না গলাবার নীতি অগ্রাহ্য করছে, মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ক্ষুন্ন করছে, অথচ এগুলোই হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্বসর্ত। সুতরাং রাষ্ট্র ও গভর্ণমেণ্ট প্রধানগণ বিশ্বের দরবারে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর এই সব অবাঞ্ছনীয় ক্রিয়া-কলাপের তীব্র নিন্দা করছে।"

১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলোর সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী "নির্লজ্জ" আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন-গুলোর ক্রিয়া কলাপকে "জবরদস্তিমূলক, দুর্নীতিমূলক এবং ষড়যন্ত্রমূলক" বলে বর্ণনা করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক মনোপলি অর্থাৎ আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের নিয়মমাফিক উত্তরাধিকারী। এটা হল সাম্রাজ্যবাদের ভিন দেশে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হাতিয়ার। লগ্নীযোগ্য পুঁজি জাতীয় সীমানার বাইরে পদক্ষেপ করে এবং আন্তর্জাতিক আকারে নিজের প্রভুত্বের এলাকা সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সহযোগিতার একটা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সত্য তবে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘাতও দেখা দেয়।

এখন বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার নেতৃত্বে একটি সাম্রাজ্যবাদী মহাজোট গঠনের চেষ্টা চলছে। তার ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলোর শীর্ষ বৈঠক ত্রিপক্ষীয় কমিশনের অধিবেশন এবং ও. ই. সি. ডি. (O.E.C.D.) ইত্যাদির মধ্যে। এ সবের প্রধান লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রসার রোধের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগ্রামের মুখে দাঁড়িয়ে আন্ত-র্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থ রক্ষা ও সম্প্রসারণ করা।

বিশ্বের বাজারে গতিবিধি প্রধানত যে শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন এবং বৃহৎ বৃহৎ ব্যাংক) তাদের আশু ও ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষার জন্য সব সময়ই পরিকল্পনা ছকা হয়ে থাকে। তাই পাশাপাশি চলে বাছাবাছি কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের সংগে সম্বন্ধ স্থাপনের আয়োজন। অর্থনৈতিক কাঠামোর উদার পুনর্বিন্যাসের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, তাতে যাতে কোন রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে এইভাবে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়। আন্ত-র্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগে শক্তির অবস্থান থেকে কথা বলতে পারে, সেই দিকে নজর রাখার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করা হয়।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে তত্ত্বাদর্শের উপরও জোর দেওয়া হয়। আমরা তাই শুনতে পাই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের তথা সাম্রাজ্যবাদের "মহান মিশনের" গালগল্প।

আন্তর্জাতিক মনোপলির ইদানিংকালের তত্ত্বাদর্শ হচ্ছে "মানবিক সংহতি"। এই "মানবিক সংহতির" কাছে নিজেদের জাতীয় স্বার্থ নিবেদন করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে। আর এক তত্ত্ব হচ্ছে "নব-গ্রহ মানবিকতা"। এই তত্ত্বে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের ক্রিয়াকলাপকে "নতুন গ্রহ-বিধানে"র উপাদান বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মনোপলি পুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই সব তত্ত্ব প্রচার করা হচ্ছে। আমেরিকার ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস্ ও ল্যারী (ওয়াশিংটন) এটাকে ভবিষ্যৎ বিশ্ববিধানের এক "উদার সংস্করণ" বলে বর্ণনা করেছেন। - (ORBIS, No-3 Vol.22)। এই তত্ত্বে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে "নব-গ্রহ মানবিকতা" প্রবর্তনে মুখ্য ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। এই সব তত্ত্বের লক্ষ্য হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় সার্বভৌমত্ব বানচাল করা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের শক্তি হ্রাস করা এবং আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের মানবিক অগ্রগতির হাতিয়ার বলে চিত্রিত করা।

"মানবিক সংহতির" তত্ত্ব প্রচারের সংগে সংগে "পারস্পরিক ত্যাগ স্বীকারের" আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তারা তাদের কাঁচা মালের মূল্য বৃদ্ধির দাবী করতে পারবে না। আভাষে ইংগিতে এটাই বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাঁচা মালের দর বৃদ্ধির ফলেই উন্নত পশ্চিমী দেশগুলোয় অর্থ-নৈতিক সংকট ও বেকারী বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকলেই জানেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতি চিরকালই মন্দা-সংকটের চক্রে ঘুরপাক খায় এবং ছাঁটাই ও বেকারী সেখানকার প্রাত্যাহিক ঘটনা। কিন্তু আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর তত্ত্ববাগীশরা বোঝাবার চেষ্টা করছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগ্রামের ফলেই অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিক ও জনগণের জীবনে দুঃখ দুর্দশা নেমে এসেছে। এই সব তত্ত্ববাগীশরা এই ভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সংগে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধ বাধাবার প্রয়াস পাচ্ছে। তবে আসল কথাটা হচ্ছে এই যে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের শ্রমজীবী মানুষ, উন্নয়নশীল দেশের শ্রমজীবী মানুষ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমগ্র গোষ্ঠীই একই শ্রেণীর লোকের অর্থাৎ আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর শোষণের শিকার।

ই. নুখোভিচ বলেছেন, "আন্তর্জাতিক মনোপলিগুলোর কাজের একটি সাধারণ ধারা হচেছ পশ্চিমী দেশগুলোর শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে পাওয়া মুনাফার একটা অংশ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে প্রেরণ করে সেখানে অধঃস্তন সংস্থা গঠন করা। স্থানীয় শ্রমিক শোষণ-জাত মুনাফা সুনিশ্চিত করবার জন্য অধঃস্তন সংস্থার উৎপন্ন পণ্যাদি প্রায় বিনাশুল্কেই পশ্চিমী দেশগুলোয় রপ্তানি করা হয়। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের শ্রমজীবী মানুষের উপর কর বসিয়ে তার ক্ষতি পূরণ করা হয়। অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ সকল স্থানের শ্রমজীবী মানুষই আন্তর্জাতিক মনোপলিগুলোর সমৃদ্ধি সাধনের জন্য ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য হয়। বুর্জোয়া তত্ত্বাবাগীশরা "মানবিক সংহতি"র নামে এই শোষণ ব্যবস্থার গুণগান করে থাকেন।" (অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষকে মুনাফার পাদপীঠে বলিদানের জন্য আহ্বান করা হয়।)

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে পুঁজি ও কারিগরী কৃৎকৌশল রপ্তানির ব্যাপারে স্ব স্ব দেশের গভর্নমেণ্ট সহায়তা করে থাকেন এবং এই ভাবে তারা আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করেন।

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশের দ্বারা প্রাধান্য বিস্তার করার প্রধান উপায় ছিল সরাসরি পুঁজি লগ্নী করা। সত্তরের দশকের পর সরাসরি পুঁজি লগ্নীর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র জাপানের সরাসরি লগ্নীর পরিমাণ সামান্য কিছু বেড়েছে; পশ্চিম জার্মানীর লগ্নীর পরিমাণ যা ছিল, তাই আছে; মার্কিন লগ্নীর পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে (অবশ্য লাতিন আমেরিকায় ছাড়া); বৃটিশ লগ্নীও হ্রাস পেয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে পোর্টফোলিও লগ্নী (সিকিউরিটি ক্রয়) এবং রপ্তানি ঋণের উপর।

১৯৭৫ সালে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেওয়ার পর থেকে এই নতুন প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরাসরি মনোপলি লগ্নী এবং অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর "সাহায্য"র তুলনায় বাণিজ্যিক ঋণের (প্রাইভেট) পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। এই নতুন প্রবণতায় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন-গুলোর নমনীয় পদ্ধতিই প্রতিফলিত। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ক্রমবৃদ্ধির পটভূমিকায় তারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন বাড়তে থাকলে এক সময় হয়ত উন্নয়ন-শীল দেশগুলোয় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সকল সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে

রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যিক ঋণের এই ধরণের কোন ভয় নেই। উপরন্তু এই বাণিজ্যিক ঋণের সুদের হারও খুব বেশী। ফলে মুনাফাও অনেক বেশী। সেই কারণে আন্তর্জাতিক পুঁজির সম্প্রসারণে ঋণ-পুঁজি একটা ক্রমবর্ধমান ভূমিকা গ্রহণ করছে। ভি-আই-লেনিন এই প্রক্রিয়াকে "সুদখোরী সাম্রাজ্যবাদ" আখ্যা দিয়েছিলেন। আজ বাস্তব ক্ষেত্রে ঠিক সেই জিনিষটাই ঘটছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোয় আন্তর্জাতিক মনোপলিগুলোর মোট লগ্নীর মধ্যে ঋণ-পুঁজির পরিমাণ কত তা নিচের তালিকা থেকেই পাওয়া যাবে। ( উৎস— ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স, নং ৪, ১৯৮১ )

| বিধরনের লগ্নী | ১৯৬৬-৬৮ মিঃ ডলার | ১৯৭০ মিঃ ডলার | ১৯৭৫ মিঃ ডলার | ১৯৭৬ মিঃ ডলার | ১৯৭৭ মিঃ ডলার | ১৯৭৮ মিঃ ডলার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সরাসরি লগ্নী | ২৪৩৭ | ৩৬৮৯ | ১০৪৯৩ | ৭৮২৩ | ৯৪৯৮ | ১৪৩৯ |
| দ্বিপক্ষীয় পোর্টফোলিও (সিকিউরিটি ক্রয়) | ৭০৯ | ৬৯৬ | ৫২৩৮ | ৬০৭২ | ১০৭৪৯ | ২১২৫৬ |
| বহুপক্ষীয় পোর্টফোলিও | ৪৭০ | ৪৭৪ | ২৫৭২ | ৩০৯৯ | ২৬৪১ | ২২২৮ |
| রপ্তানি ঋণ | ১১৪২ | ২১৪১ | ৪১৪১ | ৫৪১৩ | ৮০৭৭ | ৯৬৮৬ |
| ব্যাঙ্ক ঋণ | — | — | — | — | ১০৭৭ | ১০২৮০ |

দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৮ সালে রপ্তানি ও ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ২৯৯০০ মিলিয়ন ( ২৯৯০ কোটি ) ডলারে পৌঁছেছিল। ঐ বছর পশ্চিমী দেশগুলো সরকারী 'সাহায্য" প্রদান করেছিল ১৯৮০০ মিলিয়ন ডলার। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় বিদেশী পুঁজি লগ্নীর ক্ষেত্রে যে একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, উপরোক্ত ঘটনাই তার প্রমাণ। এর মধ্যে কোন কোন দেশ লগ্নীকৃত পুঁজির ৮০ শতাংশই ছিল বাণিজ্যিক ঋণ ( প্রাইভেট ), সরাসরি লগ্নী নয়। ঋণ হিসাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় পুঁজি রপ্তানির ব্যাপারেও সব দেশের ( আন্তর্দেশীয় কোম্পানী ও ব্যাংকগুলোর ) গভর্নমেন্ট পুরো মদৎ দিচ্ছে।

কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে। ১৯৭১ সালে তাদের বৈদেশিক ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ৮৬৬০ কোটি ডলার। ১৯৭৯ সালে সেটা ৩৯১০০ কোটি ডলারে পৌঁছোয় ( ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স )। ১৯৮১ সালে জুন মাসে এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩০০০ কোটি ডলার।—( ফরেন

এফেয়ার্স, জুন, ১৯৮০ )। এই ঋণের সুদ ১৯৭০ সালে দিতে হয়েছে ৮৮০০ কোটি ডলার। উন্নয়নশীল দেশগুলো পণ্য রপ্তানি দ্বারা যে অর্থ উপার্জন করে তার ২২ শতাংশই চলে যায় ঋণের সুদ মেটাতে।

মার্কিন বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী মার্কিন ব্যাঙ্কগুলোর কাছে ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৪৪০০ কোটি ডলার। সমস্ত পশ্চিমী ব্যাঙ্ক মনোপলিগুলোর কাছে তাদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০০০ কোটি ডলার। সুদসহ ঋণ শোধ করবার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পশ্চিমের প্রাইভেট ব্যাংকগুলোয় ২০০০ কোটি ডলার জমা দিতে হবে। ( সূত্র ঃ কোঅপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট, প্যারিস। )

পশ্চিমী অর্থনৈতিক "সাহায্য" এইভাবে বাণিজ্যিক আকার গ্রহণ ক'রে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এমন অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইছে যাতে তারা কোন দিনই সেই বন্ধন মোচন না করতে পারে। পশ্চিমী পুঁজিবাদের সঙ্গে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শোষণ করে যাওয়াই এর লক্ষ্য।

কারিগরী কৃৎকৌশলের উপর আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর মনোপলি নিয়ন্ত্রণের অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে তাদের উপর উন্নয়নশীল দেশগুলোর নির্ভরতা। ১৯৭৮ সালে বুয়েনস্ এয়ার্সে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে কারিগরী সহযোগিতা বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উন্নয়নশীল দেশের একদল বিশেষজ্ঞ বলেন যে "চিরাচরিত কারিগরী সাহায্যের আসল লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বতন্ত্র বিকাশের সম্ভাবনা লোপ করা।" সমস্যাটি যে কি বৃহদাকারের তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। ১৯৬০-এর দশকে নতুন কারিগরী কৃৎকৌশলের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো ১০ কোটি ডলার মূল্য প্রদান করেছিল ( লাইসেন্স, উৎপাদনাধিকার এবং বিশেষ জ্ঞান তার অন্তর্ভুক্ত ছিল )। সত্তরের দশকে একই খাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ব্যয় করতে হয় ৯৯০ কোটি ডলার। এই লেন-দেনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থ যা ব্যয় হবার তা তো হয়ই. তার উপর তাদের নানা সর্তে তাদের কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যে কাজ করতে হয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সেই কারিগরী কৃৎকৌশল সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে অনুপযোগী।

রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশাসক ব্র্যাডফোর্ড মোস বলেছেন, "অগ্রসর দেশগুলো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোয় যে কারিগরী কৃৎকৌশল রপ্তানি করছে তার বেশীরভাগই তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। তার ফলে সর্বত্রই বিশেষ দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশ এই সব কারিগরী

কৃৎকৌশল আমদানীর ফলে শুধু মুষ্টিমেয় লোক রাতারাতি ধনবান হয়ে উঠছে। বিকাশের মৌলিক উপাদান হচ্ছে কারখানা, সাজসরঞ্জাম এবং মেসিনপত্র। শুধু এই সব যোগাড় করতেই অনেক উন্নয়নশীল দেশ ফতুর হয়ে যাচ্ছে। আর এই কলকারখানা চালাবার মত অভিজ্ঞ লোক এবং সংগঠনের অভাব দেখা দিলে চরম বিপর্যয়েই সৃষ্টি হয়।"

সোভিয়েত গ্রন্থকার ই. নুখোভিচ বলেছেন, "...আধুনিক কারিগরী কৃৎকৌশল ক্রয়ের ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে অনেকটা রেডিমেড জামা কেনার মত—দোকানে গিয়ে নিজের মাপে জামা কিনে দাম দিয়ে দাও। নতুন কোন কারিগরী কৃৎকৌশলের কার্যকারিতা নির্দিষ্ট দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। মনোপলিগুলো কারিগরী কৃৎকৌশল রপ্তানির সময় এই জিনিষটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। তা' ছাড়া নির্দিষ্ট কারিগরী কৃৎকৌশল জাতীয় বিকাশের চাহিদা পূরণ করে কিনা, তাও তারা বিবেচনা করে দেখেনা। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতি প্রকৃতি বারংবার এটাই প্রমাণ করে যে কারিগরী কৃৎকৌশল, সাজসরঞ্জাম এবং বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের মানটা আসল কথা নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে পারিপার্শ্বিক সামাজিক কাঠামো। যে কারিগরী কৃৎকৌশল যুগযুগব্যাপী পশ্চাদপদতার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক অগ্রগতির সম্ভাবনা উজ্জলতর করে এবং জাতীয় স্বাধীনতার শক্তি বাড়ায়, একমাত্র সেই কারিগরী কৃৎকৌশলই উন্নয়নশীল দেশের উপযোগী।"

ইদানিং আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো উন্নয়নশীল দেশ শোষণের এক নতুন কায়দা বার করেছে। আগে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কৃষিপণ্য এবং কাঁচামাল সরবরাহকারী উপাঙ্গ হিসাবে জিইয়ে রাখা হত। এখন এগুলোকে কৃষি-শিল্প উপাঙ্গের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। তার ফলে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো শ্রমসাধ্য সহায়ক উৎপাদনের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতিলাভ করেছে এবং বিশ্বে নতুন শ্রমবিভাগ চালু করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সস্তার শ্রমিক নিয়োগ করে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে। কাঁচামাল ও শক্তি ( energy ) সরবরাহের ধারা অব্যাহত রাখাও এভাবে সুনিশ্চিত হচ্ছে। এইভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোয়, যে শিল্প গড়ে উঠছে তার কাজ হচ্ছে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর কাঠামোগত চাহিদা পূরণ করা। এযুগে এ-ও এক ধরণের নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণের ব্যবস্থা।

যে দিক দিয়েই বিচার হোক, দেখা যাচ্ছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক নয়া-উপনিবেশবাদী অভিযানের প্রধান হাতিয়ার।

সাম্রাজ্যবাদের "শক্তিকেন্দ্রের" স্বার্থে বিশ্বের পুঁজিবাদী বাজারের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা শোষণের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে। সংগে সংগে তারা এমন একটা বাজারবিন্যাস ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা করছে যার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংগে অংগাংগীভাবে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যায়, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক মনোপলির সংগে আপোষের সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তবেই তারা স্বাধীনতার পথে এবং গণতান্ত্রিক বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপনের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে।

১৯৮০ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের একাদশ অধিবেশনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগে আন্তর্দেশীয় স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর তীব্র সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র বিরোধের ফলে ৮০'-র দশকের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিকাশ কার্যক্রম প্রণয়ন করা অসম্ভব হয়।

এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সমাজতান্ত্রিক জাতি গোষ্ঠীর দেশগুলো একাদশ অধিবেশনে আন্তর্জাতিক বিকাশ কার্যক্রমে (৮০'-র দশকে) তাদের অবদান সম্পর্কে একটি যৌথ বিবৃতি প্রদান করে। তারা পরিষ্কার জানায় যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা, হুকুমদারী ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবে। বৈষম্য, রক্ষণ (প্রোটেক্টনিজম) এবং অন্যান্য কৃত্রিম বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধেও তারা সংগ্রাম করবে।

এটা সকলেরই জানা উচিত যে আন্তর্জাতিক মনোপলির কারিগরী ও আর্থিক শক্তি যদি উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের কাজে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে তাদের সার্বভৌম অধিকারের উপর আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের হস্তক্ষেপ কোন রকমেই বরদাস্ত করা উচিত হবে না। দেশের অর্থনীতি ও শিল্পায়ণ সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্তে অটুট থাকাই হবে উন্নয়নশীল-দেশগুলোর একান্ত কর্তব্য।

সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত উন্নয়নশীল দেশগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, সেটা করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। তারা আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করেছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো সরকারী তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট প্রকল্পে কাজ করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলো যেন মনে রাখে যে ন্যায্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে তাঁরা একা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ চিরকালই উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা জোরদার করার এবং তাদের উৎপাদনী শক্তিগুলোকে রাহুমুক্ত করার সংগ্রামে মদত দিয়ে আসছে।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং সকল দেশের শ্রমজীবী (আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের উৎস দেশের শ্রমজীবী মানুষ সহ) মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম একটি বাঞ্ছনীয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম।

তাদের তহবিল থেকে সাম্রাজ্যবাদী মনোপলিগুলি, যারা আজকের ট্রান্স-ন্যাশনাল, শ্রমিক শ্রেণী সহ জনসাধারণের কোনো কোনো অংশকে কিছু কিছু খুদকুঁড়ো বিলিয়ে থাকে; এটা যেন অনেকটা চোর তার চোরাই মাল থেকে পুলিসকে অথবা যে-দেখে-ফেলেছে তাকে কিছু দিচ্ছে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী মনোপলিগুলি শ্রমজীবী মানুষের একাংশকে ঘুষ দেয়। ছোট এই সুবিধাভোগী শ্রেণীকে লেনিন বলেছেন, 'অভিজাত শ্রমিক'।

শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে এলেও ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণী যে বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্রয়োজনীয় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না তার কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত যত্নে এই 'অভিজাত শ্রমিক' গড়ে তুলেছে।

প্রসঙ্গত, কার্লমার্কস এবং মার্কসবাদের সমালোচনা করে যাঁরা মিথ্যে অভিযোগ তুলে বলে থাকেন যে মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ব্রিটেনেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে, তাদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এরিক জে. হবস্‌বম তাঁর কার্লমার্কসের 'প্রি-ক্যাপিটালিস্ট ইকনমিক ফর্মেশন'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, "মার্কস কেবল পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিপ্লব আশা করেছিলেন—এই কথা বলার মানেই মার্কসকে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপিত করা এবং এর চেয়ে ন্যক্কারজনক ভ্রান্তি আর হয় না।"

হবস্‌বম আরো বলেছেন, এঙ্গেলস ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে রুশ বিপ্লবের আশা ব্যক্ত করেছিলেন এবং ১৮৯৪ সালে এই সম্ভাবনার প্রত্যাশায় ছিলেন যে রুশ বিপ্লব পশ্চিমের শ্রমিক বিপ্লবের সংকেত জানাবে যাতে একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।"

ট্রেড ইউনিয়নগুলির সুবিধাবাদী চরিত্রের মূল কারণ এই 'আভিজাত শ্রমিক' সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদী এবং ঔপনিবেশিক শোষণজাত বাড়তি মুনাফার সিংহভাগ চলে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী সিংহ—বড় বড় ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন এবং তাদের ব্যাংকগুলোর ভোগে—যারা এই কাজকারবারের সংগে সরাসরি যুক্ত। এর যৎসামান্য অংশ কেবল চুঁইয়ে পড়ছে, ট্রান্সন্যাশনাল যে-সব দেশে কারবার চালাচ্ছে সে-সব দেশের শ্রমিক শ্রেণী সহ জনগণের একাংশের হাতে। এই বদান্যতার ছিটেফোঁটা পুঁজিবাদী শ্রেণীর অ-মনোপলি অংশ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ, প্রযুক্তিবিদ, পেশাদারী এবং অসামরিক কর্মীর হাতেও গিয়ে পড়ে। এইভাবে এরা ট্রান্সন্যাশনাল চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার শ্রমিক শ্রেণীর কাছে "বশীভূত করার অর্থের" বাহক হয়ে পড়ে।

রাঘববোয়াল সংস্থাগুলো যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা লোটে সেই তুলনায় এই 'বশ করার অর্থ' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু দুর্নীতি আর সুবিধাবাদ ছড়ানোর কাজে এর ভূমিকা সামান্য নয়।

তবে দুর্নীতি আর সুবিধাবাদ কখনো সর্বব্যাপক হতে পারে না, সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে কখনো দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সুবিধাবাদী করে তোলা যায় না। তবে তাঁরাও বিভ্রান্ত হন এবং কখনো কখনো কু-প্রভাবে পড়েন। এই কুপ্রভাব এবং বিভ্রান্তির ফলে কোথাও শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের সংঘবদ্ধ করতে পারছেন না। ট্রেড ইউনিয়নগুলির দুর্নীতি এবং সুবিধাবাদ, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সেবার এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজে লাগে।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এই ব্যাপার ঘটে চলেছে। যেমন, আমেরিকার শ্রমিকরা এখনো জাতিবর্ণ এবং নৃতত্ত্বগত, বেকারী এবং আধা-বেকারী, এমনকি মতাদর্শের ভিত্তিতেও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। যদিও বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণী শোষণের ব্যাপারে আমেরিকা সর্বাগ্রগণ্য তথাপি এই বিভেদ রয়ে গেছে। ১৯৬৫-১৯৬৯, এই চার বছরে—যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ তুঙ্গে—আমেরিকায় শ্রমিক পিছু উৎপাদনশীলতা ১১ শতাংশ বেড়েছিল কিন্তু সাপ্তাহিক মজুরি এক ডলারেরও বেশি কমে গিয়েছিল। ( দ্র. গাস হল : ইম্পিরিয়ালিজম টুডে )।

এখন বিদেশে অল্প-মজুরি এলাকায় ট্রান্সন্যাশনাল নিজেই উৎপাদনের কাজে লেগেছে, কাজেই আমেরিকার শ্রমিকদেরও আরো বেশি করে বেকারীর মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

'আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষ একটি নতুন ধরনের সংকটের মুখোমুখি

হচ্ছেন। কিন্তু সত্য অনুসন্ধানের সুযোগ তাঁদের দেওয়া হচ্ছে না: সত্যটা হলো আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন সম্পর্কে। বরং তাঁদের মধ্যে ভুল ধারণাটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়: ট্রান্সন্যাশনালের বিদেশস্থ কর্মীরা যেন তাদের 'শত্রু'। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কাজ হবে, মার্কিন শ্রমিকদের চোখ খুলে দেওয়া; তাঁদের এই কথা বোঝাতে হবে যে, বিদেশের কর্মীরা তাঁদের শত্রু নয়, আসল শত্রু হলো ট্রান্সন্যাশনাল। মার্কিন ট্রান্সন্যাশনালের অধঃস্তন সংস্থাগুলোর জাতীয়করণের দাবি মার্কিন শ্রমিকরা সমর্থন করলে তা আমেরিকা এবং বেলজিয়াম, অথবা কানাডা, অথবা হঙকঙ অথবা ভারতের শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার হাতিয়ারে পরিণত হবে।

আজকের পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সুদূর প্রসারী কার্য-কলাপে রত আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করাই এখনকার জরুরী কাজ। শ্রমজীবী মানুষের দুটি অতিশক্তিশালী বিশ্ব সংগঠন রয়েছে: দ ওয়র্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্ এবং দ ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস (WFTU and ICFTU)। এর মধ্যে ICFTU-র উপরে সুবিধাবাদী মার্কিন ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রবল প্রভাব থাকায় WFTU-র সঙ্গে একযোগে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করা যাচ্ছে না।

### ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের দৃষ্টান্ত

এতদ্‌সত্ত্বেও জীবন ও বাস্তব পরিস্থিতির তাগিদে, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলো ট্রান্সন্যাশনালের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালিয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত হলো, বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ফোর্ডের অধস্তন সংস্থার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। প্রথমে গেনক-এ (বেলজিয়াম) অবস্থিত ফোর্ডের প্রকল্পে ধর্মঘট হলো; বেশ কিছুদিন ধরে ধর্মঘট চললো। ট্রান্সন্যাশনাল গেনক-এর জন্য পশ্চিম জার্মানী থেকে কর্মী আনার চেষ্টা করলেন। কোলোন-এ (পশ্চিম জার্মানী) ফোর্ডের কারখানার কর্মীরা ঘোষণা করলেন তাঁরা কোনো কর্মীকে গেনক-এ পাঠাতে দেবেন না, বা বেলজিয়ামে যে কাজ চলছে সে কাজ বেলজিয়ামের বাইরে অন্য কোথাও হতে দেবে না। ব্রিটিশ শ্রমিকরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। ব্রিটেন এবং বেলজিয়ামের ডক ও রেলকর্মীরা কোম্পানীর একটি প্রকল্প থেকে আর একটি প্রকল্পে মাল আনা-নেওয়া বয়কট করতে প্রস্তুত হলেন। ফল হলো এই, বেলজিয়ামের ফোর্ড প্রকল্পের কর্মীরা অনেক বিষয়ে লাভবান হলেন।

সারা ইওরোপের মোটর কর্মীরা আঞ্চলিক মজুরি বৈষম্য বিলোপের দাবি জানিয়েছেন, একই শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের এটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রথমে মোটর শিল্পে এবং পরে জিইঁাস-তেও কর্মীদের বিশ্ব-কাউন্সিল অথবা ওয়ার্কিং পার্টি গঠিত হয়েছে। এইসব কাউন্সিলে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কাজকর্ম বিষয়ে মতবিনিময় হতো। আরম্ভটা ভালোই হয়েছিল, কিন্তু এইসব কাউন্সিল শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি বাস্তবে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পশ্চিম জার্মান হয়েস্ট (Hoechst) অনুমোদিত স্থানীয় সংস্থার বিরুদ্ধে 'টার্কিশ কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স' ফেডারেশন-এর ধর্মঘটের আহ্বান এ-বিষয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত। ফ্রাংকফুর্টে অবস্থিত কোম্পানীর সদর দপ্তরের জার্মান শ্রমিকরা টার্কিশ শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে লড়াই চালালেন। এই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে টার্কিশ শ্রমিকরা নানাভাবে লাভবান হলেন। (দ্র. সি. টুগেনহাট : দ মাল্টিন্যাশনাল্‌স)

তবে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের সাফল্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশে নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এই ধরণের সাফল্যের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। চারটি ইওরোপীয় দেশের ছটি ট্রেড ইউনিয়ন হল্যান্ডের ট্রান্সন্যাশনাল ACZO-কে একটি শ্রমিক বিরোধী রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করেছে; ফরাসী সংস্থা সেন্ট গোবেন-এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ধর্মঘট; মে অ্যান্ড বেকার-এর কর্মীদের সমর্থনে সংহত আন্তর্জাতিক প্রয়াস এবং সাফল্য; হল্যান্ডের ফিলিপস্‌-এর সংগে ইওরোপব্যাপী চুক্তি; ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের হস্তক্ষেপে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের বেলজিয়ান অধস্তন সংস্থার ধর্মঘটের মীমাংসা; স্পেনের হফম্যান লা রোশ কারখানার ধর্মঘটী মহিলা কর্মীদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহত উদ্যোগ; স্পেনের মাইকেলিন রাবার কারখানার ন'জন আটক কর্মীর সমর্থনে সফল ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। (দ্র. বব এডওয়ার্ডস : মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিজ অ্যান্ড দ ট্রেড ইউনিয়নস্‌)

ইওরোপের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস মার্কিন শ্রমিকদের সংগ্রামে সাফল্য এনে দিয়েছে। তামাকের ব্রিটিশ-আমেরিকান অধস্তন সংস্থা 'ভিটা ফুড্‌স'-কে নিউ ইয়র্ক থেকে আমেরিকারই একটি অল্প-মজুরি, দুর্বল-ইউনিয়নযুক্ত এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় বাধা দেবার চেষ্টা করছিলেন আমেরিকার শ্রমিকরা। ইওরোপীয় শ্রমিকদের সমর্থনের কল্যাণে আমেরিকার শ্রমিকদের এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়েছে।

প্রধানত ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্-এর কল্যাণে মাল্টি-ন্যাশনাল নিয়ন্ত্রিত নানা শিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন গড়ে উঠছে বিশেষত পশ্চিমী দুনিয়ায়। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ ইন্টারন্যাশনাল কেমিক্যাল অ্যান্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ইন্টারন্যাশনাল মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ফুড অ্যান্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কর্স, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব কমার্শিয়াল ক্লারিক্যাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ, ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল অব মাইনার্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব মেকানিক্স, দ টেক্সটাইলস, ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি।

শ্রমিক শ্রেণীর এইসব আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস জোরদার করা ছাড়াও মাল্টিন্যাশনালের হাজারো কাজকর্ম বুঝতে সাহায্য করছে। শ্রমিক শ্রেণীকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো ফেডারেশনই নিজেদের গবেষণা কেন্দ্র অথবা ব্যুরো স্থাপন করেছে।

কাজের পরিবেশ নিরাপদ করার দাবি জানিয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত ফ্রান্সের রেনল্ট কারখানার কর্মীরা যে সংগ্রাম করছিলেন, ঐ কোম্পানীরই ফ্রান্সের কর্মীরা ঐ সংগ্রামী কর্মীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে একটি গৌরবজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ফ্রান্সের শ্রমিকরা দক্ষিণ আফ্রিকার কারখানায় যন্ত্রাংশ পাঠানো বন্ধ করে দিল। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকান শ্রমিকদের দাবি না মিটিয়ে ওখানকার অধস্তন সংস্থাটির পক্ষে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলো।

সংহতির আর একটি দৃষ্টান্ত ঃ মালয়েশিয়ার বিমান কর্মীরা মজুরির প্রশ্নে ধর্মঘট করলে ইউনিয়নের সম্পাদককে যখন কারাগারে পাঠানো হয় তখন এই ঘটনার বিরুদ্ধে, মালয়েশিয়ার কর্মীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিমান কর্মীরা। সমর্থন জানিয়েছিলেন ফ্রান্সের শ্রমিকরাও। শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন সম্পাদককে মুক্তি দিতে হয়। ঠিক একইভাবে ফিজি এবং পাপুয়া-নিউ গিনির শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যান্ডের শ্রমিকরা।

WFTU-এর উদ্যোগেই 'কমিটি ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিটি' গঠিত হয়েছে। কমিটি ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই সম্মেলনের একটি হলো সিডনিতে

অনুষ্ঠিত 'সাউথ প্যাসিফিক অ্যান্ড এশিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিটি কনফারেন্স।' লক্ষনীয় এই সম্মেলনে WFTU-র প্রতিনিধি ছাড়াও ICFTU-র প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলেন অপেক্ষাকৃত নতুনতর সংগঠন 'ওয়র্লড কংগ্রেস অব লেবার'-এর প্রতিনিধি। এশিয়া এবং ওসোনিয়াতেও এই ধরণের সম্মেলন হতে চলেছে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বিভিন্ন লিয়াসোঁ (Liaison) কমিটি এবং কো-অর্ডিনেটিং কমিটি গঠিত হচ্ছে এবং হবে। যেমন, কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছে BATA এবং AGACHE-WILLOT-এ, লাতিন আমেরিকার PHILIPS এবং জেনারেল মোটরস্-এ, আফ্রিকার পিগট-এ। এই একই ধরণের কমিটি গঠিত হয়েছে খাদ্য শিল্পে নেসলস্-এ, খনি শিল্পে পেনারোয়া-য়, কেমিক্যাল শিল্পে রোন-পাউলেন্স এ।

একটি ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনের তাগিদেই এইসব যোগাযোগ রক্ষাকারী কমিটি গঠিত হয়েছে। উদ্দেশ্য: ঐক্যবদ্ধভাবে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের মধ্যে স্থায়ী যোগাযোগ রাখা। উল্লেখযোগ্য হলো, এইসব সংগঠন চাইছে অন্যান্য দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে। (দ. ওয়র্লড ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট)

সময়ের দাবি অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের এই সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মার্কিন কর্মীদের কিভাবে এই ধরণের ঐক্য ও সহযোগিতায় সামিল করা যায় তা অবশ্য শ্রমজীবী মানুষেরাই বিবেচনা করে দেখবেন। সুবিধাবাদী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রভাবে আমেরিকার শ্রমিকরা এখনো এই ক্রমবর্ধমান ঐক্যের বাইরে রয়ে গেছে।

এই ধরণের ঘটনা আদৌ অভূতপূর্ব নয়। অতীতে ব্রিটিশ শ্রমিকরাই কার্ল মার্কসের First International Workingmen's Association-এর অর্থ জুগিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শ্রমিকরাই সুবিধাবাদী ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবে পড়েন এবং 'অভিজাত শ্রমিকে' পরিণত হন।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার এবং সংঘবদ্ধ সংগ্রাম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। ট্রান্সন্যাশনালের আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গি থেকে অসংখ্য বাধার সৃষ্টি হয়, তারা ট্রেড ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ মেনে নিতে পারে না। নানা উপায়ে তারা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস নষ্ট করতে তৎপর।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বিভেদও একটি বাধা। এই বিভেদেরও কারণ ট্রান্সন্যাশনালের প্রভাব। অনেক ক্ষেত্রে ICFTU WFTU-র সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হয়নি। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকে সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্যোগে এই অসহযোগিতা কালো ছায়া ফেলেছে।

আরো কিছু সমস্যা আছে এইরকম :

১। একই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের অন্তর্গত অধস্তন সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের একত্রিত করে সভা সংগঠিত করা কঠিন, এবং আর্থিক প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত ;

২। সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন অধস্তন সংস্থার ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিয়মিত সভা আহ্বান করার সমস্যা রয়েছে ;

৩। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে খবরাখবর আদানপ্রদান এবং প্রাপ্ত সেইসব খবরাখবরের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের সমসা ;

৪। এসবের ফলেই কর্পোরেশন স্তরে একটি স্থায়ী দপ্তরে সক্রিয় কর্মী নিয়োগের প্রশ্ন উঠেছে। বহু বড় সংস্থাতেই এই ধরণের স্থায়ী যোগাযোগরক্ষাকারী রয়েছে।

সংক্ষেপে, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের আন্তর্জাতীয়করণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাকে অবশ্যই জোরদার করতে হবে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে যাতে আজকের শ্রমজীবী মানুষ আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের চ্যালেঞ্জকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারেন।

'দুনিয়ার মজদুর এক হও'—মার্কস এবং এঙ্গেলসের এই আহ্বান আজকের দিনে যত তাৎপর্য অর্জন করেছে এমন আর কখনো হয়নি।

বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস যদিও এখনো প্রত্যাশিত স্তরে পৌঁছয়নি তথাপি এই আন্দোলনের প্রবণতা ICFTU-কেও বাধ্য করেছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কার্যকলাপ খতিয়ে দেখতে। ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ICFTU তার প্রতিবেদন জাতিসংঘের কাছে পেশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলো কোনো রাষ্ট্র বা জাতির কাছে দায়বদ্ধ নয় এবং তারা কেবল ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষেই নয়, বহুসংখ্যক জাতীয় সরকারের পক্ষেও গুরুতর বিপদস্বরূপ।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, "যে-সব দেশে অধস্তন সংস্থা রয়েছে সে-সব দেশের ঘরোয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনো কোনো বহুজাতিক

কোম্পানী তাদের বিপুল সম্পদ কাজে লাগায়। তারা যে-সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে তার মধ্যে রয়েছে ব্যাপক হারে রাজনীতিবিদদের উৎকোচ দেওয়া এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকার উৎখাত করার জন্য নাশকতামূলক আন্দোলনে মদত দেওয়া।"

বোঝা মুশকিল এই স্বীকৃতির পরেও কেন ICFTU অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এবং WFTU -র সঙ্গে একযোগে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করার ব্যাপারে কেন তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

প্রসংগত স্মরণ করা যেতে পারে মালিক পক্ষের প্রতিনিধিদের বাধাদান সত্ত্বেও WFTU-ই ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাজাত সামাজিক সমস্যা নিয়ে এই সমীক্ষা চালাতে নিমরাজী ILOকে রাজি করিয়েছেন। ILO অবশ্য এই সমীক্ষা নিজের আভ্যন্তরিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তুলে রেখেছে।

## বিভিন্ন সুপারিশ

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন এবং তাদের ক্ষতিকারক কার্যকলাপের কিভাবে মোকাবিলা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও নানা সুপারিশ করেছে।

তার কয়েকটি এইরকম :

১। সরকার ও ট্রান্সন্যাশনালের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য নির্দেশক-নিয়মাবলী প্রণয়ন এবং সেই নির্দেশ কার্যকর করার উপযুক্ত সংস্থাগঠন ;

২। যেখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন সেখানে সমন্বিত আইন জোরদার করা ;

৩। ব্যবহারবিধি এবং আইন সংবলিত আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন—যা ট্রান্সন্যাশনাল মানতে বাধ্য থাকবে ;

৪। সকল দেশের শিল্প-কাঠামো এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থের ঘরোয়া বাজারের উপর আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর প্রতিক্রিয়ার অবিরত তদারক এবং পরীক্ষা।

আর একটি আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা যে-সব সুপারিশ করেছে তার মুখবন্ধে বলা হয়েছে :

ট্রান্সন্যাশনালের কার্যকলাপ "শ্রমিকদের জীবন এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার পক্ষে বিপদস্বরূপ।"

কাজেই যাতে এক ধরণের সম্পদ (asset) তৈরি হয় তার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো :

১। সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শের রূপান্তর, যাতে আয় এবং সম্পদের মালিকানার সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। এমন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যাতে সংস্থার পুঁজি বাড়লে তাতে শ্রমিকদের অংশ সুনিশ্চিত হয়, বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময়। কারণ দেখা গেছে শিল্প একং কর্পোরেশনের যতটা বাড়তি মজুরি অবশ্যই দেওয়া উচিত তারা তার চেয়ে অনেক কম দিয়ে থাকে।

৩। শ্রমিকরা যাতে পুঁজি সঞ্চয় করতে পারে তার জন্য সামাজিক তহবিল, অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট, ভেঞ্চার ফাণ্ড ইত্যাদি গড়ে তোলা।

৪। সম্পদের মালিকানার অভূতপূর্ব কেন্দ্রীভবন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সামনে যে বিপদ উপস্থিত করে তাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা। সরকার এবং রাজনৈতি নীতি অত্যন্ত ধীরে, ঢিলেঢালাভাবে বদলায়—তাদের একার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়।

৫। সামাজিকভাবে, শিল্পে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের প্রচার জোরদার করতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির চাপের ফলেই ধনীদের ক্লাব OECD আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের জন্য আচরণ বিধি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই আচরণ বিধির ঐচ্ছিক পথনির্দেশিকায় মুখ্য উপাদান চারটি :

১। গণতান্ত্রিক আইনের কাঠামোর মধ্যে গঠিত ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মীর অধিকারকে মাল্টিন্যাশনালকে অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে।

২। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলিকে অবশ্যই উঁচু পদে স্থানীয় কর্মী নিয়োগ করতে হবে এরং নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ঘুষখোর নয়।

৩। অঞ্চল ভিত্তিক বিক্রি, নতুন পুঁজি লগ্নী, গবেষণা, উন্নয়ন এবং আন্তঃগোষ্ঠী মূল্য নির্ধারণ নীতি বিষয়ে যাবতীয় প্রাপ্তব্য তথ্য অবশ্যই বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪। কোম্পানিগুলোকে ঘরোয়া অথবা আন্তর্জাতিক 'কার্টেল' গড়ে তোলা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আমন্ত্রাতা দেশের ব্যবসা নিয়েও ফাটকাবাজী করা চলবে না।

'ইওরোপীয়ান কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস'-এর চাপে EEC-ও নিচের বিষয়গুলোতে সম্মত হয়েছে :

১। আইন মোতাবেক প্রতিটি ইওরোপীয় কোম্পানিতে প্রতি কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে একটি 'মাল্টি-ন্যাশনাল ওয়র্কার্স কাউন্সিল' স্থাপন করতে হবে।

২। মজুরি ও মাইনে, তা দেবার পদ্ধতি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ, শ্রমনিয়ন্ত্রণ—(উদ্বৃত্ত শ্রমিক ও ছাঁটাই-এর সঙ্গে সম্পর্কিত—) বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে পরামর্শ করার এবং ভেটো দেবার অধিকার এই কাউন্সিলের থাকবে।

৩। শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য 'মাল্টিন্যাশনাল ওয়ার্কার্স কাউন্সিল থেকে নির্বাচিত এক তৃতীয়াংশ সদস্য বিশিষ্ট সুপারভাইজারি বোর্ড গঠন করতে হবে ( যদি না শ্রমিকদের দুই তৃতীয়াংশ আপত্তি তোলেন )। ( দ্র. বব এডওয়ার্ডস : মাল্টিন্যাশন্যালস্ অ্যান্ড দ ট্রেড ইউনিয়নস্ )

উপরে যে সুপারিশগুলোর উল্লেখ করা হলো, তাতে যে কাজের কাজ খুব একটা হয়নি তা সকলেই জানেন। তা ছাড়া এর মধ্যে এমন কিছু সুপারিশ রয়েছে যেগুলো ট্রান্সন্যাশনালের শোষণ সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণীর সচেতনতাকে ভোঁতা করার উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন এইসব সুপারিশ ও পরামর্শ বাস্তবক্ষেত্রে মেনে নিতে পারেনি। EEC-র আচরণ বিধির পরিষ্কার উদ্দেশ্য মার্কিন ট্রান্সন্যাশনালের অসুবিধা-সৃষ্টি। কিন্তু ইওরোপীয় ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানিই যেখানে এই আচরণবিধি অমান্য করছে, সেখানে আমেরিকান কোম্পানি তা মেনে চলবে, এটা আশাই করা যায় না। OECD-র আচরণবিধি নিছক অলস কল্পনা।

তবু, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গবেষণা অনেক গোপন সত্য প্রকাশ করেছে। এতে শ্রমিক শ্রেণী আরো সচেতন হতে পেরেছে।

যেমন, জানতে পারা গেছে ১৯৭৩-৭৪ সালে, সারা বিশ্বে চরম তৈল সংকটের সময় তেলের একচেটিয়া কারবারী 'সাত ভগ্নী' অভাবনীয় মুনাফা অর্জন করেছে। তাদের মুনাফার হার এইরকম :

ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম-৪১৫ শতাংশ; শেল-১৮৮ শতাংশ; শেভ্রন—৪৪ শতাংশ; গাল্‌ফ্ অয়েল—৩০৬ শতাংশ; এক্সন—৫০ শতাংশ; মবিল—৪৮ শতাংশ এবং টেক্সাকো ৪৫ শতাংশ। ( দ্র. বব এডওয়ার্ডস : দ মাল্টি-ন্যাশনালস অ্যান্ড দ ট্রেড ইউনিয়ন্‌স্ )

চিতাবাঘকে তার গায়ের ছোপ ছোপ দাগ তুলে ফেলতে বলার কোনো মানে হয় না, মানে হয় না বাঘকে নিরামিষাশী হতে বলা। একই ভাবে, মাল্টি-ন্যাশনালকে শোষণের বাড়াবাড়ি বন্ধ করার উপদেশ দিয়েও কোনো লাভ নেই।

মাল্টিন্যাশনালের মোকাবিলার একমাত্র হাতিয়ার হলো বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য এবং বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। এ-ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে আমরা ম্যাকসিম গর্কি'র একটি গল্প স্মরণ করছি। 'টেলস্ অব ইতালী' গ্রন্থে গল্পটি রয়েছে। গল্পটি শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি বিষয়ে।

ইতালীর একটি অঞ্চলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করছেন। দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট চলছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে শ্রমিকরা পর্যুদস্ত। অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিকরাও এই ধর্মঘট সমর্থন করছেন। কিন্তু এর চেয়েও বেশি কিছু দরকার।

শুরু হলো আন্দোলন। ইতালীর অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিকরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের পোষ্য নিতে লাগলেন। ব্যাপারটা একটা উৎসবের আমেজ নিয়ে এল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের কোনো অভাবই রইলো না। অন্যান্য শ্রমিকদের সন্তানের মতো সবকিছুই তারা পেল। পোষ্য নেওয়া এইসব শিশুরা যখন ট্রেন থেকে স্টেশনে নামতো তখন স্টেশনটাই শ্রমিক-শ্রেণীর উৎসবের কেন্দ্র হয়ে উঠত।

এ গল্পের শিক্ষা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।